ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক, ১৩৩১

প্রথম খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

রস-তত্ত্ব

অনারেবল অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহার নাম রস। রসের আরও অনেক অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল অর্থেরই অন্তরগত ভাব আস্বাদ্যতা। আমাদের ইন্দ্রিয়-সকলের মধ্যে জিহ্বাই আস্বাদনে বিশেষ সমর্থ। সুতরাং জিহ্বার গ্রহণীয় যে গুণ, তাহাকে সাধারণতঃ রস বলে। চক্ষুর গ্রাহ্য গুণ যেমন রূপ, শ্রবণের গ্রাহ্য গুণ যেমন শব্দ, জিহ্বার গ্রাহ্য গুণকে তেমনই রস বলা হয়। এই রস আবার কটু তিক্ত কষায় অম্ল মধুর লবণ এই কয় ভাগে বিভক্ত। এই সকল রস আস্বাদনে সমর্থ বলিয়া জিহ্বার অপর নাম রসনা। কোনও কটু তিক্ত বা অম্ল দ্রব্য রসনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে রসাস্বাদন হয়। রসনেন্দ্রিয়ে কোনও প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই রসজ্ঞান জন্মে। যে সকল দ্রব্য মুখ মধ্যে অর্পিত হইলে এই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিতে পারে না, তাহা রসের জনক বা আস্বাদ্য নহে। একখানি কাচখণ্ড জিহ্বায় দিলে কোনও আস্বাদনই হয় না।

সাহিত্যেও আমরা রসের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু সেখানে চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য রূপ রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোনও রসের প্রসঙ্গ নাই। সাহিত্যের রস মনের দ্বারা গ্রহণীয়; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই রসের জ্ঞান হয়। এই জন্য ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে চক্ষু ও শ্রোত্রের প্রাধান্য। আমরা নয়নের দ্বারা রূপ দেখি, শ্রবণের দ্বারা শুনি। কিন্তু নয়ন শুধু আলোক তরঙ্গের দ্বারা নীল পীত লোহিতাদি বর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। কর্ণ শুধু বায়ু তরঙ্গের দ্বারা শব্দ গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় না। চক্ষুর দ্বারা যে বর্ণের এবং কর্ণের দ্বারা যে শব্দের উপলব্ধি হয় তাহা জ্ঞান মাত্র। একখানি মোটর গাড়ী রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল,—বুঝিলাম, সেখানি পাটল বর্ণের;

বাতাসে দরজা পড়িল, শব্দ কাণে প্রবেশ করিল। ইহাতে দুইটি বিষয়ের জ্ঞান হইল মাত্র। যদি আমি অন্যমনস্ক থাকিতাম, তাহা হইলে বায়ুতরঙ্গ শব্দের জ্ঞান জন্মাইতে পারিত না; গাড়ীখানা কোন্ রঙের তাহাও জানিতাম না। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা এইরূপে খণ্ড খণ্ড জ্ঞান মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। সেই খণ্ড খণ্ড জ্ঞান ক্রমশঃ সমষ্টীভূত হইয়া জ্ঞান-প্রবাহের সৃষ্টি করে। জ্ঞান-প্রবাহ বলিলাম এই জন্য যে, মনের ক্রিয়া বুঝাইতে হইলে, একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের কল্পনা করিতে হয়। বায়স্কোপে ছবি যেমন পর পর নূতন দৃশ্য নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত করে, মন ও তেমনি অনর্গল প্রবাহে জ্ঞানের আলেখ্য ফুটাইয়া বহিয়া যায়। কিন্তু এই জ্ঞান-প্রবাহের পাশেই সমান্তরাল রেখার মত আর একটি প্রবাহ মনের রাজ্যে বহে। জ্ঞানের প্রবাহ হইতে সেটি স্বতন্ত্র, অথচ দুইটি এমন পাশাপাশিভাবে চলিয়াছে যে, একটি অপরটিকে যেন ছায়ার মত অনুবর্ত্তন করিতেছে। সেটিকে রস-প্রবাহ বলিতে পারা যায়। জ্ঞান ও রস এক জিনিষ নহে; ইহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাবও কল্পনা করা চলে না। এই মাত্র আমরা বলিতে পারি যে, জ্ঞান যেখানে আছে, প্রায়ই রস সেখানে বিরাজিত। জ্ঞানের ধর্ম্ম প্রকাশ, জ্ঞান প্রকাশশীল পদার্থ। যে ধর্ম্মের দ্বারা আত্মা নিজকে এবং অন্য দ্রব্যকে প্রকাশ করে বা দেখায়, তাহাকে 'জ্ঞান' বলে। আ-ব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তুই জ্ঞানের বিষয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন ইহার সাধন।

রস যে জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু, তাহা আমরা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চক্ষুর দ্বারা কোন বস্তু কি বর্ণের তাহা অবগত হওয়া যায়; কিন্তু চক্ষু শুধু বর্ণের জ্ঞান দিয়াই ক্ষান্ত হয় না। চক্ষু যে সকল বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ দেখিতে পায়, তাহার মধ্যে যথেষ্ট আস্বাদনের বিষয় থাকে। সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে শুধু তাহা জ্ঞানের আকর নহে; পরন্তু উপভোগের সামগ্রী। এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গারোহীরা সেই সু-উচ্চ শিখরের শেষ সীমা দেখিবার জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত। ইঁহাদের প্রাণে আছে অদম্য উৎসাহ, মনে আছে ঐকান্তিক ঔৎসুক্য। কিন্তু দূর হইতে যাহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গরাজি নীলাকাশের নীচে শুভ্র তরঙ্গে লীলায়িত দেখে, তাহাদের প্রাণে কি ভাব জাগে? প্রকৃতির সেই প্রশান্ত গম্ভীর শৈল-লীলায় সে মুগ্ধ মৌন স্তব্ধ হইয়া রহে না কি? ভগবান গিরিরাজের সেই অনন্ত উদার মহিমায় সে বিস্মিত, ভীত ও ভক্তিপ্রণত হইয়া যায় না কি? এক দিকে জ্ঞান এবং জ্ঞানের উৎকট সাধনা। অপর দিকে রস; রসের সরল, অবিমিশ্র অনুভূতি। রস অনুভূতির বিষয়। আত্মা যে ধর্ম্মের দ্বারা নিখিল বস্তু-সত্ত্বা হইতে আনন্দ লাভ করে, তাহার নাম রস। আনন্দ ও আস্বাদনীয়, রসও আস্বাদনীয়, সুতরাং রস এবং আনন্দ অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আনন্দ হইতে রস প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং রসের কার্য্য আনন্দোৎপাদন; এই জন্য রস ও আনন্দের অভেদ কল্পনা করা হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জ্ঞান ও অনুভূতি knowledge এবং feeling চিত্তের দুইটি পৃথক ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। জ্ঞান বস্তুর পরিচয় সংঘটন করায়, অনুভূতি সুখদুঃখলক্ষণা। জ্ঞান যেমন মনের একটি অসাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম, অনুভূতিও সেইরূপ। অনুভূতিও চেতনা-লক্ষণ যুক্ত; কিন্তু তথাপি অনুভূতি ও জ্ঞান চিত্তের দুইটি পৃথক অবস্থা সূচিত করে। এই অনুভূতির দ্বারা রসের আস্বাদন লাভ হয়। জ্ঞানের দ্বারা যখন বস্তুর স্বরূপের সহিত চিত্তের পরিচয় লাভ হয়, তখন অনুভূতির দ্বারা তাহার রস-রূপতার সন্ধান পাওয়া যায়। এক দিন কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে একজন নূতন মানুষ দেখিলাম। জানিলাম শুধু তাহার বর্ণ, তাহার দৈর্ঘ্য, তাহার অবয়বের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে অনুভব করিলাম তাহার আকর্ষণ। সকল মানুষ দেখিলে ত এমন হয় না। সারা বিশ্বের মধ্যে সেই একজন মানুষ যাহার দর্শনে নীরস হৃদয় সরস হইল। মনের যে আস্বাদন-শক্তি আছে, তাহার পরিতৃপ্তি হইল এইখানে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ ঘূরিয়া ঘূরিয়া আলোর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে। আলোর সম্বন্ধে সেই ক্ষুদ্র প্রাণীদের জ্ঞান জন্মিতে বেশী বিলম্ব হয় না। তাহারা অল্পক্ষণেই শুধু আলোকের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে না; পরন্তু তাহার দাহিকাশক্তি সম্বন্ধেও

যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু তবুও বিরতি নাই, নিবৃত্তি নাই,—এমনই আকর্ষণ যে প্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া তবে ছাড়ে। সাধারণতঃ সর্প মানুষকে দেখিলেই পলায়ন করে, কিন্তু মানুষ যখন বাঁশী বাজাইয়া বাজাইয়া গান করিতে থাকে, তখন সে তাহার চিরশত্রুর সম্মুখে ফণা নাচাইয়া না দুলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিসের এই তীব্র আকর্ষণ?

বাক্য শব্দের সমষ্টি মাত্র। সুর যোজনা করিলে এই বাক্যের নাম গীত। সঙ্গীত যে প্রাণে কি রসধারার সৃষ্টি করে, তাহা সকলেই জানেন। এমন লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার মন সঙ্গীতে গলে না। ইহাই সঙ্গীতের রস বা মোহিনীশক্তি। কণ্ঠ-সঙ্গীতই হউক, আর যন্ত্র সঙ্গীতই হউক, হৃদয়দ্রাবী রসস্রাবী শব্দ-ধারাই সঙ্গীত-পদবাচ্য। কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে মনের সেই সম্বন্ধটি কি, যাহার ফলে মন এমন মোহিত হয়?

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। রস কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ। বাক্য-যোজনায় যতই বৈচিত্র্য থাক্, রস না থাকিলে তাহা কাব্য হয় না। কাব্যের এই রস আলঙ্কারিকগণ কর্ত্তৃক নয় প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে—যথা শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, ও শান্ত। বাৎসল্য রস ধরিলে কাব্যের রস সর্ব্বশুদ্ধ দশটি। রস আছে বলিয়াই কাব্যের মাধুর্য্য। দণ্ডী বলেন,—

মধুরং রসবৎ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ
যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনৈব মধুব্রতাঃ (কাব্যাদর্শ)

রস থাকিলেই তাহাকে মধুর বলে। বাক্যে এবং বস্তুতে রস থাকে। মধুতে যেমন মধুপ উন্মত্ত হয়, রসে তেমনি ধীমান ব্যক্তিগণ মাতোয়ারা হন। রতি প্রভৃতি মানব মনের যে সকল স্থায়ীভাব আছে, তাহা বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী দ্বারা পরিণিত হইলে কাব্যের রস-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাব দুই প্রকার। রসের যাহা বিষয় বা আশ্রয়, তাহার নাম আলম্বনবিভাব। যাহা রস উদ্দীপন করে, তাহার নাম উদ্দীপনবিভাব। অশ্রু-কম্প-পুলক ইত্যাদি রসের সাত্ত্বিক অনুভাব। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী নামে আরও কতকগুলি শারীর ব্যাপার রসাস্বাদনের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা দৈন্য, নির্ব্বেদ, লজ্জা প্রভৃতি। দধি শর্করা ঘৃত মরীচ কর্পূর প্রভৃতি সহযোগে যেমন অমৃত মধুর রসাল আস্বাদন হয়, তেমনি স্থায়ী ভাবের সঙ্গে বিভাব অনুভাবের অসাধারণ মিলনে রসের অপূর্ব্ব পরিপুষ্টি হয়, ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর মত। হিন্দু আলঙ্কারিকগণ রসাস্বাদন ও তাহার সহায়ক, উদ্দীপক ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি অতি নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু মনের যে গতি বিশেষ দ্বারা রসানুভূতি হয়, তাহা বিশ্লেষণের অতীত। যে সকল প্রকারে রসের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হয়, তাহাই আমরা বর্ণনা করিতে পারি; কিন্তু মনের যে মৌলিক ধর্ম্মের গুণে রস রূপ অসাধারণ বস্তুর স্ফুরণ হয়, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না।

রস অখণ্ড, সমগ্র, পূর্ণ। ইহা চিন্ময়, অর্থাৎ ইহা চৈতন্যের রশ্মিপাতে স্বপ্রকাশ। অচেতন অবস্থায় রসের আস্বাদন লাভ হয় না। রস ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর, অর্থাৎ ব্রহ্মের আস্বাদনের মত; এবং লোকোত্তর চমৎকার অর্থাৎ রস এরূপ বিস্ময়কর সামগ্রী যেন ইহা এ জগতের জিনিষই নয়।

বস্তুতঃ রস মানব জীবনের এক অপূর্ব্ব রত্ন। বিদ্যুতের চমকে যেমন চরাচর বিশ্ব ক্ষণেকের জন্য উদ্ঘাটিত, আলোকিত হইয়া যায়, রসরূপ পরশমণির স্পর্শে তেমনি বিশ্বসংসার এক মুহূর্ত্তে মধুর হইয়া উঠে। দুঃখ-জর্জ্জরিত, পাপ-কলুষিত মরণাহত এই জগতে রসই "আনন্দরূপমমৃতম্"।

জ্ঞানের দ্বারা আমরা বস্তু বিচার করি, গুণের বিশ্লেষণ করি, কোন্ পদার্থের কি স্বরূপ তাহা যাচাই করিয়া লই। বিশ্বের হাটে কোন্ জিনিষের কি দর, তাহার খোঁজ করিয়া বেড়াই; এইরূপ করিতে করিতে কখন সেই জিনিষের মধ্যে একটি চাখিয়া দেখিলাম, আর অমনি প্রাণে রস-ধারার সঞ্চার হইল। বিশ্বের হাট আর সাধারণ হাট রহিল না, আনন্দবাজার হইয়া গেল; সেখানে আর শুধু কেনা বেচা, বস্তুপরিচয় নাই, সেখানে কত নাচ গান, ফুলের বাগান, কত চিত্র, কত চারুকলা, কত প্রেম, কত উন্মাদনা, কত মিলন, কত বিরহ—সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! যে ইন্দ্রজালের ফলে এমন অঘটন

ঘটে, তাহাই রস। ইহাকে মায়া বলিতে হয় বল, অবিস্থা বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে সৌন্দর্য্যরূপে, মাধুর্য্যরূপে, সঙ্গীতরূপে, চিত্রকলারূপে, প্রেমভক্তি রূপে ওতপ্রোতঃ হইয়া রহিয়াছে। ইহার মূল প্রস্রবণ কিন্তু এ জগতে নাই; জগতের অতীত স্থানে ইহার জন্ম। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং।" বিরজা নদীর পরপারে সেই আলোক লোক অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্। সেখান হইতে স্বর্গঙ্গার মত রসধারা অবনীতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং জীবজগৎকে ধন্য করিয়া দিয়াছে। অতি প্রাচীন কালের ঋষিগণের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হইয়াছিল

রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

তিনিই একমাত্র রস; অন্য কোথায়ও রস নাই। রস না থাকিলে আনন্দ থাকিত না। তিনিই রস, তিনিই আনন্দ। সেই আনন্দ হইতেই নিখিল বিশ্ব জন্ম লাভ করিয়াছে। শ্রুতি বলিলেন আনন্দং ব্রহ্মণো-রূপম্। পুরাণ অমনি তাহার অনুবাদ করিয়া বলিলেন, যে সাগর সেচিয়া ভগবানের বক্ষ-বিলম্বিত কৌস্তভমণি পাওয়া গিয়াছিল, যাহার মধ্য হইতে নীলাকাশের শোভা চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষীর সমুদ্র হইতেই 'অমৃত' উত্থিত হইয়াছিল। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীহস্তে সেই সুধা বিতরণ করিয়াছিলেন। যাহারা সে সুধা পাইল, তাহারা মৃত্যুর অতীত হইল। শ্রুতি আরও বলিলেন "আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রত্যভিসংবিশন্তি।" আনন্দ হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়। মরণেও সে আনন্দের অভাব নাই; কারণ মরণের দ্বার দিয়াই মানব আনন্দের ধামে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। জীবনে আনন্দ, মরণে আনন্দ, মিলনে আনন্দ, বিরহে আনন্দ—আনন্দের কনককিরণে সমস্ত বিশ্ব সংসার ঝলমল করিতেছে।

রসের আস্বাদন শুধু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগায় না, ইহা আত্মাতে এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি আনিয়া দেয়। জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ! বিচার বিশ্লেষণ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি সীমাবদ্ধ। মনের ক্রিয়া ভূতবর্গের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অতীন্দ্রিয়, অতি-জাগতিক কোনও বিষয় সম্বন্ধে মন ধারণা করিতে পারে না। সেখানে বাক্য ও মন উভয়ই ব্যর্থ। মনের কোনও গুণই তাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না, শব্দগুণ, স্পর্শগুণ প্রভৃতি মনের যে সকল ক্রিয়া—তাহা সেই পরম ও চরম তত্ত্বে আরোপিত হইতে পারে না। সুতরাং শেষ কালে "নেতি নেতি" এইরূপেই তাহার নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু এরূপ করিলে ত আর নির্দ্দেশ করা হয় না; সেই জন্য অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক অজ্ঞেয়তাবাদে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। পরম সত্য অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়—মানুষের চিন্তা ও ধারণা-শক্তির অতীত সে বস্তু। ইহাই হইল জ্ঞানের অবধি বা সীমা।

কিন্তু রসের নিষেকে যে মন সরস হইয়াছে, তাহার অনুভূতির পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়। দার্শনিক যেখানে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, কবি, শিল্পী ও ভক্ত সেখানে দিব্যশক্তির বলে প্রবেশ করিতে পারেন। জ্ঞানী গঙ্গার মোহনা খুঁজিতে গিয়া বরফে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন, কঙ্করোপলের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসেন, কিন্তু ভাবুক ব্যক্তি গঙ্গার শীকর-শীতল বাতাস খাইয়া গঙ্গাজল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া তৃপ্ত হয়েন। জ্ঞানী দেখেন ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অচক্ষু, অশ্রোত্র—আবছায়া মাত্র। রসিক ভক্ত দেখেন "অনাদি-রাদির্গোবিন্দঃসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ"—বিশুদ্ধ প্রেমে গড়া মূর্ত্তি। সেই জন্য প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তের স্থান সকলের ঊর্দ্ধে। ভক্ত সবার চেয়ে বড়, কেন না যিনি সমগ্র চরাচর বিশ্বকে একপদে মাত্র ধারণ করেন, সেই ভগবান ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

ইহাতে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে, ভগবানের অসীমত্বের বা অনন্তত্বের বাধা হয়। কিন্তু 'অনন্ত' বলিতে আমরা কি বুঝি? রসের অভিধানে 'অনন্ত' শব্দ নাই। জ্ঞানের ভাষায়ও কি অনন্ত শব্দের কোনও বোধগম্য অর্থ আছে? এ শব্দটি শুধু মনের ব্যর্থতার নিদর্শন—আর কিছুই নহে। আমরা মনের স্বাভাবিক গতির দ্বারা যাহার ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাকেই আমরা অনন্ত, অসীম, প্রভৃতি নঞ্‌ তৎপুরুষাত্মক পদের দ্বারা বুঝাইয়া থাকি; কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে,

এ সকল ভগবানের গুণ নহে, হতাশার আক্ষেপ মাত্র।

একজন লেখক বলেন, "If it be urged that the existence of conditions limiting the possibilities of the Divine Will is inconsistent with the idea of a God who is infinite, I answer that neither Religion nor Morality nor, again, reasonable Philosophy have any interest in maintaining the infiniteness of God in the sense in which a certain tradition of the schools is accustomed to assert it."... Rashdalls Theory of Good and Evil, P. 237.

অর্থাৎ যদি কেহ বলেন যে ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া ক্রিয়া করে এরূপ বলিলে ভগবানের অনন্তত্বের বাধা হয়, তাহার উত্তরে আমি বলি যে নানা পণ্ডিত বহুকাল হইতে যে ভাবে অনন্তের কল্পনা করিয়া আসিতেছেন, সেরূপ অনন্তত্ব লইয়া কোনও দার্শনিক মত তৃপ্ত হইতে পারে না। এমন অনন্তের কোনও প্রয়োজন নাই।

বিশ্বের ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা যখন আসনে উপবেশন করিয়াছি, তখন প্রত্যেকটি উপকরণের পাকপ্রণালী অনুশীলন করিতে গেলে বা গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ করিতে গেলে, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ক্ষুধা মন্দ হইয়া আসে এবং সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হইয়া পড়ে। জ্ঞান যেখানে সিন্ধুর ঢেউ গণিবার বিফল চেষ্টায় ব্যথিত, ক্ষুব্ধ ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়, রস সেখানে পুনঃ পুনঃ অব-গাহন করিয়া পরিতৃপ্তির বিমলানন্দ অনুভব করে; হয়ত বা ডুবিতে ডুবিতে কখন রত্নও ভাগ্যে লাভ হইয়া যায়!

রসাস্বাদন দ্বারা আমাদের যে অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি হয়, তাহা কেবল সেই জানে যাহার অনুভূতি হয়। এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ইহা "মূকাস্বাদনবৎ"। বোবা যেমন কোনও আস্বাদ পাইলে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে পারে না, সেইরূপ। ইহার কারণ এই যে, আমাদের বাক্য, আমাদের ভাষা-জ্ঞানের অনুবর্ত্তী! মন যাহা সাধারণতঃ জানিতে পারে, তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহাতেও কি ভাষা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়? ভাব আগে আগে ছুটিয়া চলে, ভাষা খঞ্জের মত বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। তার পর ভাষা ভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্যক্ত করে। ভাব অর্থাৎ জ্ঞান ও সত্যকে সমগ্র ভাবে দেখিতে পারে না, খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখে; ভাষা তাহাকে আরও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, চিন্ময়,—ভাষা তাহাকে ব্যক্ত করিবে কিরূপে?

"মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।"

সমুদ্রের দিকে গঙ্গা যেমন অবিচ্ছিন্ন গতিতে অগ্রসর হয়েন, নিখিল রসনিবহের প্রস্রবণ শ্রীভগবানে মানবের অব্যবহিতা অহৈতুকী ভক্তিও সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ধাবিত হয়।

নবদ্বীপে

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

কোথা তৃপ্তি? তীর্থে কোথা সান্ত্বনা হিয়ার?
জাহ্নবীর কাকচক্ষু নীরে, বালুকার তীরে,
সজ্জিত বিপণি-মাঝে, আশ্রমে-মন্দিরে,
কোথা শান্তি উচ্ছ্বসিত আঁখি-দরিয়ার?
আনন্দের কলরবে প্রিয়-কণ্ঠমাঝে,
শুভ্র দ্বাদশীর রাতে কিশোর শশীর
স্নিগ্ধ প্রীতি-আলিঙ্গনে, এ উপবাসীর
হৃদয়ের অমিয়-তিয়াষা, মিটে না যে
হে মোর বাঞ্ছিত, শুধু বিরহ-বেদন,
মরমের স্তরে স্তরে হানিয়া আঘাত
পরাণের তারে তারে ভরি দিনরাত
বুকভাঙা বিষাদের কাতর ক্রন্দন,
বাজে স্বপ্নে, জাগরণে; কোথা তুমি বঁধু—
সোহাগ অলির মোর মনোমদ মধু!

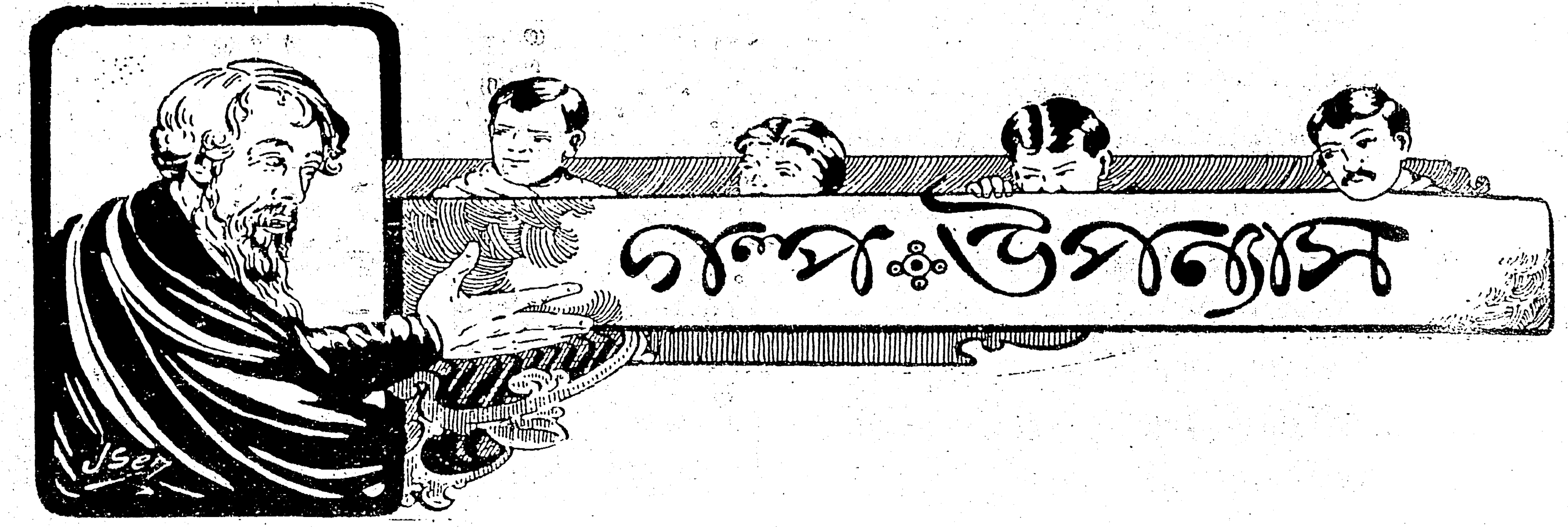

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২১)

ঊষার একটী সন্তান হইয়াছে শুনিয়া সতী কর্ম্মস্থল মুঙ্গের হইতে বাড়ী আসিল। রেখা তখনও সেখানে ছিল, 'ঊষার ছেলে' কথাটা শুনিয়া সেও আসিবার লোভ সামলাইতে পারিল না।

পদ্মফুলের মত শিশুটীকে বুকে তুলিয়া লইয়া, তাহার মুখখানা অজস্র স্নেহ-চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া সতী বলিল, "বউদি, এবার সত্যিই তা হলে মা হলে? নারীজন্ম এবার তা হলে সার্থক হয়ে গেল তোমার।"

ঊষা লজ্জিত ভাবে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রেখা বলিল, "তুমি আর সে কথা বল না সতী। বুঝতে পারছ, নারীজন্মের সার্থকতা এই—তবু কেন যে—"

সতী হাসিয়া বলিল, "কি করব ভাই, অদৃষ্টে না থাকলে কেউ তো মা হতে পারে না। অদৃষ্টে না থাকলে বিয়েও হয় না, তাও তো দেখছ। বিয়ে জন্ম আর মৃত্যু—মা বলেন এই তিনটীই ভগবান নির্দ্দিষ্ট করে দেন। আমার দুটো ঠিক করা আছে—একটার ঘরেই মস্ত বড় একটা শূন্য বসানো। একটার সার্থকতা লাভ করেছি, অর্থাৎ জন্ম যে লাভ করেছি—এটা ঠিক। আর একটা হলেই হয়। সেইটার প্রতীক্ষায় বসে আছি,—ডাক আসবে যখন—চলে যাব।"

রেখা তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "এই বয়সেই এতটা উদাস ভাব ভাল লাগে না। সময় সব কাজেরই এক একটা আছে। নিয়ম ধরে পৃথিবীর বুকে সবই আসা যাওয়া করছে। অনিয়মে কিছু এলেই সেটা বড় খারাপ ঠেকে। তোমার এখন অতটা উদাসীন হতে যাওয়া কোন মতেই মানায় না সতী; একবারে লয়ে দৃষ্টি—এ বড় সাংঘাতিক কথা।"

বৈকালে মনীশ আসিয়া সতীকে দেখিতে পাইল। হাতখানা কপালে ঠেকাইয়া সে সম্ভ্রমের ভাব দেখাইয়া বলিল, "নমস্কার হেড মিষ্ট্রেস মহোদয়া,—শরীর গতিক ভাল তো?"

"যান, আপনার আর ঠাট্টা করতে হবে না" বলিয়া সতী তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

মনীশ বিস্ময়ের সুরে বলিল, "ইস, এতটা ভক্তি! কোন দিন না বোঝা বইতে পেরে মরে যাই। আশীর্ব্বাদ করা অবশ্যই উচিত। সুতরাং কি আশীর্ব্বাদ যে করব, সেটা আগে ঠিক করে নেই; কারণ, সে কথাটা ভেবে আসিনি। আচ্ছা—আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি চির-এয়োস্ত্রী হও।"

রেখা পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি দিন-চার মাথাটার চিকিৎসা করালে

ভাল হয় মনীশবাবু, ডাক্তার বন্ধুর কাছে দেখাবেন একবার?"

মনীশ মুখখানা নিরীহ ভাল মানুষের মত করিয়া বলিল, "কেন বলুন তো?"

রেখা বলিল, "আপনি জানছেন সতী বিয়ে করেনি, তবু আশীর্ব্বাদ করলেন চির-এয়োস্ত্রী হও।"

মনীশ বলিল, "বিয়ে করেনি, বিয়ে করবে তো।"

রেখা বলিল, "কে বললে বিয়ে করবে? বিয়ে যদি না করে—তবে আপনার আশীর্ব্বাদটাই তো মাঠে মারা গেল।"

মনীশ মুখখানা অত্যন্ত কুঞ্চিত করিয়া সতীর পানে তাকাইয়া বলিল, "তা বটে, একেবারেই মাঠে মারা যায়। কিন্তু বিয়ে করবে না কেন?"

সতী রেখাকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, কি কর রেখা, তোমার একটু কিছু জ্ঞান নেই। তা মনীশ বাবু, আপনার আশীর্ব্বাদ ঠিক হয়েছে—আমি বলছি। আমার বিয়ে লৌকিক না হলেও হয়েছে।"

সে চলিয়া গেল।

মনীশ এই মেয়েটীর ভাব কিছুই ধরিতে পারিল না। রেখা বলিল, "আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব মনীশ বাবু। একটু সন্ধ্যা হোক, আপনি পাশের বাগানটায় যাবেন, আমিও যাব'খন। এখন বলতে গেলে সে যদি কোনও রকমে শুনতে পায়, তা হলে আমায় আস্ত রাখবে না। আপনি যখন মৃন্ময়বাবুর বন্ধু, তখন সে কথা আপনাকে আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি; কারণ, আমি জানছি, যদি উপকার পাওয়া যায়, তবে তা আপনাকে দিয়েই পাওয়া যাবে।"

মনীশ মুখখানাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবের করিয়া বলিল, "আমাকে দিয়ে উপকার পাবার আশা করছেন আপনি, আমি তো ভেবে ঠিক করতেই পারছিনে আপনি কি বলবেন। বেশ, আমি সন্ধ্যা বেলা যাব'খন, আপনি তখন বলবেন সব কথা।"

সে মৃন্ময়ের সন্ধানে চলিয়া গেল।

রেখা অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকগুলা কথা আনিয়া মনের মধ্যে বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিল। প্রথমে নরম নরম কথা, তাহার পর খুব শক্ত শক্ত কথা; তাহাতে যদি মনীশের চৈতন্য হয়।

সতীর গৃহে যাইতেই সতী তাহাকে চাপিয়া ধরিল, "কি বলছিলে তুমি এতক্ষণ মনীশবাবুকে,—নিশ্চয়ই আমার কথা।"

রেখা একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, "বিলক্ষণ! তোমার কথা জানাতে আমার ভারি দায় পড়েছে। তুমি নিজেই যখন গোপনে থাকতে চাও, তখন তোমায় প্রকাশ করে দিয়ে আমার লাভটা কি?"

সতী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচালে আমায়। আমায় যদি যথার্থ ভালবাস রেখা—তবে আমার দিব্য, আমার কথা কিছু যেন মনীশ বাবু না শুনতে পান। আমি যে তাঁকে ভালবাসি, এ কথা শুনলে তিনি কি ভাববেন আমায়! না—ছিঃ।"

তাহার মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল।

রেখা হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই গো, ভয় নেই, কিছু বলব না।"

সন্ধ্যার সময়ে সে কেমন করিয়া সকলের চোখ এড়াইয়া বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। মনীশ অনেক আগেই সেখানে গিয়াছিল,—সে তখন পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল।

রেখা বলিল, "এই যে আপনি এসেছেন মনীশ বাবু,—আপনার কথার বেশ ঠিক আছে। এই বেঞ্চটায় বসুন।"

সে এক পাশে বসিল, মনীশ বলিল, "আপনি বলুন, আমি শুনছি।"

রেখা বলিল, "দাঁড়িয়ে কি শুনবেন, বসুন না কেন?"

অগত্যা মনীশ এক পাশে বসিয়া পড়িল, বলিল, "বলুন।"

প্রথমটা যে কি ভাবে কথাটা উত্থাপন করা যায়, রেখা তাহাই ভাবিতেছিল। মনীশ তাহার সে ভাবের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিল, "আমার দ্বারা সতীর যে কি উপকার হতে পারে, তা আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। আমি ত নিজেকে ব্যর্থ মানুষ বলেই ধরে রেখেছি।"

রেখা বলিল, "ব্যর্থতাও কখনও কখনও সার্থকতা লাভ করতে পারে মনীশ বাবু। সতী আমায় বিশ্বাস করে তার সব কথাই বলেছে—কোনও কথাই গোপন করেনি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, যেন এ কথা কাউকেই বলা না হয়।"

ব্যস্ত হইয়া মনীশ বলিল, "তবে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কোন মতে উচিত কাজ হচ্ছে না। একটী মেয়ের গুপ্ত কথা জানতে আমার প্রবৃত্ত নেই,—এ রকম কথা শোনা আমি ঘৃণাস্কর বলেই মনে করি। আমায় মাপ করবেন আপনি, আমি উঠলেম।"

রেখা যেন বিস্মিত হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিল; যখন সত্যই দেখিল, মনীশ অভিবাদন জানাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতেছে, তখন সে ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আপনি যাচ্ছেন যে? আমার কথাটা শুনবেন বলেছেন আপনি, নচেৎ এই সন্ধ্যাবেলা এরূপ নির্জ্জনে আমি কখনই একলা এমন ভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করতুম না! আর সেটা আমার মত মেয়ের পক্ষে যুক্তিযুক্তও নয়। আমি যখন এসেছি, তখন জোর করে আপনাকে সে কথাটা শুনতেই হবে। আপনার কথার ওপরে একজনের জীবন সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে,—আপনি তাতে এত উদাসীন থাকলে চলবে না। সে যে গোপনেই নিজের ব্যথা বয়ে যাবে, তা হবে না,—আপনাকে তা শুনতেই হবে, অনুভব করতেই হবে।"

বিস্মিত মনীশ তাহার মুখের পানে চাহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

রেখা জোর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, অবশ্যই আপনাকে শুনে যেতে হবে। আপনি এক জনকে আজীবন দুঃখের সাগরে ভাসিয়েছেন—অথচ তা আপনি জানবেন না,—ভগবানের বিচারে এ হতে পারে না। যে যাকে সুখ দুঃখ দেবে, সে তাকে জানতে পারবেই—এই সংসারের নিয়ম। আপনি যে এই চিরন্তন নিয়ম উল্টে যাবেন জোর করে, তা কখনই হতে পারবে না। আমিই আপনার বন্ধু হয়ে আপনার এ ভুলটা সংশোধন করে দেব! আপনি তাতে আমায় যদি শত্রু ভাবেন—তা ভাবতে পারেন,—আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।"

মনীশ দুইটী চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "আপনি এ সব কি কথা বলছেন,—আমি এর একটা কথাও বুঝতে পারছিনে।"

রেখা কঠোর কণ্ঠ কোমল করিয়া বলিল, তা "হলে জানতে হবে, আপনার প্রকৃত হৃদয় নেই। আপনার মধ্যে ভগবানের আসন কখনই নেই—সেখানে বাস করছে শুধু শয়তান—যে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মানুষকে শুধু দুঃখ দিয়ে নিপীড়িত করেই যায়। ভগবান থাকলে—যে আপনার দ্বারা দুঃখ পাচ্ছে—তার দুঃখ দূর করবার চেষ্টায় থাকতেন।"

মনীশ বলিল, "আমি বুঝতে পারছিনে, কাকে আমি ব্যথা দিয়েছি, কার কাছে আমায় অপরাধী রূপে দাঁড়াতে হবে। আমার হৃদয়ে শয়তানই থাক আর ভগবানই থাক, সে কথা আমি জানতে চাইনে, কাউকে জানাতেও চাইনে। আমি জানি, আমি সংসারের একটা ব্যর্থ বোঝা। আমার মধ্যে এমন কিছু নেই, যার দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া বা কাউকে সুখী করা যায়।"

রেখা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তা আছে। আপনি আপনাকে যা ভাবছেন, তা আপনি ন'ন। আপনার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে কেউ না কেউ মুগ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু আপনাকে পেতে সে পারে না,—মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে আপনার হৃদয়ের গর্ব্বগুলা। আপনি মনে ভাবেন, আমি অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করছি; কিন্তু ওইগুলো যে ঠিক গর্ব্ব রূপেই ফুটে বেরুচ্ছে, তা তো জানেন না।"

অধীর হইয়া মনীশ বলিল, "আপনার হেঁয়ালিভরা কথার অর্থ করা আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠছে। আমায় সোজা-সুজি বলে দিন, আমি কার দুঃখের কারণ হয়েছি?"

রেখা উত্তর দিল "সতীর।"

"সতীর!—" মনীশ বিস্ময় দমন করিতে পারিল না।

চকিতে তাহার মনে হইয়া গেল—হাঁ, ইহাও সম্ভব হইতে পারে,—জগতে অসম্ভব তো কিছুই নাই। চির-তপস্বিনী উমার সে অনুরক্ত হইল কেন? সে তো পুরুষ, হৃদয়ে তো তাহার দৃঢ়তার কিছুমাত্র অভাব নাই,—তবে কেন এরূপ হইল? সতী স্বভাবকোমলা স্ত্রীলোক,—তাহার হৃদয়ে এ অনুরাগ—ইহা তো অসম্ভব হইবার নয়।

সতীর এ পর্য্যন্ত সে যত কথা পাইয়াছে, সব গুলি মনে করিল। আজ যখন সে সতীকে আশীর্ব্বাদ করিল, কুমারী সতী তাহা হাস্যমুখে গ্রহণ করিল, ফিরাইয়া দিল না তো।

বুকের মধ্যে তাহার সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা জলিয়া উঠিল। তাহাকে পতিত করিবার এ কি বিশাল আয়োজন! না, ইহা কখনই হইবে না। সতীর সহিত

মিলন,—ইহা কল্পনারও অযোগ্য। সে হৃদয় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে! মনকে যখন কিছুতেই আয়ত্তে আনিতে পারে নাই, সে চিন্তা যখন কিছুতেই হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হয় নাই—তখন সে নিজের মনের কাছে ধরা দিয়াছে। থাক, অশান্ত হৃদয় যাহা লইয়া শান্ত থাকিতে চায়, তাহা লইয়াই থাক, কিন্তু বাড়াবাড়ি আর যেন না করিতে পারে;—সে দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। যে হৃদয় তাহার নিজের নয়, সে হৃদয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা অন্য নারী করিতে পারে না।

সতীর কথা ভাবিয়া সে বিলক্ষণ রুষ্টও হইয়া উঠিল। মেয়েরা এতই অসংযমী—ছিঃ!

কিন্তু না, সে নিজে কি? সে তো পুরুষ; সে তবে চিত্ত-সংযম করিতে কিছুতেই পারিতেছে না কেন? কে বলিবে—সতাও কি এইরূপ করিতেছে না? হয় তো বালিকাকাল হইতেই সে হৃদয়ে এই অনুরাগ পোষণ করিয়া আসিতেছে,—কিন্তু তাহা তো সে এক দিনও ব্যক্ত করে নাই। সে যাহাই হোক, সতী নারী ব্যতীত আর আর কিছু নয়। নারী যতই দৃঢ়চিত্তা হোক, কোনও না কোনও এক সময়ে হয়তো সে দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলে। রেখার কাছে সে তাহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে—এই মাত্র তাহার অপরাধ। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার দৃঢ়তা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; নচেৎ সে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে কেন?

কিন্তু হায়, স্বহস্তে নিজের প্রাণটা ছিঁড়িয়া অগ্নিতে দগ্ধ করা যে এ! সতী কি তাহার নারীবিদ্বেষ জানে না? জানিয়া শুনিয়া কেন সে এই নারী-দ্বেষীকে বরণ করিল,—কেন নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিল? হায় অন্ধা নারী, তোমার এ অন্ধ ভালবাসা এখনও ফিরাইয়া লও। যদি এখনও এই মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে এ চিন্তা উঠিয়া থাকে—তুমি মনীশের সুখ-দুঃখভাগিনী, সহচারিণী হইবে—সে তোমার ভ্রম, একেবারেই ভ্রম।

মনীশ একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, রেখা তাহারই মুখের পানে চাহিয়া আছে।

একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া, মনেরও বাহিক বিষণ্ণতাটা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া মনীশ বলিল, "আমি এ কথা শুনে হৃদয়ে যা আঘাত পেলুম, তা আর আপনাকে কি করে জানানো যায়? আমি কখনও আশা করিনি যে, বাস্তবিক এ রকমটা ঘটতে পারে, আমাকে দিয়ে কেউ ব্যথা পেতে পারে! আমি নিজেকে একেবারে সকলের বাইরে রেখেই আপনাদের সঙ্গে মিলেছি। আপনারা যে তাতে আমাকেই একেবারে চোর, প্রবঞ্চক বলে ধরে নিয়েছেন, এ কখনই উচিত নয়। আমি আশা করছি, আপনি সতীকে বেশ করে বুঝিয়ে বলবেন, যাতে সে আমার উপর থেকে তার এ আনুরক্তিটা ফিরিয়ে নেয়। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তাকে কিছুই দিতে পারলুম না; কিন্তু তারটা যে তাকে আবার ফিরিয়ে দিতে পারছি, এইটুকু আমায় একটু সান্ত্বনা দেবে। ভগবান তাকে সুখী করুন, আমি এই প্রার্থনা করছি।

রেখা হাসিল "অদ্ভুত আপনি—সে আমি বরাবরই জানি। আপনার কথাগুলো তার চেয়ে বেশী অদ্ভুত। ভালবাসা কাকে বলে তা আপনি কখনই জানেন না, তাই এ কথা বলতে পেরেছেন। আপনার সঙ্গে এ সব বিষয় নিয়ে কথা বলা আমার পক্ষে একেবারেই অনুচিত, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কাজ,—তবুও আমায় বলতে হবে—কারণ, আমি সতীকে বোনের মতই ভালবাসি; আর সে যে এ রকম হ'য়ে থাকবে, তা আমি মোটেই চাইনে। ভালবাসা যদি ফিরিয়ে নেওয়া যেত মনীশবাবু, তা হলে জগতে এত ব্যথা, এত চোখের জল থাকত না। আপনি যদি কাউকে ভালবাসতেন, তা' হ'লে বুঝতেন, ভালবাসাটা ফিরিয়ে নেওয়া যায় কি না! আপনার কথাগুলো অতি উচ্চাঙ্গের,—ওগুলো নাটক নভেলে ঠাঁই পেতে পারে,—আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে আসতে পারে না, কোন ফল দিতেও সমর্থ হয় না। হতে পারে, আপনি পুরুষ, আপনার মনের ভাব আলাদা,—আপনি নিত্য ভালবাসা পরিবর্ত্তন করতে পারেন। কিন্তু মেয়েদের তা হয় না মনীশ বাবু। তারা যেটা একবার আঁকড়ে ধরে, সেটা আর ছাড়তে পারে না। তাদের মনও যেমন কোমল, ভালবাসাও তেমনি কোমল। আবার ছিঁড়তে গেলে তেমনিই শক্ত হয়ে ওঠে, যা মৃত্যু পর্য্যন্তও ছিঁড়তে ভয় পায়।"

মনীশের মুখে হতাশার হাসি ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আপনি তাকে বলবেন—"

রেখা অধীর ভাবে বলিল, "না, আমি তাকে একটা কথাও বলব না। আপনার যদি হৃদয় থাকে—আমি আপনাকে গোপনে বলে গেলুম,—আপনি নিজেই এখন তার কথা ভাববেন। আমি আপনাকে জানিয়ে গেলুম,—আমার কর্ত্তব্যও শেষ হয়ে গেল। এখন আপনার যা খুসি আপনি করতে পারেন, বলতে পারেন তাকে।"

হাতের ঘড়ির পানে সে চাহিল। কাছেই একটা আলো জ্বলিতেছিল, তাহার আলোতে একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি আসি এখন, এখনি আমার খোঁজ পড়বে। আপনার যা কর্ত্তব্য আপনি বেছে নিন, আমি ছুটি পেয়ে গেলুম, নমস্কার।"

অভিবাদন করিয়া সে চলিয়া গেল।

অন্যায়—সম্পূর্ণ অন্যায় এ! মনীশকে ভালবাসিবার অধিকার কে সতীকে দিল? সতী কেন আপনা হারাইয়া তাহাকে ভালবাসিল,—কেন সাধ করিয়া দুঃখকে চির-জীবনের জন্য বরণ করিয়া লইল?

সারাজীবনের জন্য? হাঁ, তা বই আর কি! মনীশ নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতেছে,—এই মেয়েগুলির সামনে স্পষ্টতঃই তাহাদের নিন্দা করিতেছে,—যেন ইহারা তাহাকে ঘৃণাই করে, নারীদ্বেষী বলিয়াই ভাবে। ভাবেও তো তাই, কোন মেয়েই তো তাহাকে নিজের বলিয়া ভাবিতে, ভালবাসিতে পারে নাই,—তাহার মধ্যে ভালবাসিবার মত, মুগ্ধ হইবার মত কিছুই তো তাহারা দেখিতে পায় নাই! তবে সতী,—সে কেন মুগ্ধ হইল,—সে কেন এই নারীদ্বেষীকে ভালবাসার চোখে দেখিল?

সতীর সম্মুখে সুন্দর জগৎ,—ভবিষ্যৎ তাহার জন্য স্বামী, পুত্র, কন্যা, সোণার সংসার সাজাইয়া রাখিয়াছে,—সে মোহের বশে পড়িয়া কেন স্বেচ্ছায় সব হারাইবে?

এই গোপন উপাসিকার এ অর্ঘ্য নেওয়া মনীশের কখনই উচিত নয়—যখন সে করুণা-কটাক্ষে চাহিতে পারিবে। এ যেন তাহার অজ্ঞাতে আসিয়া পায়ের কাছে স্তূপীকৃত হইতে হইতে বুক পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছে, এখন তাহার সেদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। না, এ অর্ঘ্য যখন সে লইতে পারিবে না, তখন ভাল ভাবেই ফিরাইয়া দেওয়া উচিত,—পদাঘাতে ছড়াইয়া দেওয়া কোন মতে উচিত নয়।

মনীশ স্থির করিল, সে গোপনে সতীকে এক দিন সব কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিবে,—নিজের হৃদয়ের গোপন কথাটি পর্য্যন্ত সে প্রকাশ করিবে,—ইহাতে সতী নিজের ভালমন্দ বুঝিয়া সাবধান হইবার সময় পাইবে।

(২২)

সতীর ছুটি ফুরাইয়া আসিল, সে কর্ম্মস্থলে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সে দিন দুপুরে মনীশ ও আর কয়েকটী বন্ধুকে মৃন্ময় নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহাদের আহারাদি মিটিয়া গেলে, সতীকে মালতী দেবী আহার করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। রেখা ও ঊষা আগেই আহার করিয়া গিয়াছিল,—সতী এতক্ষণ কিছুতেই খায় নাই।

মৃন্ময় ডাকিল—"সতী, একটা কথা শুনে যা।"

সতী যখন গেল, তখন বন্ধুরা কেহই ছিল না, শুধু মনীশ ও মৃন্ময় তর্কে প্রবৃত্ত ছিল। তাহাদের তর্কও ভারি অস্বাভাবিক গোছের ছিল,—মাঝখানে কেহ আসিয়া না দাঁড়াইলে কিছুতেই তাহার মীমাংসা হইত না।

সতী ঘরে প্রবেশ করিতেই মনীশ তর্ক ছাড়িয়া দিল, বলিল "আর আমি তর্ক করতে চাইনে। আমি স্বীকার করছি, তোমারই জিত হল।"

মৃন্ময় গর্ব্বের সহিত বলিল, "তা বললে হবে না মনীশ, তোমায় তর্ক করতেই হবে। অমনি ছেড়ে দিলে লোকে বলবে, আমি যেন জোর করেই জিতলুম। তর্ক করে জেতার যে গৌরব, তা থেকে যে বঞ্চিত করবে আমায়, তা আমি কর্‌তে দেব না। কর তর্ক, চুপ করে থাকলে হবে না।"

মনীশ একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি যে দেখছি আচ্ছা লোক। তোমার সঙ্গে কথা বলাও ঝকমারী। গরীব বন্ধুটাকে কেন আর এমন করে নির্য্যাতন করছ বাপু? সতী, আমি তোমার সামনেই পরাজয় স্বীকার করছি, তোমার দাদাকে বল, ওঁর তর্কের জালখানা গুটিয়ে নিতে।"

মৃন্ময় বলিল, "তা কখনই হবে না। সামনে আমার আদর্শকে দেখে ভয় পেয়ে গ্যাছ। তোমার আদর্শ যিনি, দেখ গিয়ে—তিনি এতক্ষণ ছেলেটিকে কাছে নিয়ে ঘুম

করে ঘুম দিচ্ছেন। বুঝেছিস সতী—তর্ক আমাদের কি নিয়ে হচ্ছে জানিস? মেয়েদের বাল্যবিবাহের বিপক্ষে আমি, আর মনীশ তার স্বপক্ষে—অর্থাৎ যেটা গোড়া হতে তার স্বভাব, যে যা বলবে ঠিক তার বিরুদ্ধতাচরণ করা। বিশেষ তো আমি যা বলব তাই ওর গায়ে বিষের জ্বালা দেবে, আরও চেঁচিয়ে রসাতল কাণ্ড করবে। ভাগ্যে বাবা কোর্টে গ্যাছেন, নইলে এই দুপুর বেলায় চেঁচামেচি শুনলে তাঁর মাথা গরম হয়ে যেত,—আর তখন বাতাস, ঠাণ্ডাজল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হত। যাই বল মনীশ, ছোট বেলায় মেয়েদের বিয়ে দেবার অনুমোদন আমি একটুও করতে পারি নে। বড় হোক, ইচ্ছা হয় বিয়ে করবে, না ইচ্ছা হয় বিয়ে করবে না,—ফুরিয়ে গেল। এতে তর্কই বা কি, আর রাগারাগিই বা কি।"

মনীশ শান্ত স্বরে বলিল, "তর্ক আমি করিনি মৃন্ময়, তর্ক করছ তুমি। আমি যা বলছি, সেটা খাঁটি সত্য কথা। তুমি কি বলতে চাও—বিলাতই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছে? অবশ্য তুমি বিলাতে বছর কতক বাস করে এসেছ—আমার চেয়ে অভিজ্ঞতা তোমারই বেশী; কারণ, সেই দেশের মেয়েদের পরিচয় আমি প্রত্যক্ষভাবে পাই নি। তবে পরোক্ষভাবে যা পরিচয় পেয়েছি, তাতে জেনেছি, সেখানে—সেই উচ্চশিক্ষিতের দেশে বড় একটা কেউ আন্তরিক সুখী নয়। মেয়েদের যে সবার সঙ্গে মিশে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এতে তাদের এক দিক হতে সুখী করবার চেষ্টা করা হয়, আর এক দিক হতে অসুখীও করা হয়। তাদের চিত্তবৃত্তি যখন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তারা তখন একটা কাউকে কেন্দ্র করে বুকের সব ভাল-বাসাটা ঢেলে দেয় তার উপরে; কিন্তু শেষে কি তার সঙ্গে তার বিয়ে হয়—যাতে সে সারাজীবন বাস্তবিক অনন্ত সুখের অধিকারিণী হতে পারে? আমার মনে হয়—জগতে অনেকেই এমনি লক্ষ্যহারা ভাবে ঘুরছে,—অভীপ্সিতকে অনেকেই পায়নি। বুকের মধ্যে তাদের ব্যর্থতার আগুন,—কিন্তু মুখে দেখবে বেশ শান্ত। বেশ তারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে যায়, কিন্তু তাদের বুকের মধ্যে জাগে কেবল হাহাকার।"

কথাটা বলিতে বলিতে মনীশ সতীর পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল। সতীর মুখখানা মুহূর্ত্তে শবের মত মলিন হইয়া গেল, সে টেবিলটায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে চাহিল।

মৃন্ময় বলিল, "সেটা শিক্ষার দোষ বলো না মনীশ,—সেটা মনের দোষ। মনের এ রকম জড়তার ভাব কাটাতে পারবে বলেই তো শিক্ষা দেওয়া, নচেৎ শিক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? জগতে ভালবাসে অনেকেই অনেককে; কিন্তু ভালবেসে ব্যর্থতায় একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়া এ শিক্ষিতার কাজ নয়। কারণ শিক্ষাই তাকে আবার উপরের দিকে ঠেলে তুলে দেবে। কি রে সতী, তুই যে এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? তোকে আর দরকার নেই, ওই পানের ডিবেটা এদিকে এগিয়ে দিয়ে যা দেখি। বলতে গেলে—ওইটে দেবার জন্যেই তোকে ডেকেছি।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "বল যে মীমাংসা করবার জন্যে। পানের ডিবে এগিয়ে দিতে—অমন নিছক মিথ্যে কথাটা বোলো না, পাপ হবে। নিজে পেরে উঠছিলে না, তাই বোনকে ডাকা হল! জ্ঞানের ভাণ্ডার কি না—কিছু তর্কের শক্তি যদি দেয়।"

তাহার হাসিতে মৃন্ময় রাগিয়া উঠিল, বলিল "তা তো ঠিক কথাই। তোমার বোনের মত তো নয়, যে, একটা কথা যদি বললুম, অমনি দেখ, দেড়হাত ঘোম্‌টা টেনে দৌড়ে পালায়।"

সতী নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

বৈকালে সে খোকাকে কোলে লইয়া ত্রিতলের খোলা ছাদে বেড়াইতেছিল; সেই সময় মনীশ আসিয়া পড়িল—দেখি খোকাকে।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতা সতী খোকাকে মনীশের কোলে দিল।

মনীশ তাহাকে দুই চারিবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, দুইটা চুম্বন পুরস্কার দিয়া সতীর কোলে ফিরাইয়া দিল। সতী ভাবিয়াছিল, সে এখনি চলিয়া যাইবে; কিন্তু মনীশ গেল না, রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দূর আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

ফাল্গুনের শেষ, আকাশ বেশ পরিষ্কার, সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, পশ্চিম গগনের লাল আভা ছুটিয়া আসিয়া ধরা-বক্ষ লাল করিয়া তুলিয়াছে। মৃদু বাতাস বহিয়া

টবের ফুলগাছগুলি দুলাইয়া গন্ধ ছড়াইয়া দিয়া যাইতেছিল।

দাসী আসিয়া খোকাকে চাহিল, তাহাকে দুধ খাওয়াইতে হইবে। সতী খোকাকে তাহার কোলে দিল।

পিছন ফিরিয়া দেখিল, মনীশ রেলিংয়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তাহারই পানে চাহিয়া আছে। মুহূর্ত্তে সতীর মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল, মনীশ বাধা দিল, "একটা কথা আছে সতী।"

সতী থমকিয়া দাঁড়াইল, চকিত দৃষ্টি মনীশের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বলুন কি কথা ?"

মনীশ বলিল, "তোমার এখন ওদিকে কোনও কাজ না থাকে তো আমি বলি।"

সতী বলিল "কোনও কাজ নেই।"

মনীশ আর একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সতী, আমার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য তা আমি বলতে পারি নে—আমি যা জানতে পেরেছি তাতে আমি ভারি অসুখী হয়েছি। আমি কখনও আশা করিনি সতী, যে, তুমি আমায় এ চোখে দেখবে। এটা আমার পক্ষে অসম্ভাবিত পাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তো এ চাইনি সতী—"

সতী আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, নীরবে সে নতচোখে মাটীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বুকটা কাঁপিতেছিল, যেন সে চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে।

মনীশ বলিল "লজ্জা কর না সতী, যখন আমাকে ভালবেসেছ, আমায় সর্ব্বস্ব দান করেছ, তখন লজ্জা করবার কোন কারণ নেই। তুমি আপনাকে গোপন করবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু ভগবান তোমায় আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। ভালবাসা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, এ প্রত্যেক জীবের বুকেই আছে, এতে লজ্জা করবার কিছুই নেই। কিন্তু আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, এই ভেবে সতী—তোমার একাগ্র প্রেম একেবারেই ব্যর্থ হল, আমায় শুধু দিচ্ছ, কিন্তু কিছু পেলে না।"

সতী একবার চোখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল, মনীশ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার পানেই চাহিয়া আছে। মুখ নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি কিছুই পেতে চাই নে।"

উদ্বেগভরা কণ্ঠে মনীশ বলিল, "কিছুই পেতে চাও না, শুধু দিয়ে যেতে চাও ? আমি যতদিন কিছু না জেনেছিলুম সতী, যা দিয়েছিলে সবই আমার কাছেই ছিল। এখন জেনেছি, জেনে শুনে আমি কিছুই তো নিতে পারব না সতী, তোমার সব তোমাকেই ফিরিয়ে দিতে চাই যে।"

সতী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল চোখে মনীশের পানে চাহিল, ধীরকণ্ঠে বলিল "আপনি সবই জেনেছেন, আমার গোপন কথা আপনার কাছে প্রকাশ হয়ে গ্যাছে, আর আমায় লুকিয়ে রাখা আমার মিথ্যা আয়োজন মাত্র। আপনি বলছেন, সব ফিরিয়ে দেবেন,—কি ফিরিয়ে দেবেন আপনি ? আপনার ফিরিয়ে দেবার তো কোনও অধিকার নেই। আমি যা দিয়েছি, তা আমি আর নেব না, নেবার ক্ষমতা আমার আর নেই।"

মনীশ ব্যথাভরা চোখে তাহার পানে চাহিল। হায় নারী, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার এ কি চেষ্টা তোমার ? এ যে তাসের ঘর সাজানো, একটী ফুৎকারের জোরও যে ইহার সহে না। মিথ্যা ঘর সাজাইতেছ, সব ভাঙ্গিয়া যাইবে, সব উড়িয়া যাইবে।

মনীশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু আমার এ যে একেবারেই অসহ্য সতী,—আমি যে এ বইতে পারব না।"

সতী বলিল "কিসে আপনার অসহ্য হল ? আপনি যেমন আগেও ছিলেন, তেমনি এখনও থাকবেন। কে কোথায় আপনার কথা ভাবছে, তা এত দিন যেমন ভাবেন নি, এখনও তেমনি ভাববেন না, তেমনি নির্ব্বিকার থাকবেন। আপনাকে কি বোঝা বইতে হবে মনীশ বাবু, আপনাকে কি জ্বালা সইতে হবে ? সূর্য্য আকাশে ওঠে, প্রচুর কিরণ বর্ষণ করে, তার পর চলে যায়। কোথায় ক্ষুদ্র ফুলটি ফুটে তার পানে তাকিয়ে থাকে, সেদিকে সে তাকিয়েও দেখে না। আপনি কেন আমার দিকে তাকাবেন, আমার কথা ভাববেন ? আপনি জগতে এসেছেন যা করতে, তাই করে যান। আমার কথা ভেবে নিজেকে একটুও ব্যথিত করবেন না, এই আমার প্রার্থনা। আমি যে বালিকা কাল হতে আপনাকে ভালবেসে এসেছি, এত দিন তা তো জানেন নি। রেখা নিশ্চয়ই আমার কথা আপনাকে বলেছে, তাই আপনি আমায় বুঝাতে এসেছেন।"

মনীশ তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে নিজে ভালবাসিয়াছে,—সে ভালবাসাও এমনি ব্যর্থতায় ভরা। তাই সে সতীর হৃদয়ের ব্যথা বুঝিল। এই নারীর ভালবাসা লইয়া সে নিজেকে একটুও সুখী ভাবিতে পারিল না, দুঃখে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল।

মনীশ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "তোমার ভালবাসা স্বর্গীয়, একে ফিরিয়ে নিতে বলাই মূর্খের কাজ। আমি এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছি সতী, তোমার স্বর্গীয় ভালবাসা যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হল না। এ ভালবাসা উর্ব্বর জায়গায় পড়েনি, পড়ল অনুর্ব্বর জায়গায়, যেখানে কিছুই ফল হল না। সতী, আমার কষ্টের কথা তোমায় বলছি, আমার সব কথা শুনলে তুমি আমায় ঘৃণাই করবে,—তোমার সেই ঘৃণাই আমার প্রার্থনীয়। আমি একজনকে ভালবাসি, তুমি যেমন সারা প্রাণমন ঢেলে দিয়ে আমায় ভালবাস সতী, আমিও তাকে তেমনি ভালবাসি। আমিও আমার মনকে ফিরাবার এত চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। যদি আমার নিজের বলে কিছু থাকত, তবে তা তোমায় দিয়ে—"

সতী শান্তকণ্ঠে বলিল, "না, আমি কিছু কোন দিন চাই নি, কখনও চাইব না। আমি বরাবর জানি, আপনি অন্যকে ভালবাসেন। সে যে কে, তাও জানি।"

"তাও জানো—সতী, তুমি তাও জানো ?"

আবেগে মনীশ সতীর হাতখানা চাপিয়া ধরিল, তখনি অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া গিয়া বলিল, "তুমি জানো—সে কে ?"

সতী একটু হাসিল, বলিল, "আপনি আমার কাছে কি লুকাবেন মনীশ বাবু,—আপনার গোপন কথা আমার কাছে গোপন নেই। আমি আপনার কথা শুনে বহুকাল আগেই জেনেছি, আপনি উমাকে ভালবাসেন।"

মনীশের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠিক কথা বলেছ সতী। তবে দেখছ, আমার বুকখানা কি রকম ব্যর্থতায় ভরা ? উমা যে কি, তা তুমি দেখেছ, তাকে চিনেছ ?"

সতী উত্তর করিল, "হ্যাঁ, তাকে আমি দেখেছি, চিনেছি। সে পৃথিবীর মানুষ নয় মনীশ বাবু, সে স্বর্গের দেবী। যে তাকে দেখেছে, সেই তাকে ভালবেসেছে। আমিও যে তাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসি মনীশবাবু !"

মনীশ বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল, "সে কেবল তুমি আমায় নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসতে পেরেছ বলে ; যদি স্বার্থজড়িত ভালবাসা হত, তবে আমার ভালবাসার পাত্রীকে তুমি ঘৃণাই করতে সতী ! তোমার ব্যর্থ ভালবাসা আমি উপলব্ধি করছি নিজের ব্যর্থ ভালবাসা দিয়ে। তবু এতে অনেক পার্থক্য আছে যে সতী। আমার ভালবাসার যে পাত্রী সে নিখুঁত, তার চরিত্রে, তার রূপে কেউ ত্রুটি বার করতে পারবে না। তোমার ভালবাসার যে পাত্র, তার যে অনেক ত্রুটি আছে। আমার মন যে অন্যাসক্ত, সে ছাড়া আর সব নারীকেই আমি ঘৃণা করি, এ জেনেও তুমি এমনি অটুট ভাবে আমায় ভালবাসবে ?"

দৃঢ়কণ্ঠে সতী উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এমনি অটুট ভাবে। মনীশ বাবু, আপনি আমার চোখে যে কি—তা আমি জানাতে চাই নে। আমি দেখছি, ভালবাসার বস্তুকে উপভোগ করলেই সব ফুরিয়ে যায়। আমি উপভোগ করতে চাই নে, ভক্ত যেমন দেবতাকে ভালবাসে, আমি তেমনি আপনাকে ভালবাসি। আপনাকে পাবার জন্যে আমি আপনাকে ভালবাসি নি। আপনার দেহের কামনা আমি রাখি নি। আমি চাই দেহের ভিতরে যে আছে তার সঙ্গে আমার প্রাণের সম্মিলন। এই যথার্থ বিবাহ, এই জগতে স্বর্গ। তাই আপনি যখন আমায় আশীর্ব্বাদ করলেন—চির এয়োস্ত্রী হও, আমি সে আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিলুম, কারণ, আমি জানছি, আমার বিয়ে হয়ে গ্যাছে, আমি কুমারী নই। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই ভালবাসা আমার অটুট থাকে, আমি যেন দূরে থেকে আপনাকে পূজা করে যেতে পারি।"

মনীশের পায়ের কাছে সতী অবনত হইয়া পড়িল। তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিতে গিয়া, তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল।

মনীশ ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া ছিল,—তাহার দৃষ্টি তখন বড় উদাস। অনেকক্ষণ পরে চোখ নামাইয়া সে যখন সতীর উপর রাখিল, সতী তখন চোখ মুখ মুছিয়া বেশ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মনীশ বলিল, "এত ভালবাসা জীবনে

কখনও অনুভব করিনি সতী, তাই ভাবছিলুম, ভগবানের রাজ্যে সত্যই কি এ রকম থাকে ! আমি নিজেকে তোমায় দান করছি, সতী,—যদি আমায় স্বামীরূপে পেতে চাও, বল, আমার হাত ধর, চল, আমি তোমার বাপমায়ের কাছে এখনি এ প্রস্তাব করছি।”

সে সতীর দিকে দুখানা হাত বাড়াইয়া দিল।

সতী সে হাত দুখানা দুই হাতে লইল, একবার নিজের ললাটের উপর; মাথার উপর রাখিল। তাহার পর ছাড়িয়া দিয়া অশ্রু সজল চোখে মৃদু হাসিয়া বলিল, “বড় অধিকার আমায় দিলে। আজ তোমায় আপনি বলব না, আজ তুমি আমার স্বামী। কিন্তু, মাপ কর দেবতা আমার, আমি তোমায় ভোগের বস্তু বলে জ্ঞান করতে পারব না। তুমি আমার স্বামী, বহু ঊর্দ্ধে তোমার আসন, তোমায় আমি আমার এত কাছে পেতে চাইনে। তুমি যে কামনা বাসনার অতীত, তুমি যে আমার চিরজীবনের বাঞ্ছিত। তুমি তফাতে থাক, আমি শুধু তোমার পূজা করে যাই।”

কঠিন-হৃদয় মনীশেরও চোখ দুইটা মুহূর্ত্তের তরে সজল হইয়া উঠিল, “বড় দমন করতে পেরেছ সতী,—হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে ? আমি তোমার হাতে আমায় দিলুম, তুমি তা তেমনিই ফিরিয়ে দিলে। ভালবেসে তুমি পরাজিত হও নি, ভগবান তোমারই মাথায় যশের কিরীট পরিয়ে দিলেন, কারণ তুমি যথার্থ ত্যাগী, তুমিই বিজেতা।”

নীচে মৃন্ময় ভারি গণ্ডগোল করিতেছিল “কোথা গেল মনীশটা, খুঁজে খুঁজে হায়রাণ ! আসুক সে রাস্কেল, আচ্ছা করে তার কাণ মলে দেব।”

মনীশ মুহূর্ত্তে আপনাকে সরস করিয়া লইল, রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাসিমুখে বলিল, “যাচ্ছে রাস্কেল, কাণমলা তোমারও পাওনা আছে।”

সতীর পানে ফিরিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল “যাই সতী ?”

সতী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “যাও, হয় তো এই জন্মের মত দেখা। আমি তোমার সামনে আর আসব না, কারণ ত্যাগের আদর্শ যদি বরাবরই না ঠিক রাখতে পারি। আজ তোমায় পেয়ে ছেড়ে দিলুম,—হয় তো এমন দিন আসবে, আমিই আবার তোমায় পাবার জন্যে লালায়িত হব। তুমিও মনে বুঝে দেখ, আমাদের দুজনের দেখা শুনা হওয়া আর কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। আমি কাল সকালে চলে যাব এখান হতে, যখন আবার আসব, তোমার সঙ্গে দেখা করব না। কিন্তু তবু—যদি কোনও দরকার পড়ে, আসবে তো ?”

মনীশ বলিল, “আসব বই কি সতী !”

সতী বলিল “আর যদি তোমার কোনও দরকার পড়ে, বল আমায় ডাকবে ? বল ডাকবে কি না ?”

আর্দ্রকণ্ঠে মনীশ বলিল “ডাকব সতী, তখন তোমায় নিশ্চয়ই ডাকব।”

“তবে যাও তুমি—”

সতী সরিয়া গেল, মনীশ চলিয়া গেল।

তখন অন্ধকারে সারা আকাশপথ ছাইয়া গিয়াছে। নীচে রাজপথে আলো জ্বলিতেছে, তাহার জ্যোতিঃ অন্ধকার ভেদ করিয়া খানিকদূর পর্য্যন্ত উঠিতে সক্ষম হইয়াছে।

যেখানে মনীশ দাঁড়াইয়া ছিল, সতী সেইখানে লুটাইয়া পড়িল—সার্থক, ওগো, তার শিক্ষা, তার ভালবাসা! সে নিজে সবই সার্থকতা লাভ করিয়াছে, কিছুই তাহার ব্যর্থ যায় নাই। তোমার হাতখানা সে ললাটে বুকে মাথায় দিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার বেশী আকাঙ্ক্ষার জিনিস আর কি আছে ? আজ সে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, আজ তাহার প্রাণ পূর্ণ, তাহার জগৎও আজ শূন্য নয়, পূর্ণ। সব পূর্ণ, শূন্যতা কোথাও নাই !

বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী

শ্রীমুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু “সুরধুনী কাব্যে” লিখিয়াছেন—

“পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যেদিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর।
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এইস্থানে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথক কুলের কেতু কাঞ্চন বরণ।
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়॥”

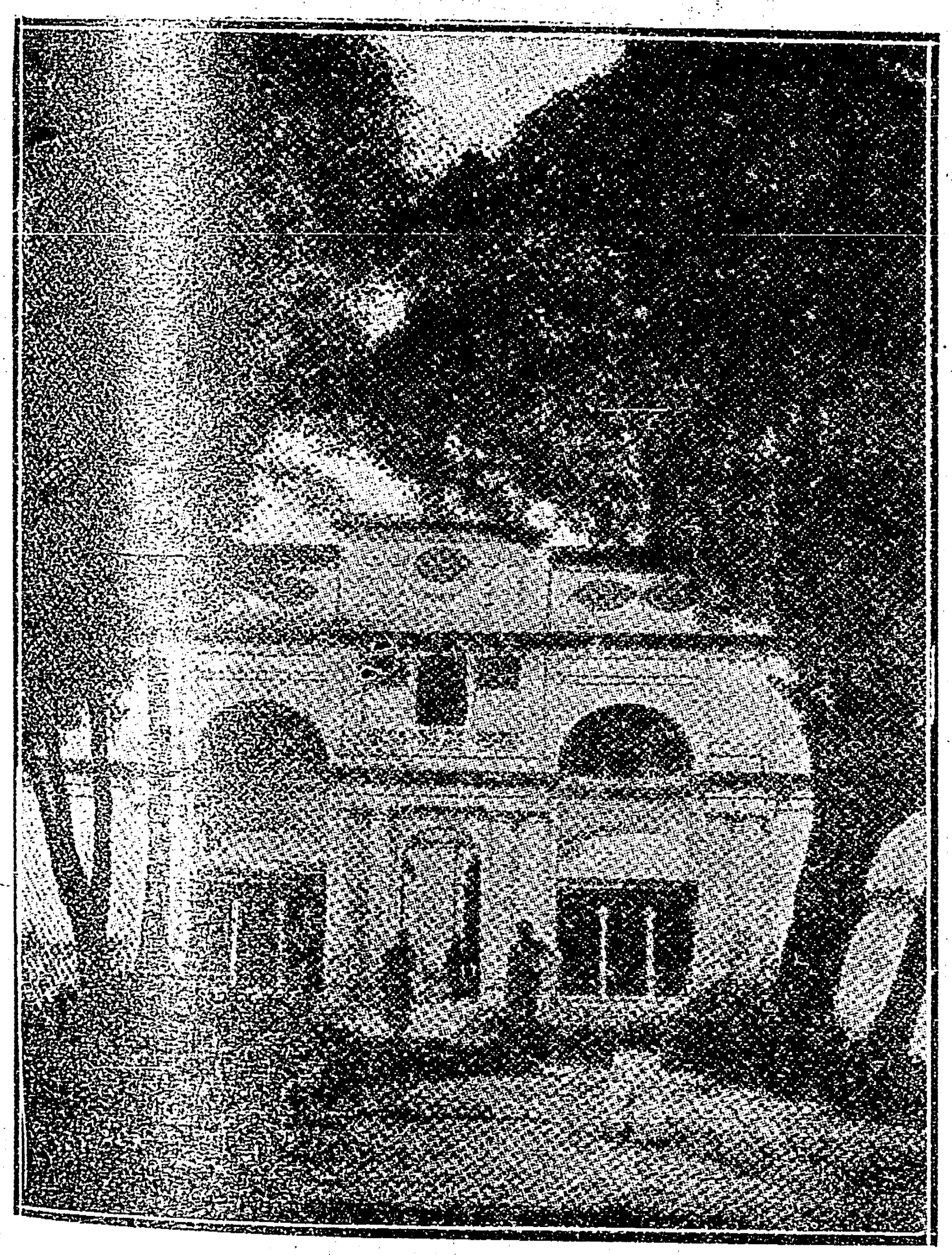

বাঁশবেড়িয়া দুর্গের তোরণ-দ্বার

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কত কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে পরিপাটী বংশবাটী আর নাই, সে মনোহারিত্ব লুপ্ত হইয়াছে, সুন্দরত্বও ঘুচিয়াছে—বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতের স্থলে নামে মাত্র পণ্ডিতেরও বাস নাই—শাস্ত্রালোচনা বার মাস দূরের কথা, বৎসরে এক দিনের জন্যও ঘটে না। শ্রীধরের স্মৃতি সর্ব্বধ্বংসী কালের ক্রোড়ে লুপ্ত।

আড়াই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বংশবাটী গ্রাম স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে ইহা সম্ভবতঃ নগণ্য ছিল। ১৪৯৯শকে অর্থাৎ

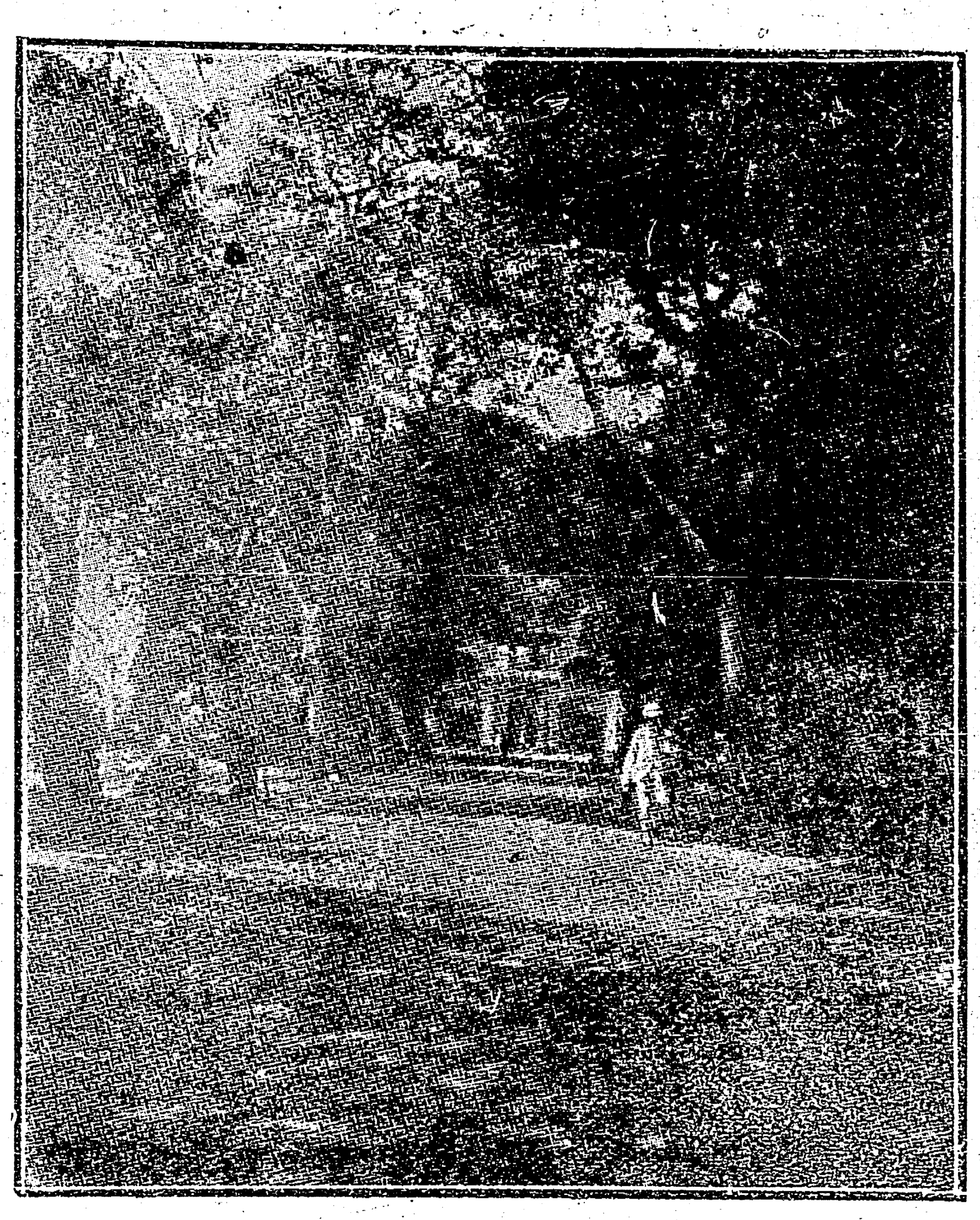

বাঁশবেড়িয়ার তোরণ-দ্বারের সম্মুখে বকুলকুঞ্জ

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবি কঙ্কণ “চণ্ডী” রচনা করেন। চণ্ডীতে গঙ্গার পূর্ব্ব কূলের হালীসহর গৌরীপুর প্রভৃতির ও পশ্চিম কূলের সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী প্রভৃতির উল্লেখ আছে, বংশবাটীর উল্লেখ নাই। সে সময় বংশবাটী সমৃদ্ধ জনপদ হইলে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত। গ্রাম স্থাপন করেন আমার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়। এখানে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধে দু’চার কথা বলিতে হইবে, নতুবা কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশবাটী আসিবার পূর্ব্বে ভাগীরথী-তীরে পাটুলী গ্রামে বাস করিতেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ পাঁচটী সমাজে বিভক্ত; তন্মধ্যে নিম্ন বঙ্গ পাটুলী সমাজের অধীন। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সেই সমাজের সমাজ-পতি ছিলেন। আমার ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ জয়ানন্দ রায় চৌধুরী মজুমদার কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য মোগল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের সাহায্যে গঙ্গার পশ্চিম তটে বহু স্থান লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ নির্ণয়ের" পরিশিষ্ট ভাগে তাহার সবিস্তার পরিচয় দেওয়া আছে—আমি কয়েক ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

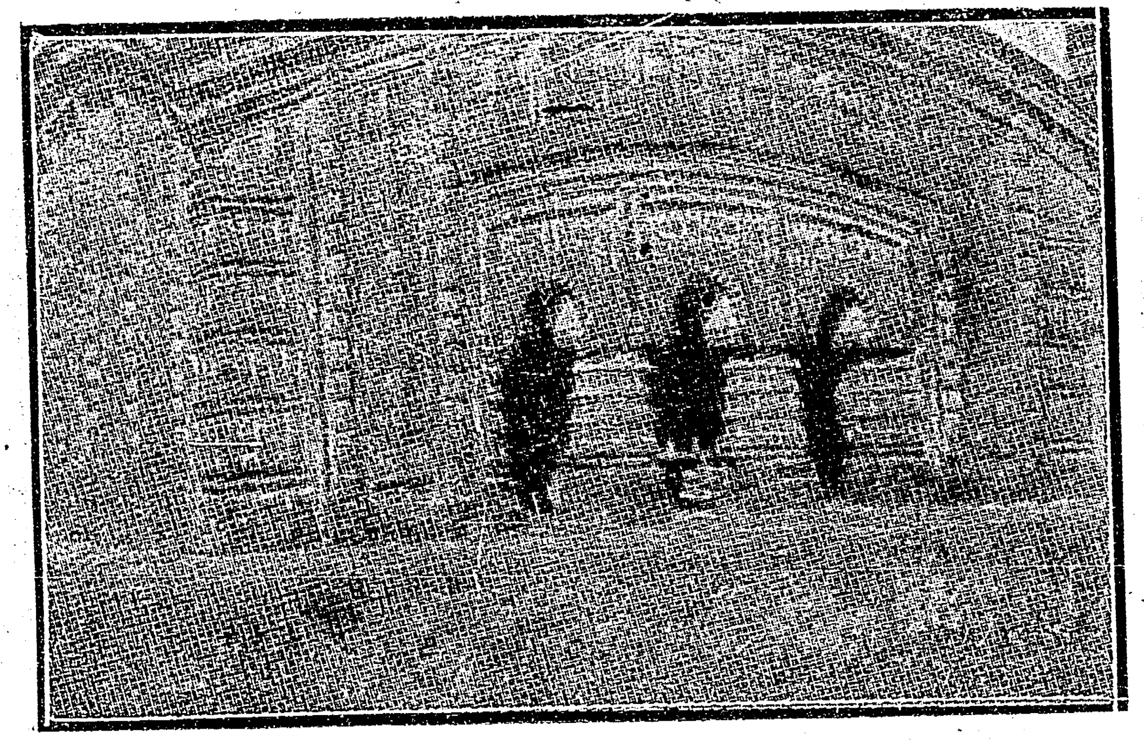

বিষ্ণুমন্দির (১)

পাটুলিতে হয় শূদ্রমণি জমীদার
তাঁহাকে ডাকায়ে রাজা কহে সমাচার

*　　*　　*　　*

শূদ্রমণি মহাশয় কর জোড় করি।
দেখেন রাজার মনে আনন্দলহরী।
রাজা কহে ওহে তুমি যে কার্য্য করিলা
তার পরিতোষ তুমি লহ এই বেলা।
মহাশয় কহিলেন আপন কৃপায়
অভাব নাহিক কিছু এই বাঞ্ছা হয়।
ঈশ্বরীর তীরে মম তরণী ভিড়ান
নিজ দেহ নিজ স্থানে পায়ে যেন স্থান।
মধ্যে মধ্যে আছে মম গমনাগমন
দুই চারি দিন করি নীরে যে ভ্রমণ।
তথাস্তু কহিয়া রাজা তাহাই যে করিল—
গঙ্গার পশ্চিম তটে বহু স্থান দিল।

তার পর সেই মোগল রাজত্ব কালেই তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তি বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মুরশিদাবাদ হইতে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত নদীর পশ্চিম তটের বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। সেই সকল সম্পত্তির মধ্যে আর্শা পরগনা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। তাহার পর মামদানীপুর-হুগলী বন্দর হইতে কলিকাতার পর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুবিখ্যাত পঞ্চম রিপোর্টে ইহার

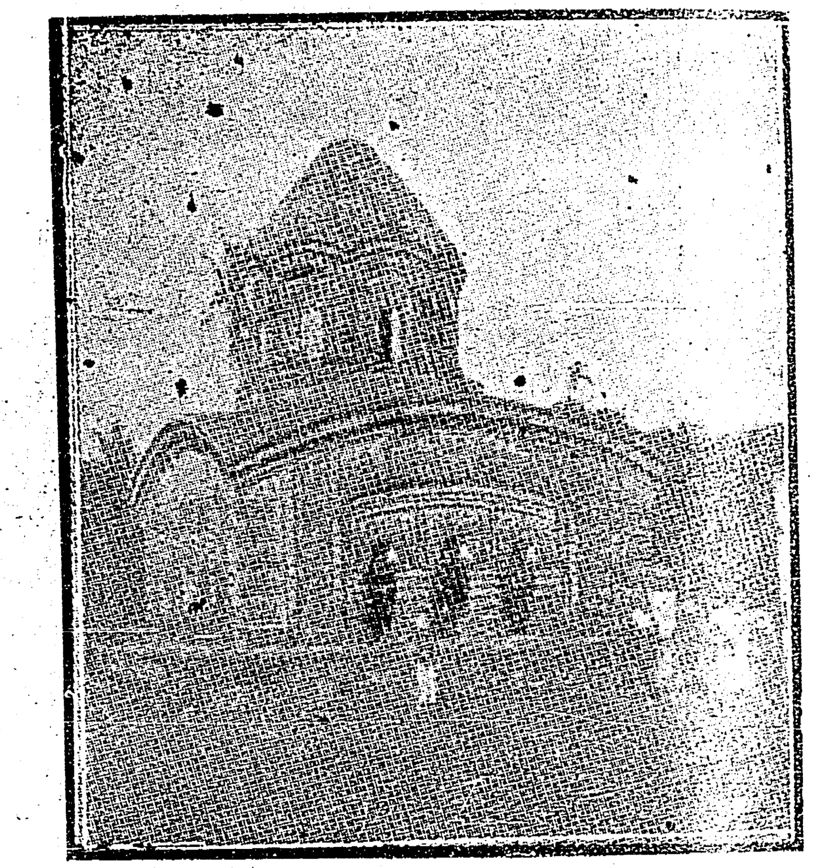

ফু-মন্দির (২)

বিস্তৃতি ৭০০ বর্গ মাইল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তৎ-কালীন য়ুরোপীয় জাতিসমূহের বাণিজ্য কুঠী সকল ইহার মধ্যে অবস্থিত ছিল। তাহার পর হাতিয়া-গড়—কবি কঙ্কণের চণ্ডীতে যাহা হাথাগড় বলিয়া উল্লিখিত আছে—যাহা এখনও আমাদের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে।—এই সকল সম্পত্তি সুপরিচালনের জন্য আর্শা পরগনার অন্তর্গত এই বংশবাটী গ্রামে রাজা রামেশ্বর আগমন করেন। তিনি ১০৯০ হিজরা (১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে) ১০ সফর তারিখে বংশানুক্রমিক রাজোপাধিতে ভূষিত হইয়া সেই বৎসর ১৭ই জলুস সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট বাঁশবেড়িয়ায় বসবাসের জন্য ৪০১ বিঘা নিষ্কর জায়গীর লাভ করেন ও তথায় প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ ও স্বাধিকার মধ্যে বিচার-আচার করিবার ক্ষমতা লাভ

করিয়া বংশবাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নানা স্থান হইতে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অনেক ঘর কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বিবিধ আচরণীয় হিন্দুকে আনাইয়া গ্রামে বাস করান ও বহু চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তিনি বংশবাটীর ভট্টাচার্য্য-বংশের পূর্ব্বপুরুষ বিখ্যাত পণ্ডিত

হংসেশ্বরী মন্দির

রামশরণ তর্কবাগীশকে বারাণসী ধাম হইতে আনাইয়া স্বীয় সভাপণ্ডিত পদে বরণ করেন। বংশবাটী ক্রমে বিদ্যাশিক্ষার একটী প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। সে সময় নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজের সহিত বংশবাটী সমকক্ষতা লাভ করে। তখন ভট্ট-পল্লীতে পণ্ডিত-বংশের বাস হয় নাই। ঠাকুর-বংশের আদি পুরুষ নারায়ণ ঠাকুর নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সমসাময়িক।

শিশুদের ভীতি-উৎপাদনসূচক ঘুম পাড়ানিয়া গীত "বর্গী এল দেশে" অলীক ছেলে-ভুলান কল্পনা-রাজ্যের কথা নহে—বাস্তবিকই এককালে বর্গীদের অত্যাচারে বঙ্গদেশ ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বর্গীরা হুগলী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন করিয়াছিল। কিন্তু বংশবাটী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদসমূহের অধিবাসিগণ ধন রত্ন সহ আমাদের গড়ের মধ্যে আশ্রয় লইয়া সেই কয়েকবারই রক্ষা পাইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ বিফল-মনোরথ হওয়ায় একবার বর্গীরা "গড়বাড়ী" অবরোধ করিয়াছিল। রাজা রঘুদেব সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া এক ভীষণ যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাভূত করেন। তাহার পর বর্গীরা আর এ অঞ্চলে আসে নাই। এই রাজা রঘুদেবই নদীয়ার রাজাকে স্বীয় রাজস্ব হইতে লক্ষ টাকা দিয়া নবাব মুরশীদকুলীর "বৈকুণ্ঠ" হইতে রক্ষা করেন। আর তিনিই বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ বিঘা ভূমি ব্রহ্মত্র দান করিয়া বহু পুণ্য সঞ্চয় করেন। তাঁহার পুত্র রাজা গোবিন্দ দেব যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার পুত্র নৃসিংহদেব মাতৃগর্ভে। এই সময় তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি বর্দ্ধমানের জমীদারীভুক্ত হয়। নৃসিংহদেব তাঁহার ইরাদ্‌দস্তে লিখিয়াছেন—"সন ১১৪৭ সালে মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়, সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্দ্ধমানের জমীদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে, খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত পুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারি আপন মালিকের জমিদারি সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে খামখা দখল করে ও হলদা পরগনা কিসমতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল তিনিও ঐ সন কিসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাস্তা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল, পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না অতএব তালুক মজকুর আমার

হংসেশ্বরী মন্দিরের নাট্য-মন্দির

দখল আছে। সুবে বাঙ্গলার কোন জমিদার ও তালুকদারের পর এমত বেইনসাপী ও বেদায়ত কখন হয় নাই।

"সন ১১৮৫ সালে গবনর জনরল শ্রীযুক্ত মেস্ত্র হিষ্টিন সাহেব ও সাহেবান কৌন্সল হক ইনসাপ মতে তজবীজ তহকীক করিয়া, আম্নার গিরাখ জানিয়া আমার পৈত্রিক জমিদারির মধ্যে যে সকল মহাল বর্দ্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিষপরগনার সামিল হইয়াছিল, সেই মহালাতের জমিদারিতে ইস্তক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ও কৌসল ও কমিট হইতে সনন্দ দিয়াছেন।"

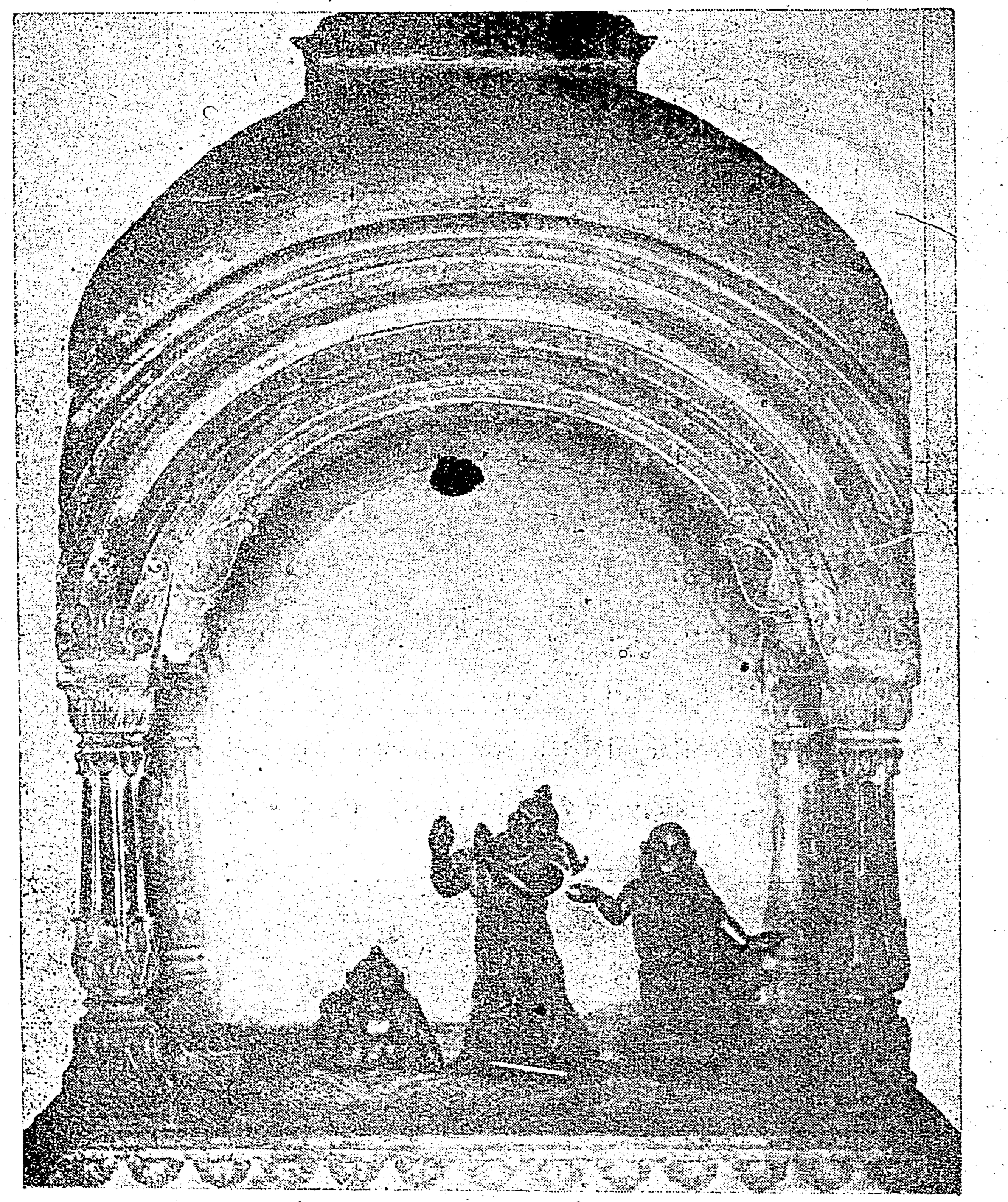

বাঁশবেড়িয়ার ৺শ্রীকৃষ্ণ ৺শ্রীরাধিকা, ৺শ্রীগোপাল জিউ

এই সময় অর্থাৎ ১১৪৮ সাল হইতে বংশবাটী মৌজা বর্দ্ধমানের দখলে আসে। ভূস্বামিত্ব লোপ পাইলেও গ্রামের সহিত আমাদের বংশের সম্পর্ক এযাবৎ ঘুচে নাই।

বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির রাজা রামেশ্বরের স্থাপিত। ১৬০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-গাত্রে ইষ্টক-ফলকে পৌরাণিক যুগের ইতিহাস মূর্ত্ত অভিব্যক্ত। তৎকালের সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, যুদ্ধ বিগ্রহ, যান বাহন, অর্ণবপোত, পূজা পার্ব্বন, মিছিল আনন্দোৎসব, দেব দেবী, কিন্নর কিন্নরী, দৈত্য দানব, পশু পক্ষী, অধুনা বিলুপ্ত বিবিধ অদ্ভুত আকৃতির জীব জন্তুর প্রতিকৃতি, নানাবিধ চক্র, লতাগুল্ম বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত ইষ্টক-ফলকে অঙ্কিত। সেই ইষ্টকে মন্দিরটী গ্রথিত। ইষ্টকগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরের সামগ্রী। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ বঙ্গের ছোট লাট সার জন্ উডবরণ যখন আমাদের বাড়ীতে আসেন, তখন এই মন্দির দেখিয়া বলেন—অঙ্কিত ইষ্টকগুলি এত সুন্দর যে, প্রত্যেকখানির চিত্র সংগ্রহ করিয়া কাঁচের আবরণে ফ্রেম যুক্ত করিয়া দেওয়ালে রাখিলে নিঃসন্দেহে গৃহ-শোভা বর্দ্ধিত হইবে। তিনি তাৎকালিক ভারত-বর্ষের সহকারী ডিরেক্টার জেনারল অব আর্কিওলজি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অঙ্কিত ইষ্টকের চিত্রগুলি প্যারিশ প্লাষ্টারে সংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্য এখানে পাঠাইয়া-ছিলেন। পূর্ণবাবু এখানে অনেক দিন থাকিয়া অনেকগুলি নক্সা লইয়াছিলেন। অতীব পরিতাপের ও লজ্জার বিষয়—এহেন সুন্দর মন্দিরটি আমাদের যথেষ্ট যত্নের অভাবে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে মন্দির গাত্রে এই শ্লোকটি খোদিত আছে—

মহী ব্যোমাঙ্গ শীতাংসু গনিতেশক বৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণু-মন্দিরং ॥ ১৬০১

বাঁশবেড়িয়া মহিষমর্দ্দিনী বা সয়ম্ভবা মন্দির ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা নৃসিংহ দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একখানি প্রস্তর-ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অঙ্কিত আছে—

আশা চলেন্দু সম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ সয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীনৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহ দেব দত্ততঃ ॥

দেবী মূর্ত্তিটি রাজা নৃসিংহ দেব স্বপ্নে প্রাপ্ত হন।

মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উদ্ধারের জন্য একটি পুষ্করিণী খনন করিতে হয়—তন্নিম্নে মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়।

সুবিখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির রাজা নৃসিংহ দেবের পত্নী রাণী-শঙ্করী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে—

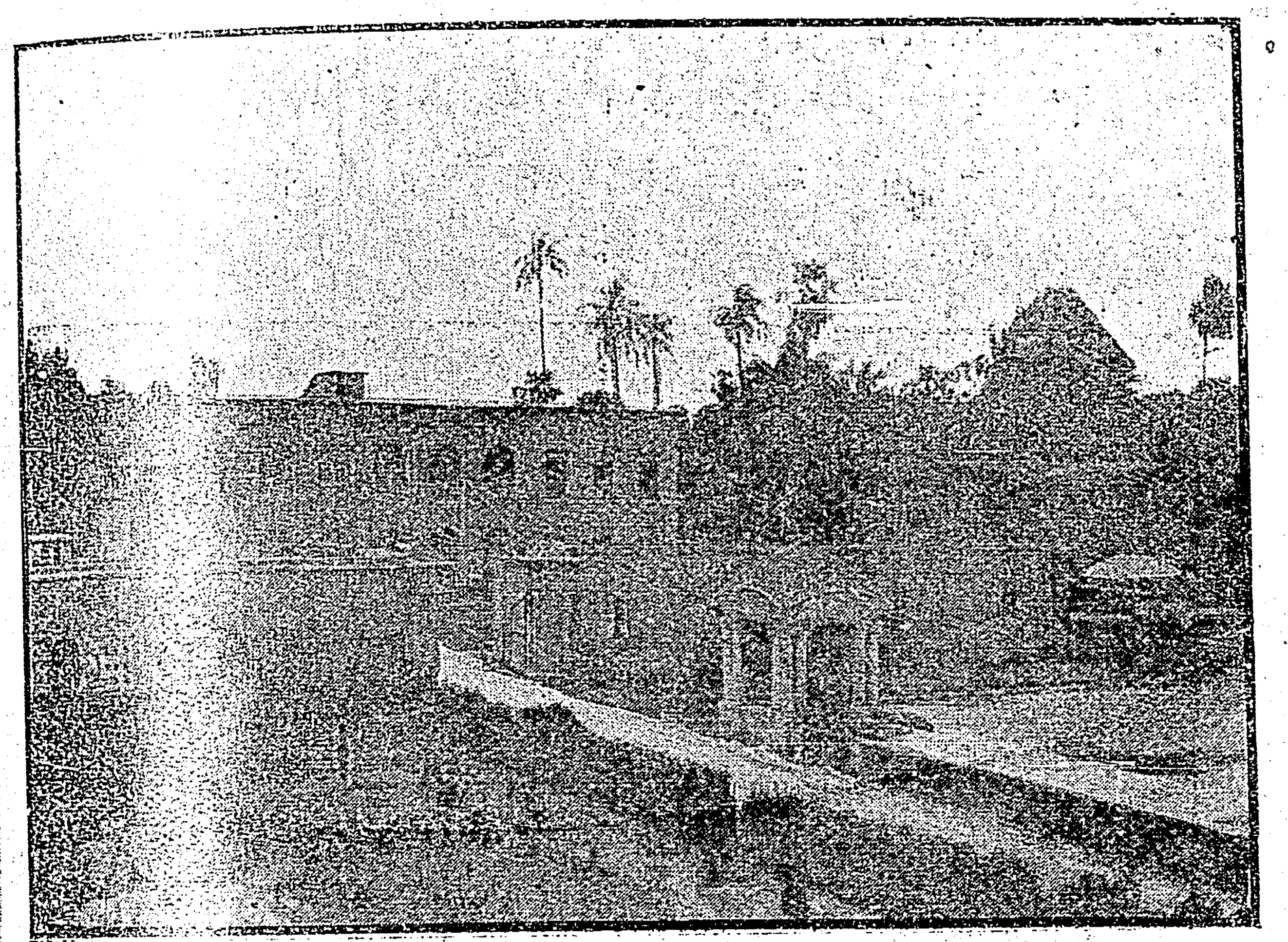

বাঁশবেড়িয়ার মন্দির সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান

শাকাব্দে রসবহ্নি মৈত্র গণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার চতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং ॥
ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতনারব্ধং তদাজ্ঞাণু গা।
তৎ পত্নী গুরুপাদপদ্ম নিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে ॥
শকাব্দা ১৭৩৬।

ছোট বড় ত্রয়োদশ চূড়াসমন্বিত সুবৃহৎ মন্দিরটি তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ প্রণালীতে গঠিত—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না বজ্রাখ্যা চিত্রিনী নাড়ীগুলি মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত সোপান-শ্রেণীতে অভিব্যক্ত। দেবী-মূর্ত্তি কুলকুণ্ডলিনী বা পরাশক্তির বিকাশ। উচ্চ বেদীর উপর ত্রিকোণ যন্ত্রে দেবাদিদেব মহাদেব যোগনিদ্রায় শয়ান আছেন। তাঁহার নাভিকুণ্ড হইতে পদ্ম উত্থিত হইয়াছে—তদুপরি দেবী হংসেশ্বরী দক্ষিণাস্য হইয়া কল্পতরু-মূলে উপবিষ্টা আছেন।

গ্রামে আরও কয়েকটি দেবস্থান আছে—৺আনন্দময়ী, শ্রীধর কথক বংশের ৺কালীমাতা, ৺পঞ্চানন বাবাঠাকুর, ৺গিরিধারী ঠাকুর ও গঙ্গাতীরস্থ ছয় মন্দিরের ঘাটের শিবলিঙ্গমূর্ত্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। ৺গিরিধারী ঠাকুরের সেবার জন্য ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে।

রাজা নৃসিংহদেব "উড্ডীশ তন্ত্র" রচনা করেন। "কাশী-খণ্ড" পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেন। ভূকৈলাসের রাজা জয়-ঘোষাল কাশীখণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥
মিত্র শত চৌদ্দ শকে পৌষ মাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে ॥
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলী নিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী ॥
তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা ॥

*   *   *

মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
তাহারে করেন রায় তর্জ্জমা-খশড়া ॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুধিয়া ॥

*   *   *

পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিস্কার।
রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার ॥

বাঁশবেড়িয়ার ৺সয়ম্ভবা

জগন্নাথ মুখুর্য্যা হইতেছেন বংশবাটীর ডাক্তার ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

বংশবাটী শ্রীধর কথকের জন্মস্থান—তাঁহার রচিত গীত বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ, তাহার পৃথক পরিচয় অনাবশ্যক। শ্রীধর কথক, শ্রীনারায়ণ ঘোষ—হাজরা ও পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন সৌহৃদ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই তিন জনের রচিত গীত "সঙ্গীত রত্নাবলী" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঁশবেড়িয়ার ৺বিষ্ণু বা বাসুদেব

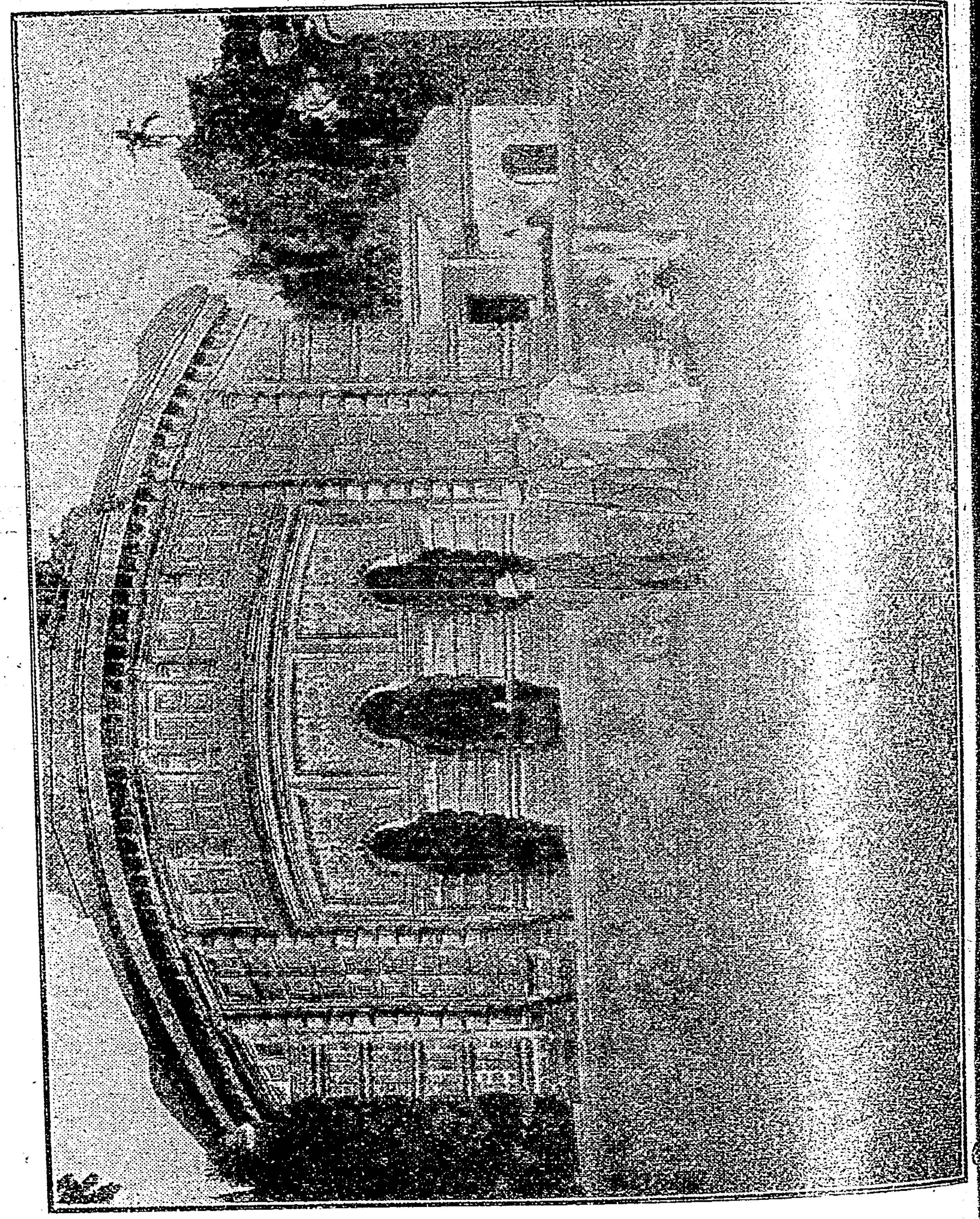

বাঁশবেড়িয়ার ৺বাসুদেব ও সয়ন্তবা মন্দির (দক্ষিণাংশ)

পূর্ব্বে বলিয়াছি বংশবাটী এ প্রদেশের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ৭০ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে ২৫টী চতুষ্পাঠী ছিল। অধ্যাপক ছিলেন ১। রামপ্রসাদ তর্ক-পঞ্চানন—স্মৃতিশাস্ত্র। ২। রামসুন্দর তর্কসিদ্ধান্ত—ঐ। ৩। মাধব ন্যায়ালঙ্কার। ৪। শিবরাম ভট্টাচার্য্য। ৫। কমল ন্যায়বাচস্পতি। ৬। পাটুলীর শিরোমণি। ৭। রাম রাম ভট্টাচার্য্য। ৮। গণেশ ন্যায়বাগীশ। ৯। ব্রহ্মাণ্ডদেব ন্যায়রত্ন। ১০। ভৈরব তর্কবাচস্পতি—ন্যায়শাস্ত্র। ১১। আত্মারাম ন্যায়ালঙ্কার। ১২। ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন—ন্যায়শাস্ত্র। ঢাকা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের অনেক ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ১৩। বাবুরাম চূড়ামণি—স্মৃতি-শাস্ত্র। ১৪। নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ। ১৫। ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ। ১৬। কৈলাস সিদ্ধান্তবাগীশ—ন্যায়শাস্ত্র। ১৭। রামহরি তর্ক-বাগীশ—ঐ। ১৮। মদনমোহন তর্করত্ন—ব্যাকরণ। ১৯। হরনাথ তর্কসরস্বতী। ২০। হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—স্মৃতি। ২১। রাধানাথ শিরোমণি। ২২। দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—ন্যায়শাস্ত্রে প্রধান পণ্ডিত। ছাত্র সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অধিকাংশ বিক্রমপুর ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের ছাত্রগণ; ১৪।১৫ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিত। ২৩। রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। ২৪। রামচরণ ন্যায়ালঙ্কার—ন্যায়, সাহিত্য ও ব্যাকরণ। ২৫। কৃপারাম তর্কবাগীশ—

সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক ও পরস্পর মীমাংসক। তখন এ অঞ্চলে ইঁহাদের উপর আর কেহ ছিল না। আমরা চারিটী চতুষ্পাঠী দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে তিনটীতে প্রধানতঃ ন্যায়শাস্ত্রের ও একটীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপনা হইত। উপরিউক্ত তিনটীর অধ্যাপক ছিলেন আমাদের বংশের শেষ সভা-পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্য-বংশের শেষ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চানন ও তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিতপ্রবর নৃসিংহ সরস্বতী ও শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার ও শেষোক্ত আমাদের পুরো-হিত—পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ। ইঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পাঠীগুলিও লোপ পাইয়াছে।

বাঁশবেড়িয়ার ৺হংসেশ্বরী দেবী

সংস্কৃত বিদ্যার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এখানে ইংরাজী বিদ্যার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভা বংশবাটীতে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যা-লয়ে দুই শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অনেক ছাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করায় বিদ্যালয়টী উঠিয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয় কিছুকাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া-ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়টীর উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন। মধ্যে মধ্যে স্বয়ং বিদ্যালয় পরি-দর্শনে আসিয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তাঁহার সহিত আমার পিতামহ রাজা দেবেন্দ্রদেবের সৌহৃদ্য ছিল। এক নাম থাকায় উভয়ে সখ্য পাতাইয়াছিলেন। মহর্ষি নিজ ব্যয়ে এখানকার ভট্টাচার্য্য-বংশের তারকনাথ ও রামনাথকে বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য বারাণসীধামে পাঠাইয়াছিলেন। রমানাথ অল্পায়ু ছিলেন—তারকনাথ ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করিয়া "তত্ত্বরত্ন" উপাধিতে ভূষিত ও বর্দ্ধমানাধিপতির সভাপণ্ডিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার বিদ্যালয় উঠিয়া যাওয়ার অল্প দিন পরে সেই বাঙ্গলার সুবিখ্যাত মিশনরী ডাক্তার ডাফ্ ১৮৪৬

খৃষ্টাব্দে এখানে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সিন্ধু প্রদেশ জয় করিয়া সেনাপতি আউটর‍্যাম বহু অর্থ লুটের অংশ রূপে প্রাপ্ত হন। নর-রক্ত-বিধৌত অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া তিনি তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। আউটর‍্যাম ডাক্তার ডাফ্‌কে স্কুলের ইষ্টক-নির্ম্মিত পাকা বাটী নির্ম্মাণের জন্য ছয় সহস্র মুদ্রা দেন। স্কুলবাটী নির্ম্মিত হইলে তিনি এক রাত্রি ঐ বাটীতে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। স্কুলটি উঠিয়া যাওয়ার পর শিবপুরের জমিদার তাহা খরিদ করিয়া "শ্রীবাস" নামকরণ করেন। এক্ষণে সেই বাটীতে দিনাজপুরের রায় সাহেব রায় রাধা

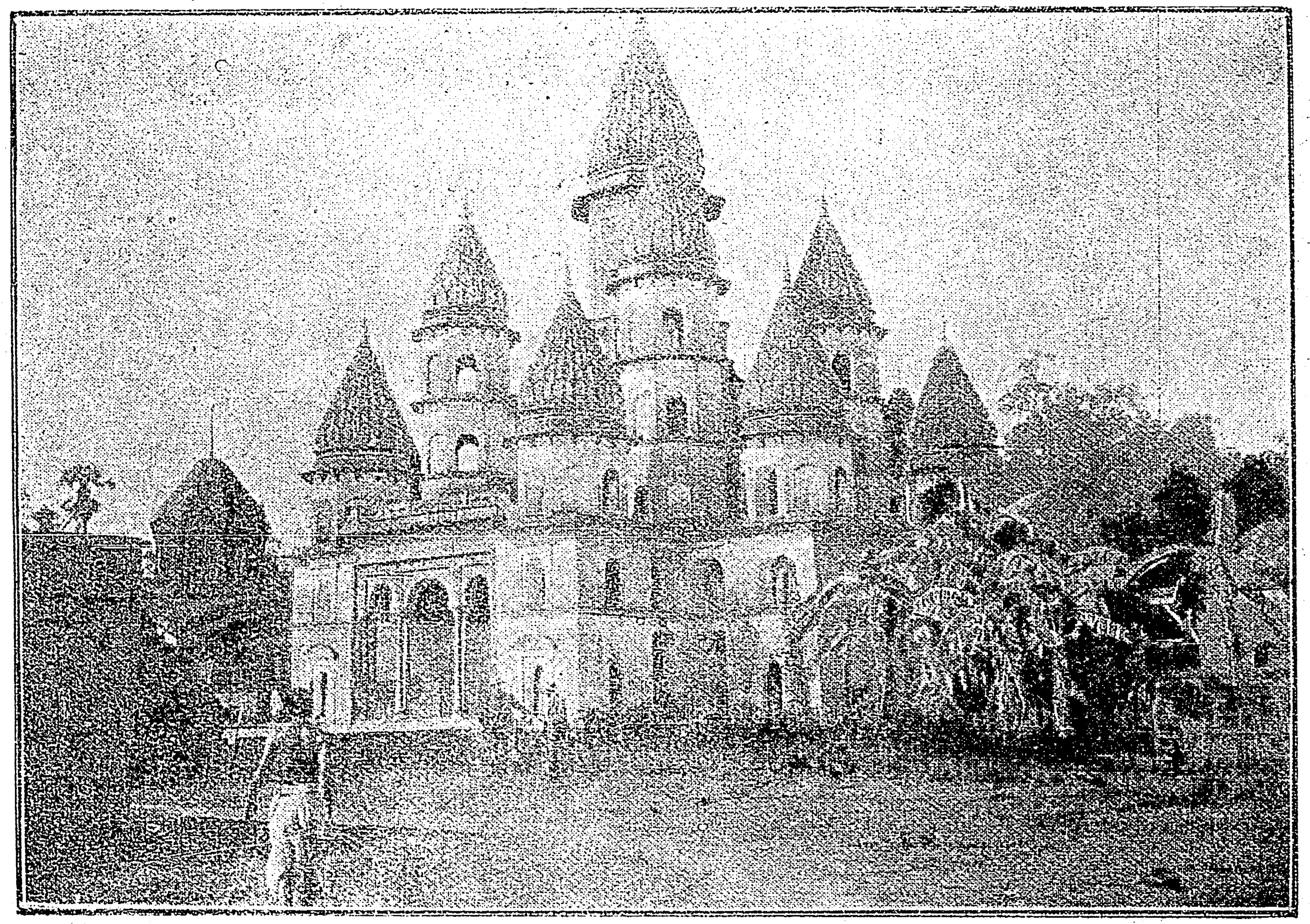

বাঁশবেড়িয়ার ৺হংসেশ্বরী মন্দির (দক্ষিণাংশ)

গোবিন্দ রায় বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ প্রাজ্ঞ মহাশয় বাস করিতেছেন। ডাক্তার স্মিথ সাহেব কৃত ডাক্তার ডাফ্ সাহেবের জীবনীতে "বংশবাটী কাহিনী" নামক একটী অধ্যায় লিখিত আছে। তাহাতে গ্রন্থকার পাঠকগণের উদ্দেশে বলিতেছেন, "ওয়েষ্টমিনষ্টার সমাধি-মন্দিরের চির-বিশ্রাম-স্থান টেমস নদীর বাঁধের উপর এবং কলিকাতা ক্লাবসমূহের পুরোভাগে শিল্পী ফলি নির্ম্মিত অশ্বারোহী-মূর্ত্তি স্যার জেমস আউটর‍্যামের পারস্য-বিজয় ও লাক্ষ্ণৌ-উদ্ধারের স্মৃতি জাগরিত রাখিতেছে। কিন্তু জীবন্ত মর্ম্মর বা স্থায়ী পিত্তল-ফলকে অঙ্কিত না থাকিলেও কেহ যেন সিন্ধুপ্রদেশের রুধিরাক্ত মুদ্রা এবং ডাফ্ সাহেবের বাঁশবেড়িয়া স্কুলের কথা বিস্মৃত না হন।"

বিদ্যালয়টিতে প্রায় ৯০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত; কিন্তু অনেক ছাত্র খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করায়, এটিও তত্ত্ববোধিনী সভার বিদ্যালয়ের দশা প্রাপ্ত হয়। যে সকল ছাত্র খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে এখানকার রুদ্রবংশের গৌরব প্যারীমোহন রুদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময় বংশবাটীর আরও দুইজন কৃতী সন্তান অপর দুই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া তাৎকালিক সমাজকে বিচলিত করিয়াছিলেন। বংশবাটীর ভট্টাচার্য্যবংশের নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন; আর ইংরাজীনবীশ দ্বারকানাথ পাল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হন। ইনি পরবর্ত্তীকালে "দ্বারকা সাধু" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আর নগেন্দ্রবাবুও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হন এবং "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" "রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত" প্রভৃতি লিখিয়া যশস্বী হন। বংশবাটীতে এদেশী পাদরীর অধীনে বঙ্গদেশ মধ্যে প্রথম ভজনালয় স্থাপিত হয়। প্রথম পাদরী ছিলেন তারাচাঁদ। তিনি ইংরাজী, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন।

ডাফ্ সাহেবের স্কুল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে উঠিয়া যাওয়ার পর সেই স্কুলের বাঙ্গলোয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় রাজা পূর্ণেন্দুদেবের যত্নে একটী

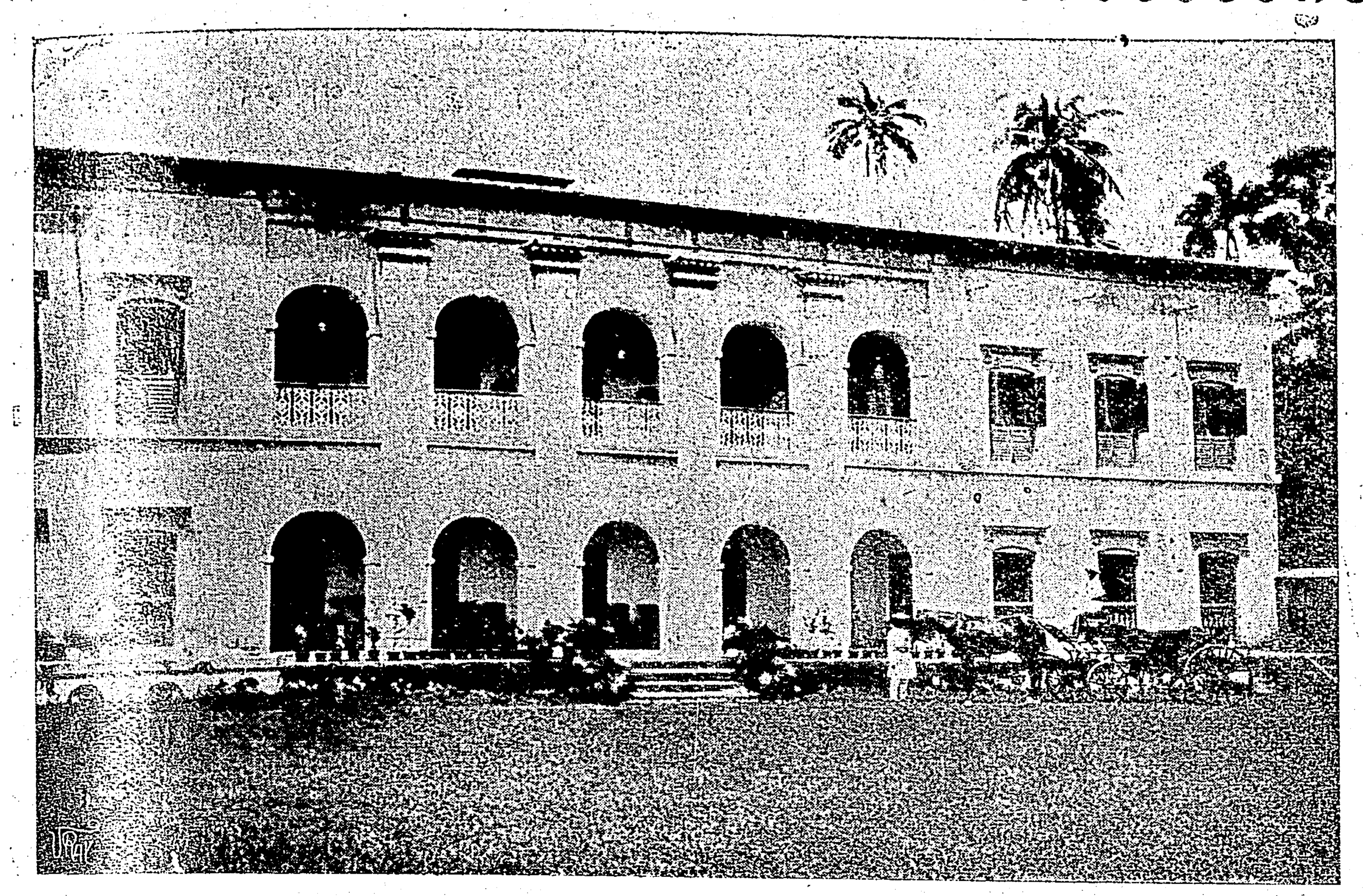

বাঁশবেড়িয়ার রাজবাটীর উত্তরাংশ—অভ্যর্থনা-গৃহ

দেখা যায়। এই সময় আর একটী স্কুল গ্রামে স্থাপিত হওয়ায় ছাত্র সংখ্যা কমিয়া যায় ও স্কুলটি উঠিয়া যায়। নূতন স্কুলটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, অবশেষে মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত হয়। সেই স্কুল বাটীর প্রাঙ্গণে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। এই স্কুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনেকগুলি ছাত্র ভাঙ্গাইয়া লইয়া ত্রিবেণীতে আর একটী স্কুল করায় ছাত্র-সংখ্যা অযথা হ্রাস হওয়ায় ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায়, ৩।৪ বৎসর মধ্যে স্কুলটী উঠিয়া যায়। পুনরায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি আমরা একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করি। দ্বাদশ বর্ষকাল স্কুলটি সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। এই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে কয়টী ছাত্র প্রেরিত হইত, প্রায় সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া আসিত। এই স্কুল সম্পর্কে স্কুলের সভাপতি স্বর্গীয় রাজা সতীন্দ্র দেব ও সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় ডাক্তার তিনকড়ি আঢ্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার আঢ্যের ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তি অল্পই

বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহ দেবরায় মহাশয়; জন্ম—১৭৪০ খৃষ্টাব্দ মৃত্যু—১৮০২ খৃষ্টাব্দ

সম্পর্কে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র হালদার, বিপিন বেহারী দে এবং ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের পালদিগকে কর্ত্তা স্বরূপ স্বীকার না করিয়া বংশবাটীর কয়েক ব্যক্তি "রাম বল্লভী" নামে একটি শাখা সংস্থাপন করেন। কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সম্প্রদায়ীরা রামবল্লভ নামক এক ব্যক্তিকে আপনাদের প্রবর্ত্তক ও শিব স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; এবং প্রতি বৎসর শিব চতুর্দ্দশীর দিবসে পাঁচঘরা গ্রামে ঐ প্রবর্ত্তকের উদ্দেশে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। ইঁহারা সর্ব্ব শাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্ব্ব শাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করেন। ঐ উৎসবকালে ভগবদ্গীতা, কোরাণ, বাইবেল এই তিনই পঠিত হয়। সে স্থানে "প্রেম সত্য" নামে এক বেদী আছে। তথায় সব জাতীয় লোকই একত্র হইয়া সর্ব্ব-সঙ্কর রূপে ভোজন করেন। ইঁহারা বিচার-আচার না করিয়া হিন্দুর অথাদ্য পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যের ভোগ দিয়া থাকেন। যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক একজন তত্ত্ব মহাজন স্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে, সকলকে সমান জ্ঞান করা ও পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয় রাখা বিধেয়; আর পর-দ্রব্য এবং পরস্ত্রী হরণ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ ও দর্শনও করা কর্ত্তব্য নয়। এই সম্প্রদায়ের প্রার্থনা—হে পরমেশ্বর, তোমার দাসের এই প্রার্থনা যে, তোমার আজ্ঞাপালনে সকলে সক্ষম হয়। ইহাতে আপনকার যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক। ইঁহাদের মত প্রতিপাদক গীত—

কালীকৃষ্ণ গাড্ খোদা
কোন নামে নাহি বাধা
বাদীর বিবাদ দ্বিধা
তাতে নাহি টলো রে।
মন কালী কৃষ্ণ গাড খোদা বলো রে॥

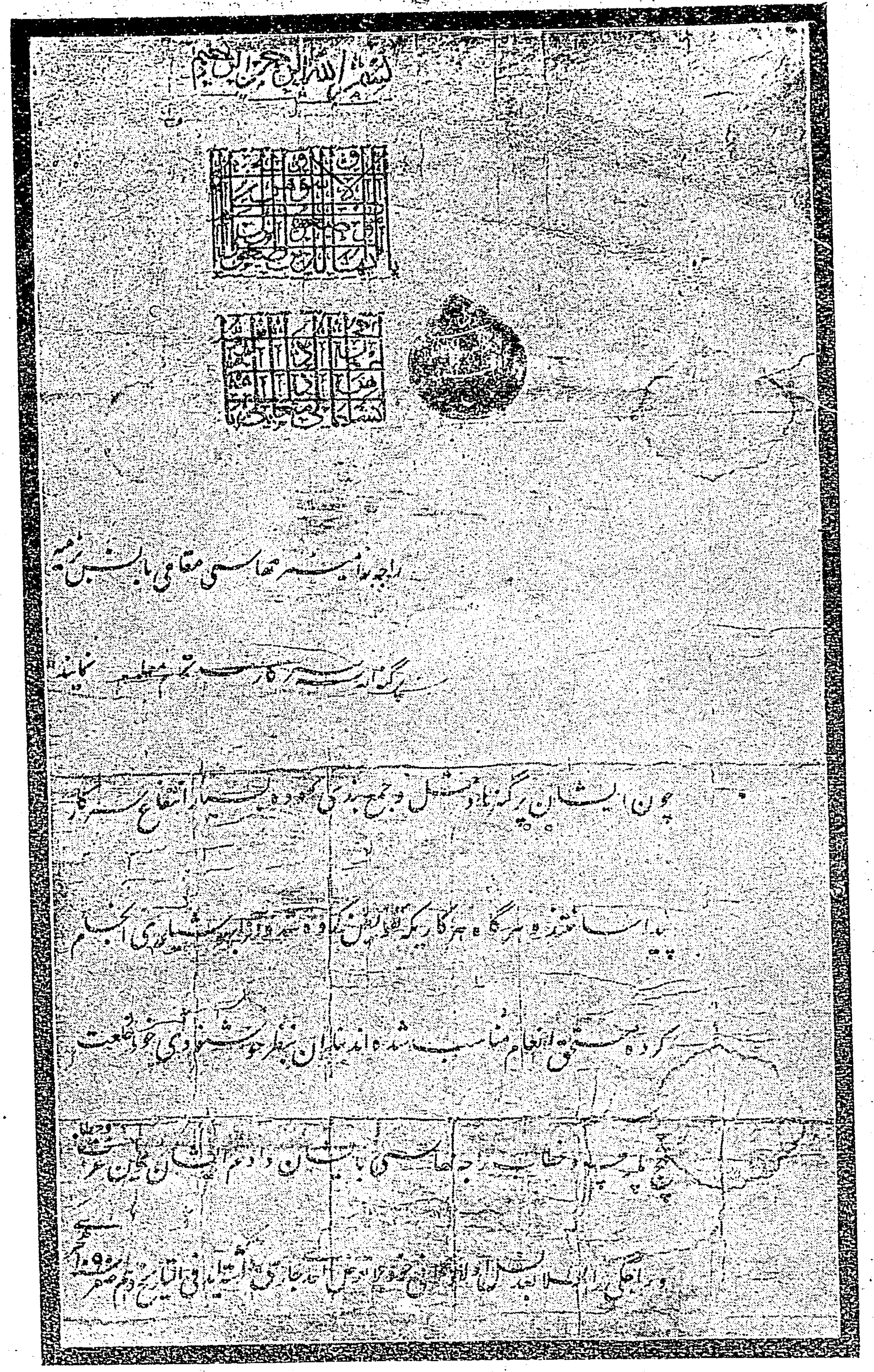

বাঁশবেড়িয়ার রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়কে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত বংশানুক্রমিক "রাজা মহাশয়" উপাধির সনন্দ।
১০ই সফর ১০৯০ হিজরা (১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ)

পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগরের পৌত্র সুনিপুণ শিল্পী গোপীরমণ এই সম্প্রদায়ের বংশবাটীস্থ শেষ সভ্য ছিলেন। গোপীরমণ নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। প্রতিমা গঠনে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইতেন। আমাদের দুর্গা প্রতিমা তিনি নির্ম্মাণ করিতেন। এরূপ সুন্দর দেবীমূর্ত্তি আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না—গোপীরমণের নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে সে মূর্ত্তির তিরোভাব হইয়াছে। আমরা শৈশবে তাঁহাকে "মা দুর্গার বাবা" বলিয়া ডাকিতাম।

তখন প্রায় গ্রামের সমৃদ্ধ গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহে দুর্গোৎসব হইত। এখনও হইয়া থাকে, তবে সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। বিজয়ার দিন ভাগীরথীর তীর লোকে লোকারণ্য হইত। গঙ্গাবক্ষ নৌকায় পূর্ণ হইত। বাচ্ খেলার ধূম পড়িয়া যাইত। বিজয়ার বিদায়-সূচক বাদ্যের প্রতিধ্বনিতে তীরভূমি পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। তারপর নিরঞ্জন। এত ধূমধামের পর এত আমোদ আহ্লাদের পর অতি প্রিয়জন বিরহের ন্যায় অবসাদে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত। এখনও পূর্ব্বের মত বিজয়ার দিন সকল অনুষ্ঠানই হয়; কিন্তু তাহাতে সে সজীবতা—সে আন্তরিকতা কোথা? সেরূপ প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে তো কাহাকেও দেখি না।

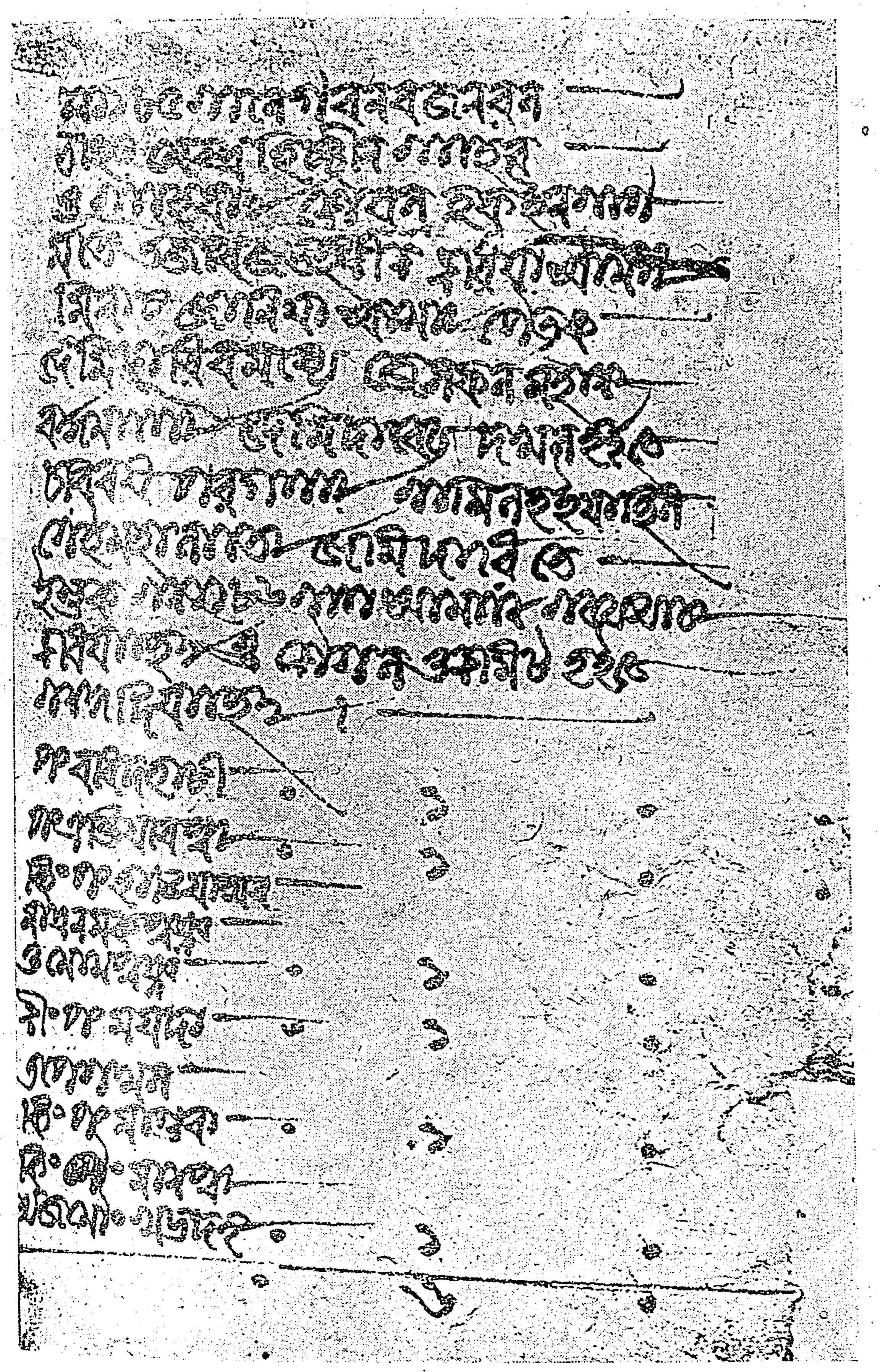

বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহ দেবরায় মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত—ইয়াদদস্ত (৩)

গবর্ণর জেনারেল্ ওয়ারেণ হেষ্টিংস্

কার্ত্তিক ভাসানের দিন যে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছি, এখন তাহার একাংশও দেখিতে পাই না। রাসযাত্রা ও উত্তরায়নের সময়েও জনকলরবে গ্রাম সজীব হইয়া উঠিত। এখনও কলের মত সব

বঙ্গের ছোটলাট মাননীয় সার্ জন্ উড্‌বরণ এম-এ, কে-সি-এস-আই

বাঁশবেড়িয়ার রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয়
জন্ম—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ— মৃত্যু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ

চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহীনতা পরিলক্ষিত হয়। ৺সরস্বতী পূজার অপরাহ্ণে "পড়ুয়ার নাচ" অর্থাৎ টোলের ছাত্রগণের আনন্দোৎসব হইত। ছাত্রগণ নৃত্য করিতে করিতে বাদ্য সহ ৺হংসেশ্বরীর নাট্যমন্দিরে সমবেত হইত। তাহাদের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি যেন তাহাদের দেহ ফুটিয়া বাহির হইত। নাট্যমন্দিরে সভা হইত—অধ্যাপকগণকে মাল্য ও চন্দন দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হইত। এখন সকলই গল্পের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ায় ক্লিষ্ট হইলেও শৌর্য্য বীর্য্যে বংশবাটী কখনও পশ্চাৎপদ ছিল না। উল্লাস মুখোপাধ্যায়ের সহিত ব্যাঘ্রের লড়ায়ের কথা হয় ত অনেকে জানেন না। উল্লাস অতর্কিত ভাবে একটী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু তাহাতে ভীত না হইয়া তিনি ব্যাঘ্রের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন—দেহ ক্ষতবিক্ষত—রুধির-ধারায় আপ্লুত—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কম প্রশংসার কথা নহে। শিকারী নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ব্যাঘ্র শিকারে কৃতিত্বের কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। এরূপ নির্ভীকতা ও অকুতোভয়তার পরিচয় তখনকার দিনে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার সামিল ছিল।

খামারপাড়ার মাইতি কাঁসারীর বাড়ীর ভীষণ ডাকাতীর গল্প অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ডাকাতদের হুঙ্কার শব্দ গ্রামান্তর পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়াছিল। তখন অবস্থাপন্ন লোক মাত্রেরই বাড়ীতে সর্দ্দার থাকিত। সর্দ্দারেরা প্রায়ই ডাকাত শ্রেণীর; তবে যাহার নুন খাইত, তাহার অনিষ্ট করিত না। বংশবাটীর সর্দ্দারেরা ডাকাত পড়ার শব্দে উত্তেজিত হইয়া খামারপাড়ার ডাকাতদের বাধা দিতে যায়। ডাকাতদের সহিত ঘোর লড়াই বাধে। ডাকাতদের নেতা গোলাম সর্দ্দারকে বর্শা বিদ্ধ করিয়া ইহারা নিহত করে। এই উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে একটী দরবার হয়। বিভাগীয় কমিশনর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া বংশবাটীর সর্দ্দারদের ভূয়সী প্রশংসা করেন; এবং বীরত্বের তারতম্যানুসারে সুবর্ণ ও রৌপ্য বলয় পুরস্কার দেন। আমরা তাহাদিগকে সেই বলয় পরিধান করিতে দেখিয়াছি। এই সকল সর্দ্দারেরা অন্ত্যজ জাতীয় ছিল—অর্থাৎ আজকাল যাহাদিগকে depressed class বলিয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। হিন্দুসমাজের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া তাহারা না কি ধর্ম্মান্তর গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প। আমাদের গ্রামে হাড়ি, মুচী, ডোম, চণ্ডালের অভাব ছিল না; কিন্তু কৈ, আমরা তো তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঠেলিয়া রাখি নাই; মনে তো তিলেকের জন্য দ্বিধা বোধ হয় নাই। তাহারা গড়ের চতুর্দ্দিকে বাস করিত; আমাদের রক্ষক স্বরূপ ছিল; সকল হামরাইয়ের কার্য্যে তাহারা অগ্রগণ্য ছিল। আমাদের দুর্গা-প্রতিমা এ অঞ্চলের মধ্যে বৃহদাকার—বিসর্জ্জনের দিন ভাগীরথী-তীরে লইয়া যাইবার জন্য ৩২জন দুলে বেহারা নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু প্রতিমার তাল সামলাইবার জন্য তাহার দ্বিগুণ লোকের প্রয়োজন; তখন তো ইহারাই সে তাল সামলাইত। কাজে কর্ম্মে তাহাদিগকে গোষ্টিশুদ্ধ আদর ও যত্ন করিয়া খাওয়ান হইত—তাহারা শৈশবে আমাদিগকে "দাদা মহাশয়" বলিয়া কত আদর করিত—আমরা তাহাদিগকে নিতান্ত আপনার বলিয়া ভাবিতাম। আমাদের পিতৃদেব তাহাদের পীড়ার সময় তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাইতেন। চিকিৎসার, শুশ্রূষার, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। কৈ, তাঁহাকে তো কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে দেখি নাই। হায়! এখন তাহারা কোথায়? কাল ম্যালেরিয়ায় তাহাদের বংশ প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছে। আমাদের গ্রামের ভট্টাচার্য্য-বংশের ছেলেমেয়েদের তাঁহাদের প্রতিবেশী মুচীদের কোলেপিটে চড়িয়া মানুষ হইতে দেখিয়াছি; তাহাতে তো তাঁহারা পতিত হন নাই। তখন যে ইতর ভদ্র সকলে একটা না একটা সম্পর্ক পাতাইয়া গ্রাম শুদ্ধ এক পরিবারের মত থাকিত। তাহারা পরস্পরের সুখে সুখী—দুঃখে দুঃখী হইত—যেন "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এ কি হইতে চলিল। বৈদেশিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভেদজ্ঞান প্রবেশ করিয়া এমন সুমধুর সম্পর্ক নষ্ট করিয়া সুখের সহযোগিতা স্থলে সকলে স্ব স্ব প্রধান—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" ভাব আনিয়া দিতেছে। পরশ্রীকাতরতা, দলাদলি ও বিদ্বেষ-বুদ্ধির প্রাবল্যে পল্লী সকল উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। অর্থই

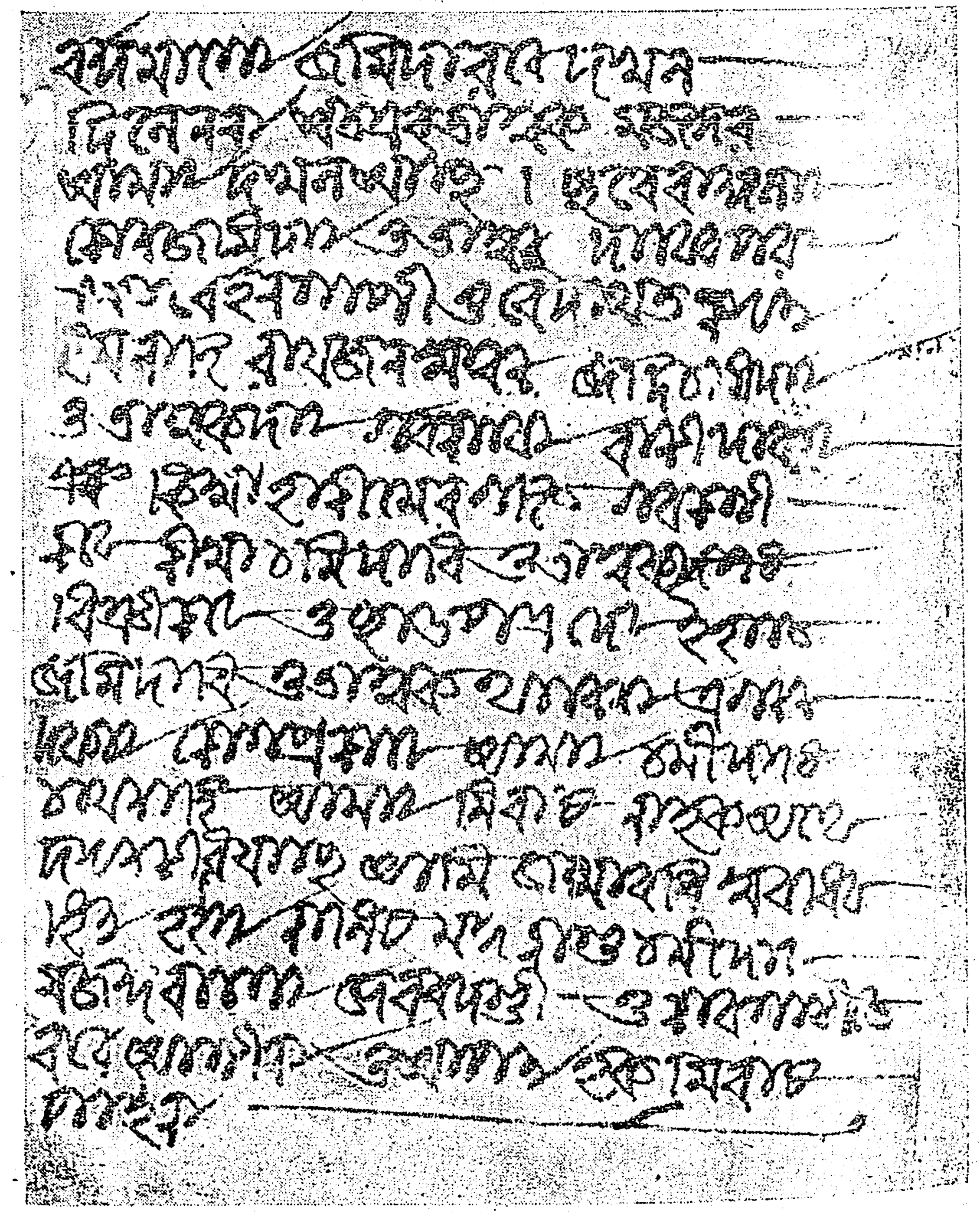

বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহ দেবরায় মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত—ইয়াদ্‌দস্ত (২)

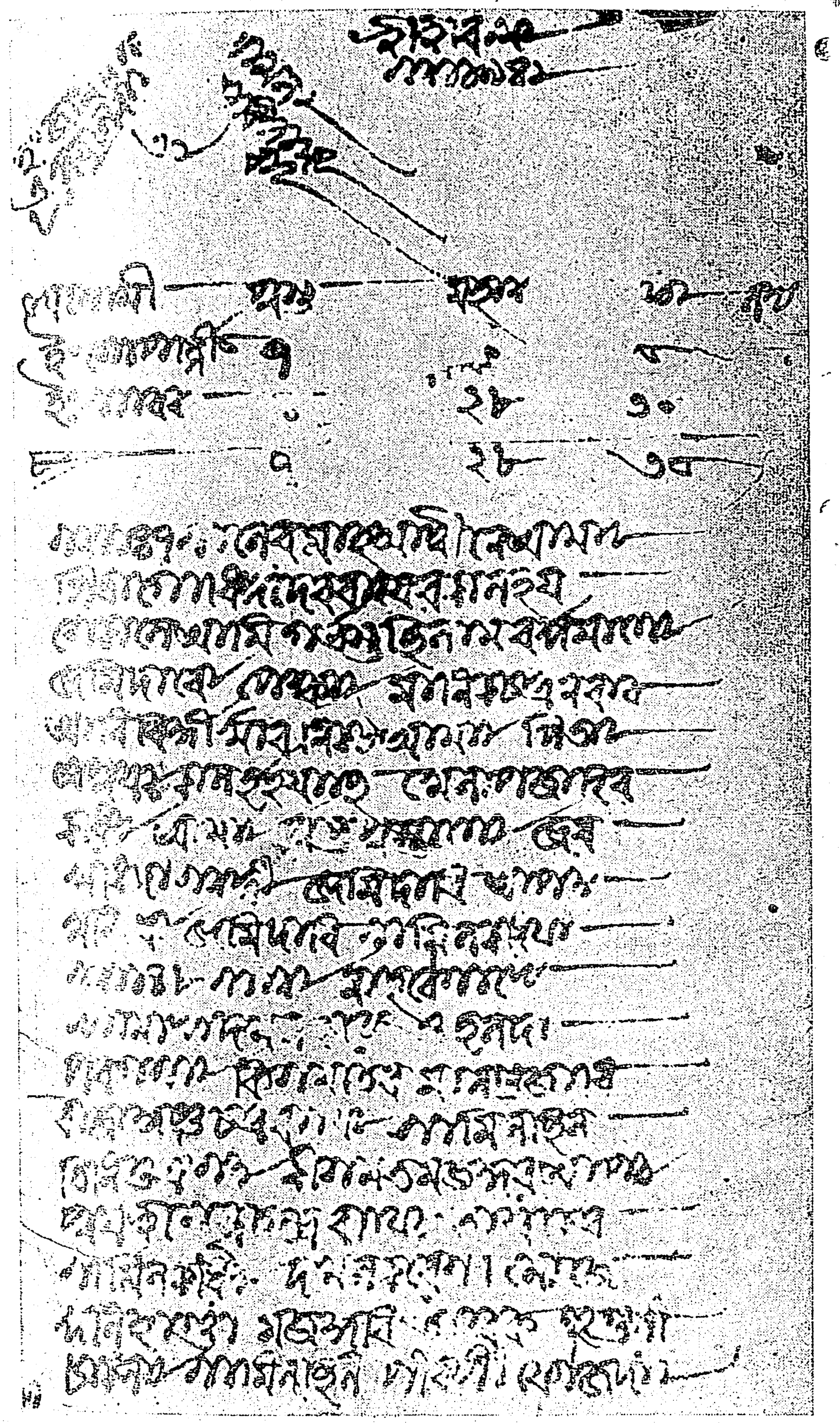

বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহ দেবরায় মহাশয়ের
স্বহস্ত লিখিত ইয়াদ্‌দস্ত (১)

মোক্ষ—অর্থোপার্জ্জনে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিসর্জ্জিত হইতেছে—পরকালে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব এখন কথার কথা—অবজ্ঞার বিষয়। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-ভূমি ভারতবর্ষের কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়া যাইতেছে!

কার্ত্তিকের জন্য এই গ্রাম এক কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এরূপ লোক তো সকল স্থানেই আছে; হয় ত এখানে তাহার বিশেষত্ব কিছু ছিল। কাঁসারীর প্রতিপত্তি বাঁশবেড়িয়ায় ছিল; এখনও যে নাই তাহা নহে। পিত্তল কাঁসার ব্যবসা বংশবাটীর শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এই ব্যবসায়ের প্রসার প্রতিপত্তিতে বহু লোকের অন্ন-সংস্থান হইত, অবস্থার সচ্ছলতা দেখা যাইত। সাধারণ লোকের কাজের অভাব হইত না। এমন কি অন্ধ ব্যক্তিও কুঁদ টানিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত। এই ব্যবসায়ে কাঁসারীদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। গঙ্গার ধারের রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহগুলির অধিকাংশ তাঁহাদের উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে তাঁহারা স্বাধিকার বজায় রাখিতে পারিতেছেন না; ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। ইহার আশু প্রতিকার না হইলে গ্রাম ক্রমে আরও শ্রীহীন হইয়া পড়িবে। সাহেবদের লম্বা হ্যাটের মত এখানকার পিতলের বক্‌নো চট্টগ্রাম হইতে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। সে একচেটিয়া ব্যবসা নষ্ট হইতে বসিয়াছে,—ইহা কম দুর্ভাগ্যের কথা নহে।

এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া বহু লোক জীবিকার্জ্জন করিত। এখানকার স্বর্ণকারের প্রস্তুত অঙ্গুরীয়ের বিশেষত্ব ছিল—নানা দেশে তাহা বিক্রীত হইত। এখনও স্বর্ণকারের ব্যবসা কতক পরিমাণে চলিতেছে।

এখানকার কর্ম্মকারেরা লৌহ-শিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইত। বংশবাটী দুর্গের কামান বন্দুক তরবারি বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র ইহারাই প্রস্তুত করিত। এখন এ ব্যবসা একেবারে লোপ পাইয়াছে। এখন সামান্য কোনও কার্য্যে কর্ম্মকারের সাহায্যের আবশ্যক হইলে ভিন্ন গ্রামে ছুটিতে হয়।

কুম্ভকারের কার্য্যেরও এখানে বিশেষত্ব ছিল—তাহাও একেবারে লুপ্ত হইয়াছে।

এখানকার তন্তুবায়েরা সুন্দর কাপড় বুনিতে পারিত। আমরাও ৬।৭ ঘর তন্তুবায়-গৃহে বস্ত্র বয়ন কার্য্য দেখিয়াছি; তাহাদের প্রস্তুত কাপড়ও ব্যবহার করিয়াছি। এখন তাঁতি কুল নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে। তাঁত তো একখানিও নাই।

গড়ের পূর্ব্ব-উত্তরে আমার পূর্ব্বপুরুষদের গুরুবংশের বহু ব্রাহ্মণ বিধবা বাস করিতেন। তাঁহারা চরকায় সূতা কাটিতেন ও তন্তুবায়দিগকে ।০-।৴০ আনা বাণী দিয়া আটপৌরে কাপড় বুনাইয়া লইতেন। গুরুকুল নির্ব্বংশ হওয়ায় চরকার সুমধুর ঘরঘরানি শব্দ আর শ্রুতিগোচর হয় না। এখন মহাত্মা গান্ধীর কথায় হুজুকে পড়িয়া বা সখ্ করিয়া অনেকে চরকা কিনিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অনেকেই কোণে ঠেলিয়া রাখিয়াছেন, বড় একটা কেহ ব্যবহার করেন না।

এখানকার চর্ম্মকারেরা সদাসর্ব্বদা ব্যবহার্য্য বিনামা প্রস্তুত করিত। মূল্যও খুব সুলভ ছিল। আমরাও ২।১ জন চর্ম্মকারের প্রস্তুত বিনামা বাল্যে ব্যবহার করিয়াছিলাম। এখন আর এখানে বিনামা প্রস্তুত হয় না।

বংশবাটীতে বাঁশ ও বেত বহু পরিমাণে থাকায়, বাঁশের ও বেতের ঝুড়ি, ডালা ও নানাবিধ ব্যবহার্য্য ও সৌখীন দ্রব্য অন্ত্যজ জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা তৈয়ারি করিয়া অসময়ের জন্য কিছু সংস্থান করিয়া রাখিতে পারিত। এখন সে দিনকাল আর নাই—সহজসাধ্য কুটীর-শিল্প এখন দেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অসচ্ছলতার ইহাও অন্যতম কারণ। গ্রামের আবশ্যক সব দ্রব্যই গ্রামে প্রস্তুত হইত—অন্যত্র সেজন্য যাইতে হইত না। এখন গ্রামের এরূপ দুরবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, নিত্য প্রয়োজনীয় রজক নাপিত পর্য্যন্ত গ্রামে পাওয়া দুর্ঘট—ভিন্ন গ্রামের সাহায্য লইতে হয়।

আমাদের বাল্য জীবনের ছাত্র সমিতির এককালে খুব নামডাক পড়িয়াছিল। সে সময় এমন প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন না, যিনি অন্ততঃ একবারও বংশবাটীতে পদার্পণ করেন নাই। আমাদের গৃহশিক্ষক ডাক্তার যদুনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে এই ছাত্র-সমিতি স্থাপিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

বংশবাটী হইতে "পূর্ণিমা" মাসিক পত্রিকা আমরা ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত অষ্টাদশ বর্ষ কাল পরিচালনা করিয়াছিলাম। সাহিত্য-রথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, চন্দ্রশেখর কর, সুরেশচন্দ্র সেন, কোম্‌তের শিষ্য যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি "পূর্ণিমা" পরিচালনে আমাদের প্রধান সহায় ছিলেন। এখন ইঁহাদের মধ্যে তিন জন মাত্র জীবিত আছেন—আর সকলেই স্বর্গগত হইয়াছেন।

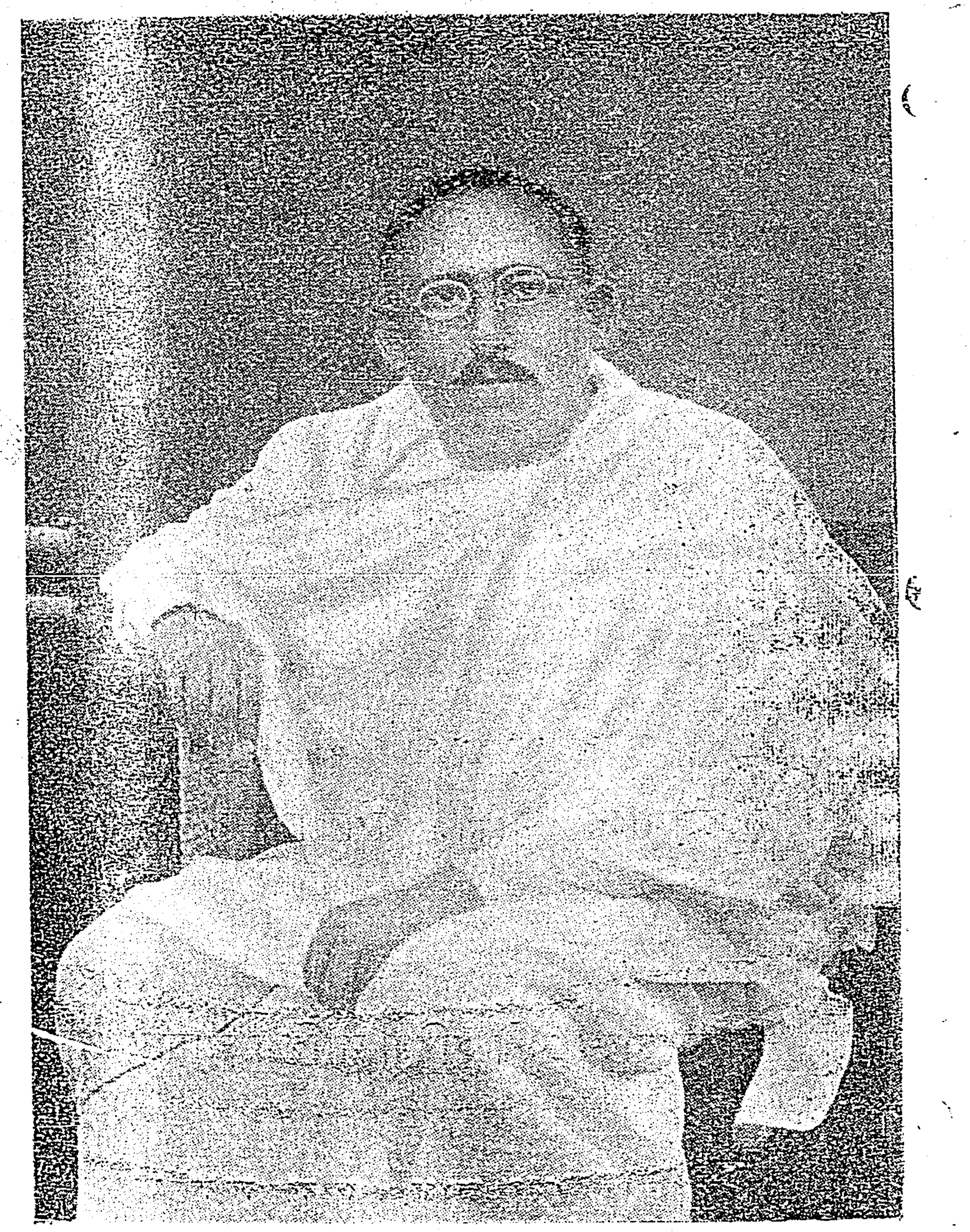

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় নীলের চাষ আরম্ভ হয়। বংশবাটীতে একটি বড় নীল-কুঠী ছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কুঠীয়াল ছিলেন বার্চ্চ সাহেব; ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে টেম্পল্ সাহেব। ইনি ১৭৮০ বিঘা চরভূমি প্রতি বিঘা বার্ষিক এক টাকা খাজনায় জমা লন। ইহার মধ্যে ১৫২৩ বিঘা জমিতে রীতিমত নীল বপন করা হইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কুঠীয়াল ছিলেন ম্যাকিনম্ ক্রাটেনডেন্ কোম্পানী। নীলের চাষ উঠিয়া যাওয়ার কয়েক বৎসর পরে নীল-কুঠীর বাটী বীরনগর বা উলার জমীদার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় গঙ্গাবাস জন্য খরিদ করেন। তাঁহার পুত্র তারানাথ মুখোপাধ্যায় বহুদিন এই বাটীতে বাস করেন, ও দুর্গোৎসব আদি কৌলিক ক্রিয়া এই বাটীতে সম্পন্ন করিতেন। এক্ষণে বাটীটি হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে হুগলী জেলায় যে সাতটী মিউনিসিপ্যালিটি আছে, তন্মধ্যে বাঁশবেড়িয়া উত্তরাংশের শেষ মিউনিসিপ্যালিটি এবং আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; কিন্তু লোক সংখ্যায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান কমিশনর সংখ্যা ১২ জন; তন্মধ্যে ⅔ অংশ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি নানা কারণে মিউনিসিপ্যালিটির পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক আয় বৃদ্ধি হইয়াছে; আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। তাহাতে গ্রামের ভবিষ্যৎ উন্নতি সূচিত হইতেছে। সুপেয় পানীয় জল বিনা ব্যয়ে সরবরাহের ব্যবস্থার কথা শুনা যাইতেছে। আশার কথা, সুখের কথা, সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই।

কাল ম্যালেরিয়ায় গ্রামের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ঘরে ঘরে রোগের যন্ত্রণা, পীড়িতের আর্ত্তনাদ, শোকের হাহাকার রব শুনা যাইতেছে। দেহে জীবনী-শক্তি থাকিলে, টিকিয়া থাকিলে, তবে তো উন্নতি। গত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও বংশবাটী কি আনন্দেরই স্থান ছিল! পল্লীতে পল্লীতে বারওয়ারি পূজা হইত। যাত্রা তো মধ্যে মধ্যে লাগিয়াই থাকিত। মতিরায়, ব্রজরায়, পীতাম্বর পাইন, নীলকণ্ঠ, রসিক, ভুলু প্রভৃতির যাত্রা, রাজনারায়ণের চণ্ডী, তর্জ্জা ও কবির লড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি প্রায়ই গ্রামকে সজাগ করিয়া তুলিত। কথকতা, ভাগবত পাঠ প্রভৃতি কোনও না কোনও গৃহস্থের বাটীতে প্রায়ই হইত। শ্রীধর কথক অকালে কাল-কবলিত হইলেও, তাঁহার জ্ঞাতি বংশের অতুল ও গোপাল সুন্দর কথকতা করিতে পারিতেন। আর সঙ্গীত-চর্চ্চা তো ঘরে ঘরেই ছিলই। তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতির আড্ডা নিতান্ত সামান্য ছিল না। আমার খুল্লতাত মহাশয়ের উদ্যোগে গ্রামের ভদ্রসন্তানদের লইয়া এক বাউল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা ঢিলা

আলখাল্লা পরিয়া একতারা হস্তে মধ্যে মধ্যে গ্রামে বাউল সঙ্গীত করিয়া বেড়াইতেন। তা ছাড়া, নগর সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে মধ্যে বাহির হইত। এখানে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, তাঁহারা উৎসবের সময় নগর কীর্ত্তনে বাহির হইতেন ; তাহাতে গ্রামস্থ সকলে যোগ দিতেন। একবার পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নগর সঙ্কীর্ত্তনে গ্রাম তোলপাড় করিয়াছিলেন। সে অভিনব দৃশ্য এখনও বেশ মনে পড়িতেছে। এখানে হরি সভা ছিল—তাঁহাদেরও সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হইত। বৈষ্ণবপ্রবর গৌরকান্তি নিমাই ও নিতাই ভাবাবেশে বিভোর হইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন। এ সব যেন সেদিনের কথা বলিয়া মনে হইতেছে—এখন গল্পের মত বলিতে হইতেছে। তখন দেশের স্বাস্থ্য এতটা মন্দ হয় নাই,—এতটা অভাব বোধ ছিল না। এখন লোকের ডাইনে আনিতে বামে কুলায় না। ঘরে অন্ন না থাকিলে, সচ্ছল অবস্থা না হইলে, স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে, যথেষ্ট অবসর না পাইলে, এত প্রাণ খুঁজিয়া স্ফূর্ত্তি কোথা হইতে আসিবে? নিদারুণ ম্যালেরিয়া ব্যাধিতে কঙ্কালসার দেহ লইয়া ভীষণ জীবন-সংগ্রামে কত দিন যুঝিতে পারিবে—আনন্দ স্ফূর্ত্তি তো দূরের কথা। এখনও প্রতিকারের সময় অতীত হয় নাই। ম্যালেরিয়া preventible disease—চেষ্টা করিলে রোগ নিবারিত হইতে পারে। গ্রামের উন্নতির প্রধান অন্তরায় ম্যালেরিয়া। তাহা বিদূরিত করিতে না পারিলে, কোনও বিষয়ে স্থায়ী উন্নতির আশা নাই।

রাজগী !

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

(৯)

ইতিমধ্যে তিনবার দেশে গিয়াছিলাম, অল্প সময়ের জন্য। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিটা দেশেই কাটাইলাম। আর কয়বার নরেন্দ্র বাবু সঙ্গে ছিলেন, এবার তিনি আসিলেন না।

দেশে আসিয়া কিন্তু আমি রাজবাড়ীর সেই সনাতন আদবকায়দার সঙ্গে বেশ মানাইয়া যাইতে পারিলাম না। মাঝখানে নরেন্দ্র বাবুর শিক্ষা দীক্ষা পড়িয়া আমার মনের দৃষ্টিক্ষেত্র এত বদলাইয়া দিয়াছিল যে, যে সব সংস্কার আমি আশৈশব নির্ব্বিবাদে মানিয়া আসিয়াছি, সেইগুলির চক্ষে ভারি বাধিল।

শৈশব হইতে চাকর আমার গায় তেল মাখাইয়া দেয়, এবং চিরজীবনই আমার গায় চাকরে তেল মাখাইয়া দিবে, ইহাতেই আমি অভ্যস্ত। কিন্তু এবার যখন নবীন খানসামা তেলের বাটী হাতে করিয়া আমার গায় মাখাইতে আসিল, তখন আমার ভারি লজ্জা বোধ হইল! আমি তাহাকে সরাইয়া দিয়া নিজে তেল মাখিয়া স্নান করিলাম। এটা একটা সামান্য দৃষ্টান্ত,—কিন্তু আমাদের রাজবাড়ীর আচার-ব্যবহারের এমন শত শত ছোট বড় ব্যাপারে আমার শিক্ষার সঙ্গে সংস্কারের বিরোধ লাগিত।

তার মধ্যে দেওয়ানজী এবং নায়েব মশাই এবং স্নুতরাং রাণীমার চোখে বেশী করিয়া লাগিল আমার প্রজাদের সঙ্গে ব্যবহার। আমি কাছারীতে বসিয়া দেওয়ানজীর বিচার দেখিলাম। দেখিলাম, দলে দলে অপরাধীদের গালখানায় লইয়া গেল ; সেখানে জুতা ও বেতের ঘায় জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা আসিয়া খাজনা কিম্বা জরিমানা দিয়া গেল। দেখিলাম, প্রজাদের শোষণ ও পীড়ন করিয়া খাজনার উপর আবওয়াব আদায় হইতেছে। তাদের বাড়ীর খবর লইয়া জানিলাম যে, তাদের এবার না খাইয়া খাজনা চালাইতে হইতেছে,—আবওয়াব দেওয়া তো দূরের কথা।

এসব দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম। তার পর প্রজাদের বাড়ী ঘুরিয়া দেখিব স্থির করিলাম।

সকাল বেলায় দেউড়ীর বাহিরে গিয়া সোজা মাঠ পার হইয়া চলিলাম। কিঙ্কর সিং পাগড়ী বাঁধিতে বাঁধিতে ছুটিয়া আসিল, আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম। মাঠের ওধারে যেখানে বিধুদের বাড়ী ছিল, সেখানে যাইতেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এখানে একটা দারুণ অন্যায় অত্যাচার হইয়া গিয়াছে মনে হইল, যার জন্য আমি গোড়ায় দায়ী এবং যা আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সহ্য করিয়াছিলাম। মাষ্টার ম'শায় আমাকে বার বার এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অন্যায়কে কখনো স্বীকার করিয়া লওয়া একটা প্রচণ্ড কাপুরুষতা ; আর কাপুরুষতা ও হীনতার চেয়ে বড় অপরাধ তাঁর নীতিশাস্ত্রে মেলে না। তিনি বার বার বলিয়াছেন, "অন্যায় যেখানে দেখিবে, তার বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করিয়া লড়িবে। কখনও অক্ষমতার জন্য বা অন্য কারণে অন্যায়কে মাথা পাতিয়া লইলে মানুষ নামের অযোগ্য হইবে।"

বিধুদের ঘর যেখানে ছিল, সেখানে এখন অন্য কোনও প্রজা একটা বেগুন ও লঙ্কার অযত্ন-রক্ষিত 'পালান' করিয়াছে। তার এক পাশে তার একটা জীর্ণ গোয়ালঘরে কঙ্কালসার গরু বাঁধা রহিয়াছে। এইখানে দাঁড়াইয়া আমার মনে হইল যে, এত বড় একটা অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিয়া, বিধুর প্রতি এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবার কোনও উপায় না করিয়া, আমি নিজেকে মানুষ নামের অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছি। মনের সে গ্লানি আমি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না।

সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক কথাই মনে হইল। এ অত্যাচার সহ্য করাই তো আমার এক অপরাধ নয়। আমি বিধুকে কলঙ্কিত করিয়াছি, নিজে কলঙ্কিত হইয়াছি। আজ নরেন্দ্র বাবুর কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আমি পরিপূর্ণ ভাবে অনুভব করিলাম যে, আমার পক্ষে কত বড় হীন অপরাধ বিধুর সঙ্গে আমার অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন। তখন আমার এ কথা এক দিনও মনে হয় নাই। তখন আমার নীতিজ্ঞানের ধ্রুবতারা ছিল বিপিন, দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন রাণীমা, দাইমা। বেটা ছেলের পক্ষে এ সবে যে কোনও বিশেষ দোষ আছে, সে কথা আমি কোনও দিন মনে করিবার অবসরই পাই নাই। কিন্তু আজ মনে হইল। সেই সমস্ত অতীত জীবনের গ্লানি আমার মনের ভিতর যেন বিস্ফোটকের মত জ্বালার সৃষ্টি করিল। মনে হইল, জীবনের সে কয়টা দিন যদি মুছিয়া ফেলা যাইত!

সমস্ত কথা মনের ভিতর উণ্টাইয়া পাণ্টাইয়া স্মরণ করিলাম। বিধুর জন্য প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। সে আমাকে বড় ভালবাসিত। তার বুদ্ধি স্নুদ্ধি কিছুই ছিল না,—তবু সে সাদা মনে এ কথাটা বুঝিত যে, আমার ভাল হওয়া দরকার। তার নিজের দোষ বুঝিবে, এমন শিক্ষা-দীক্ষা তার কখনও হয় নাই। তার মা নামজাদা অসতী, ভাই নিজে তার পাপের প্রশ্রয়দাতা, তার আসে পাশে সে চারিদিকেই দেখিতে পায়—তাদের শ্রেণীর বিধবারা স্বেচ্ছাচারিণী! তার কাছে সতীত্বের মর্য্যাদা কাজেই কোনও দিনই প্রকাশ পায় নাই। তবে এটুকু জানিত যে, ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে চরিত্র খারাপ হওয়াটা ভারি অন্যায়। তাই সে আমার ভালোর জন্য আমার চরিত্র সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সে বড় দুর্ব্বল ছিল, আমার আদরে সে আত্মহারা হইয়া যাইত ; তখন আর তার জোর করিবার শক্তি থাকিত না।

একে একে সব কথা মনে হইল। তার ভালবাসা, তার প্রেম সম্ভাষণ, তার তিরস্কার, মা ও ভাইয়ের চক্রান্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তার একান্ত যত্ন, আমার স্ত্রী বলিয়া সাবিত্রীর প্রতি তার ঐকান্তিক অনুরাগ ও সেবা, আমার জন্য তার ত্যাগ ও নির্ব্বাক সহিষ্ণুতা! আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আমি বসিয়া বসিয়া সেই শূন্য ভিটার দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে যখন আমি আত্মস্থ হইলাম, তখন টের পাইলাম যে, আমার সকল অনুশোচনা ধুইয়া গিয়া আমি একান্তভাবে বিধুকে ধ্যান করিতেছি ও তাহাকে কামনা করিতেছি। জোর করিয়া মনকে ফিরাইয়া আমি সে স্থান হইতে অগ্রসর হইলাম।

এই দেড় বৎসরে আমার চরিত্রের উপর যে শিক্ষার প্রলেপ পড়িয়াছিল, তাহা ভেদ করিয়া আমার পুরাতন সত্তা যেন আবার ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। আমি সব ভুলিয়া গেলাম, দেড় বছর মুছিয়া গেল। আমি

অন্যমনস্ক ভাবে নদীর ধার দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে চলিতে অছিমদ্দির বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। মনে হইল অছিমদ্দির স্ত্রীর কথা। সে এখন দেখিতে কেমন হইয়াছে? তাকে একবার দেখিতে পাই না? এমনি ভাবিতে ভাবিতে আমি কখন যে অছিমদ্দির আঙ্গিনায় গিয়া উঠিলাম, তাহা টের পাইলাম না।

সেখানে অছিমদ্দিকে দেখিলাম না। তার এক ভাই ছিল,—তার কাছে শুনিলাম, অছিমদ্দি ঘোড়া লইয়া পাহাড়ে গিয়াছে। এবার দেশে অজন্মা, ক্ষেতে কিছুই হয় নাই। এবার ইহারা পাহাড় অঞ্চল হইতে শস্যাদি আনিয়া এখানে বেচা-কেনা করিয়া সংসার চালাইতেছে। দুই বৎসরের মধ্যে অছিমদ্দির মত সম্পন্ন গৃহস্থের এমন দুরবস্থা হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, দুই বৎসর পর পর অজন্মা হইয়াছে। তা ছাড়া, পাটের দাম ভয়ানক পড়িয়া গিয়াছে। প্রথম বৎসর অছিমদ্দি বারো আনা জমীতে পাট আবাদ করিয়াছিল। সে পাট এত লোকসান দিয়া বিক্রী করিতে হইয়াছিল যে, অছিমদ্দি তাহাতে একেবারে বসিয়া পড়িল। পর বৎসর পাটের দাম বাড়িবে আশায় সে অর্দ্ধেক জমীতে পাটের আবাদ করিল; কিন্তু এবারেও সেই দুরবস্থা। কাজেই এমনি নানা রকম করিয়া তাদের সংসার চালাইতে হইতেছে।

আমি ভাবিতে লাগিলাম। অছিমদ্দির কবিলার কথা তখন ভুলিয়া গেলাম। শুনিলাম যে, এমনি অবস্থা সব ঘরে। অথচ এই সব প্রজাদের পীড়ন করিয়া দেওয়ান ও নায়েব অনায়াসে নজর, জরিমানা, আবওয়াব প্রভৃতি এমন সব টাকা আদায় করিতেছেন, যাহা আদায় করিবার কোনও আইনসঙ্গত অধিকার আমাদের নাই।

মাষ্টার মশায়ের কথা মনে পড়িল—অন্যায়কে স্বীকার করিয়া লইও না। এত-বড় অন্যায় কি আমি মাথা পাতিয়া লইব? ইহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব না?

আমি মন স্থির করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমার সাবালক হইতে ছয় মাস বিলম্ব আছে। এ ছয় মাসও চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটা আমার কাপুরুষতা বলিয়া মনে হইল। আমি গিয়া দেওয়ানজীকে বলিলাম, "দেওয়ানজী, কাল থেকে বিচার আমি ক'রবো,—এ সব অত্যাচার আমি হ'তে দেব না।"

দেওয়ানজী হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো, কর না বাবাজী! তোমার হাতে সব তুলে দিতে পারলেই তো আমি বাঁচি। কিন্তু অত্যাচারটা কোথায় দেখলে বাপু?"

"এই যে মাজু সেখকে আপনি পঁচিশ টাকা জরিমানা ক'রলেন—সে সদর সেখের ক্ষেতের ধান কেটেছে ব'লে, এ জরিমানা তো আমাদের পাবার অধিকার নেই!"

দেওয়ানজী বলিলেন, "সদর যদি আদালতে নালিস ক'রতো, তবে তার জরিমানা এর চেয়ে কম হ'ত না; তা' ছাড়া বোধ হয় জেল হ'ত।"

"তা হয় হ'ক, সে জরিমানা নিত গভর্ণমেণ্ট।" "না হয় নিলাম আমরা। এতে জুলুমটা কি হ'ল?"

"জুলুমটা এই যে, এটা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব চুরী। আমরা এমন একটা জিনিষ নিচ্ছি, যা' আমাদের নেবার অধিকার নেই। এ রকম নেওয়া আমি চুরীর সামিল মনে করি।"

"বুঝলাম না বাপু! হাঁ, এমন যদি হ'ত যে, মাজু সেখ কোনও অন্যায় করেনি, বা তার অন্যত্র এর চেয়ে কম শাস্তি হ'ত, তবে বুঝতাম।"

"তাও কি আপনারা করেন না? মহরম আলির বোন বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যা হ'য়েছিল। সে ঘরে ফিরে এসেছে, মহরম তাকে ঘরে নিয়েছে। তাতে আমরা তার কাছে জরিমানা আদায় করি—কোন হিসাবে?"

"এ আবহমান কাল হ'য়ে আসছে। কোনও একটা সামাজিক অপরাধ ক'রলে সমাজকে খাওয়াতে হয়, জমীদারকে জরিমানা দিতে হয়।"

"কিন্তু এ অধিকার আমাদের আইন দেয় নি। আইন অনুসারে এটা যখন আমাদের পাওনা নয়, তখন এটা আমরা মহরমের কাছ থেকে অপহরণ করছি।"

দেওয়ানজী ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা বেশ, তুমি সাবলক হ'য়ে সম্পত্তি পেলে বুঝে সুঝে এসব যদি ছেড়েই দিতে চাও তো দিও। তোমার পাঁটা তুমি ল্যাজে কাটবে, তাতে আমার কি ব'লবার আছে? তা যত দিন না তুমি বুঝে সুঝে নিচ্ছ, তত দিন যেমন চলছে তাই চলুক।"

এই পুরাতন পাপীর শান্ত অন্যায়পরতা আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। আমি তাহাকে এমন একটা ধমক দিলাম, যাহা তাহার ও আমার বয়সের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। দেওয়ানজী ভয়ানক অপমানিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(১০)

রাণী মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিনে দিনে তোমার এ সব হ'চ্ছে কি? দেওয়ানজীকে নাহক অপমান ক'রেছ, তাকে সম্পত্তি শাসন ক'রতে দিতে চাও না, ব্যাপারটা কি?"

আমি বলিলাম, "এর মধ্যে নালিশ এসে পৌঁছেছে! আমি কিছু অন্যায় করিনি।"

"অন্যায় করনি? অত বড় পদস্থ সম্মানী লোককে তুমি গাল দিয়েছ—তা' অন্যায় নয়! তুমি সম্পত্তি শাসনের কিছুই জান না, বোঝ না। এখনো অনেক দিন ওঁর কাছে বসে' শিখলে, তবে তুমি পারবে শাসন ক'রতে। ওই সব বইয়ে-পড়া বুলি নিয়ে সম্পত্তি শাসন হয় না।"

কথায় কথায় আমি বলিয়া ফেলিলাম, "তোমরা কিছুই জান না, বোঝ না। ব্যাঙের মত ইঁদারায় বন্ধ হ'য়ে তোমরা মনে করছো—ইঁদারাটাই পৃথিবী! কিন্তু এদব তোমাদের ভুল। আমি তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী বুঝি। আমি যাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছি, তিনি মহাজ্ঞানী পুরুষ।"

এ কথায় মা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তার পর যে সব কাণ্ড হইল, তা' আমি তখন কিছু জানিলাম না—পরে বুঝিতে পারিলাম। দেওয়ানজী ও মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গোবিন্দ নায়েব সদরে চলিয়া গেল। সেখানে উকীলের পরামর্শ লইয়া জজসাহেবের কাছে রাণীমার নামে এক দরখাস্ত করিল যে, দেওয়ানজীকে আমার গার্জ্জিয়ান নিযুক্ত করা হয়। এদিকে নরেন্দ্র বাবুর নামে চিঠি গেল যে, তাঁহার আর আমাকে শিক্ষা দিতে হইবে না।

যখন জজকোর্ট হইতে নোটিশ পাইলাম, তখন আমি ইহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম যে, মাত্র ছয় মাস নাবালকি—এর মধ্যে ইহারা যে খুসী প্রভুত্ব করিয়া লউক; ছয় মাস পরে বুঝা যাইবে। আমি নিজেই জজ সাহেবের কাছে লিখিয়া দিলাম যে, আমার এই নিয়োগে কোনও আপত্তি নাই। জজসাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে আদালতে হাজির হইবার হুকুম দিলেন! আমি আদালতে যাইয়াও এই কথা বলিলাম; দেখিলাম, জজ সাহেবের খুঁতখুঁতি গেল না। তিনি আমাকে ও মায়ের পক্ষের উকীলকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া দেওয়ানজীকে গার্জ্জিয়ান নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ইহার পর আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এ চালের মর্ম্ম কি? এই আদেশের ফলে আমার নাবালকি আরও তিন বৎসর বাড়িয়া গেল। আমার একুশ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দেওয়ানজী আমার সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইলেন। আমার আর কথা কহিবার অবসর রহিল না।

আমি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিলাম। তখন সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, আর এ গৃহে ফিরিয়া আসিব না। কলিকাতায় গিয়া নরেন্দ্র বাবুর কাছে গেলাম। তখন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। তাহা শুনিয়া তিনি আমাকে কি উৎসাহ দিলেন, তাহা বলিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমার বাড়ীতে কবে আসবেন।"

তিনি একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মা ও দেওয়ানজী যে আমাকে বরখাস্ত ক'রেছেন হে।"

এ সংবাদ আমি তখনও জানিতাম না,—শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আমি তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিলাম, তাঁহাকে আমার বাড়ীতে আনিতে পারিলাম না। তার পর আমি বলিলাম, "আপনি তাই ব'লে আমাকে ত্যাগ ক'রবেন না। আমি সর্ব্বদা আপনার কাছে আসবো।"

তিনি এ কথায় প্রথমে বলিলেন, "এখন তোমার যিনি শিক্ষক হ'বেন, তাঁর যদি আপত্তি না থাকে, তবে এসো।"

তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এমন হইল। আমি সব কথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া নরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক রাখা চ'লবে না। সেটা আমার পক্ষে অন্যায় হ'বে। তুমি আমার কাছে আর এসো না।"

আমি কাঁদিয়া বাসায় ফিরিলাম।

গোবিন্দ আমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিল। সে দেখিয়া শুনিয়া একজন শিক্ষক আমার জন্য নিযুক্ত করিয়া গেল। এ ব্যক্তিও এম-এ, কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর পদধূলির যোগ্য নয়। ইহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—বেতনের একশত টাকা। তাহার জন্য সে গোবিন্দের ভয়ানক খোসামুদী করিত। আমার সুধু খোসামুদী নয়, দাসত্ব করিত। ইহার কাছে যতই থাকিতাম, ততই আমার মন নরেন্দ্র-বাবুর জন্য হাঁপাইয়া উঠিত। ভাবিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত যে, এমনি অবস্থায় আমার আর সাড়ে তিন বৎসর কাটাইতে হইবে।

বাড়ী হইতে অতিষ্ঠ হইয়া পলাইয়াছিলাম। কলিকাতায় বাস তার অধিক দুঃসহ হইয়া উঠিল। আমার সব উৎসাহ দমিয়া গেল। পড়াশুনা ভাল লাগিল না, খেলাধূলা ছাড়িয়া দিলাম। লোকের সাহচর্য্য ভাল লাগিত না। আমি আমার বেশীর ভাগ অবসর সময় কাটাইতাম একা ময়দানে।

আমার জীবনের এই দুর্ব্বিষহ বোঝার মধ্যে আমার স্ত্রী সাবিত্রী হইল একটা অতিরিক্ত বোঝা। সেই যেদিন সে আমাকে বিধুর প্রতি অনুরক্ত হইতে দেখিয়াছিল, সেই হইতে সে আমার উপর যে কেবল শ্রদ্ধা হারাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল তাহা নয়, সে প্রথমটা মায়ের প্ররোচনায় এবং শেষে তার নিজের বুদ্ধিতে আপনাকে আমার নীতি-সংশোধক করিয়া তুলিয়াছিল। সে কথায় কথায় আমাকে উপদেশ দিত, শাসন করিত। আমার বুঝিতে কষ্ট হইত না যে, সে সব উপদেশ মার কাছে শেখা। এইটুকু মেয়ের এতটা ডেঁপোমি দেখিয়া আমার হাড় জ্বলিয়া উঠিত। তাই তার অলোকসামান্য রূপ সত্ত্বেও আমি সাবিত্রীকে কোনও দিনই ভালবাসিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সে যে আমার কাছে চিঠি লিখিত, তাহা এত সদুপদেশে বোঝাই থাকিত যে, ক্রমে তার হাতের লেখা আমার চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। শেষের দিকে আমি তার চিঠি পাইলেই আগুনে ফেলিয়া দিতাম।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া যখন আমি বাড়ী ফিরিলাম, তখন সাবিত্রী প্রায় কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তার রূপ অপূর্ব্ব গৌরবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ হইলাম, তাহাকে গভীর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলাম। কিন্তু সে পরিপূর্ণ নির্ভরের সহিত আমার আলিঙ্গনে ধরা না দিয়া, সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখ শুঁকিতে লাগিল।

"উঃ, ছাড়, ছাড়! কি তামাকের গন্ধ!" বলিয়া সে হঠাৎ ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। তার পর গম্ভীর ভাবে বলিল, "বল, আর কখ্খনো তামাক খাবে না?"

এত বড় অবিচারে আমার অন্তর ক্ষেপিয়া উঠিল। দেড় বৎসরের মধ্যে আমি তামাক স্পর্শ করি নাই, আর সে কি না সাফ বলিল, আমার মুখে তামাকের গন্ধ! আমি এ বিষয়ে সাফাই গাহিবারও কোনও প্রয়োজন দেখিলাম না। বলিলাম, "না, তা' ব'লতে পারবো না" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলাম।

এমনি করিয়া জ্বালাইয়া পোড়াইয়া সাবিত্রী আমার চিত্তকে তার উপর সম্পূর্ণ বিমুখ করিয়া দিল। শেষে এক দিন সে গম্ভীর ভাবে আমার হিতৈষী বন্ধু সাজিয়া আমাকে উপদেশ দিতে লাগিল যে, মা যে আমার আর তিন বৎসরের নাবালকীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমার পরম মঙ্গল সাধিত হইয়াছে; কেন না, আমার যে রকম মতিগতি, তাহাতে এই বয়সে বিষয় হাতে পাইলে আমি একেবারে বহিয়া যাইতাম, এবং বিষয় উড়াইয়া ফেলিতাম। এই সদুপদেশ সে নানা দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা আমার মাথার ভিতর গাদিয়া দিবার চেষ্টা করিতে আমি উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম, "দেখ, তোমার বিয়ে করাটা ভু'ল হ'য়েছে। স্বামীতে তো তোমার কোনও দরকার নেই, তোমার দরকার ছিল একদল শিষ্যের। তা' যা' ভুল করে ফেলেছ, তার আর কি ক'রবে; যা হ'ক এখনও উপায় আছে। এখনো যদি একটা ভৈরবী টৈরবী হ'য়ে বেরিয়ে পড়তে পার, তবে তোমার ঠিক যোগ্য শিষ্য-সেবক জুটতে পারে, আমাকে রেহাই দেও।"

আমার এ কথার শ্লেষটা তার মাথায় ঢুকিল না। সাবিত্রী যত বড় জেঠাই হউক,—তার মগজের ভিতর একটি জিনিষের সম্পূর্ণ অভাব,—সে হাস্যরসবোধ। সে ভয়ানক কাজের লোক, সংসারের সব জিনিষের ভিতর সে মৌমাছির মত তত্ত্ব আহরণ করিয়া বেড়ায়। রসের সে ধার ধারে না। আমার কথাটার রস তার মাথায় পৌঁছিল না,

কিন্তু তত্ত্বটা বোধ হয় পৌঁছিয়া থাকিবে। আমার মনে হয় যে, ঠিক আমারই কথায় তার এই খেয়াল হইল যে, ধর্ম্মে আমার মতি লওয়াইতে পারিলেই আমার সকল সত্য ও কল্পিত দোষ খণ্ডিয়া যাইবে। তাই সে মাকে কি জানি কি বুঝাইয়া ব্যবস্থা করিল যে, আমাকে মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া হইবে। আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া সে আমাদের গুরুদেবকে ডাকাইয়া আমাদের দুইজনের মন্ত্র-দীক্ষার সব আয়োজন করিল। আমি সংবাদ পাইয়া তার পূর্ব্ব দিনই সকল বাধা-বিঘ্ন দুই হাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। আসিয়া সাবিত্রীর কয়েকখানা চিঠি পাইয়াছিলাম। সম্ভবতঃ সেগুলি খুব তিরস্কার ও উপদেশে বোঝাই ছিল। চিঠিগুলি ওজনে খুব ভারী ছিল, তার উপদেশ গুলিও খুব সম্ভব ভারী ভারী ছিল। আশা করি, অগ্নিদেব সেগুলি উদরসাৎ করিয়া প্রভূত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

কমলাকান্তের পত্র

যদি

"যদি" দিয়ে হাতী কেনা যায়, এ কথা নতুন নয়। যদি আজ আমি রাজতক্তে বস্‌তে পাই—এমন কি, তারকেশ্বরের ফাঁকা গদিতে আসন পাত্‌তে পাই, ত আমি একটা ছেড়ে দশটা হাতী কিন্‌তে পারি ; এ সহজ কথাটা বুঝতে তোমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নয়। তবে এই "যদি"র পর একটা নিদারুণ "কিন্তু" এসে পড়েই—আর হাতী ছেড়ে একটা রামছাগল কেনাও অসম্ভব হয়ে পড়ে, এই যা মুস্কিল !

তবে এই "কিন্তু"র উপর আর একটা "কিন্তু" আছে ; সেটা হ'চ্চে এই যে, আমরা যখন এই "যদি"র নেশায়—এই সম্ভাবিতের দিবাস্বপ্নে মজগুল্ হ'য়ে থাকি, তখন "কিন্তু"র কথাটা, অর্থাৎ তারকেশ্বরের ফাঁকা গদিতে বস্‌বার প্রতি অন্তরায়টা, খুব প্রকট হ'য়ে আমাদের স্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটায় না ; তখন কথাটা দাঁড়ায় এই—যদি আমি রাজা হই, হাতী কিন্‌তে পারি, কিন্তু রাজা হচ্চি না, কিন্তু যদি হই ত কিন্‌তে পারি ত, এই বলে "যদি"র উপর একটা প্রবল দমক দিয়ে প্রথম "কিন্তু"র খোঁচাটা ভুলে যাই। এ "কিন্তু" দিয়ে "কিন্তু"র মার—যেন কণ্টকেন কণ্টকোদ্ধরণম্।

এই "যদি" আর "কিন্তু"র মারপেঁচে আমরা এখন স্বরাজ্যরূপ হাতী কিন্‌তে ব্যস্ত হয়েচি। "যদি" হল আশা, "কিন্তু" হল নৈরাশ্য। "যদি" বলে—ভয় কি ? "কিন্তু" বলে—ভরসা কিসের ? "যদি" বলে—আগু চল্, "কিন্তু" বলে—অনেক জল। যদি আর কিন্তু—এই দুই দলের লড়াই আমি দেশময় দেখতে পাচ্চি। উভয় পক্ষের "যদি" যদি সত্যি হয়, তা হলে হাতী ছেড়ে ঐরাবত কেনা হবে, আর "কিন্তু" যদি প্রবল হয়, ত রামছাগলও জুটবে না।

একদল বল্‌চেন, যদি অহিংসা দেশের লোকের—প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরের অনুভূতি হয়, হৃদয়ের সত্য সংস্কার হয়, তবে কাল স্বরাজ আস্‌বে। অপর দল বল্‌চেন—কিন্তু, তা হবে কি ? মানুষ মাত্রেই দেবতা হবে কি ?

আর একদল বল্‌চেন—যদি সমগ্র দেশটা আজ শুধু তর্জ্জনী হেলন ক'রে এক জোটে তর্জ্জন ক'রে হিংস হ'য়ে ওঠে—তা হ'লে কালই স্বরাজ মিল্‌বে। অপর পক্ষ বল্‌চেন, কিন্তু তা সম্ভব কি ? সব মানুষ এক জোটে পশুবৃত্তি হ'য়ে যাবে কি ?

আমি দেখচি, উভয় পক্ষের "যদি" সমান অসম্ভব; এবং উভয় পক্ষের "কিন্তু"টা সমান প্রবল। অর্থাৎ মানুষ একজোটে অহিংসও হ'বে না, হিংসও হ'বে না—দেবতাও হ'বে না, পশুও হ'বে না, অতএব স্বরাজ্য মিল্‌বে না।

এই যদি ও কিন্তুর লড়াইএর ভেতর ধর্ম্মাধর্ম্মের কূটতর্কের কথা আমি তুল্‌ব না—স্বরাজ্যলাভের উপায় স্বরূপ সেটাই কিন্তুর কবল অতিক্রম ক'রে চরিতার্থতা লাভ করবে, সেটাই পরম ধর্ম্ম - এবং সে ধর্ম্মের মূল হিংসাও নয়, অহিংসাও নয়—তা'র মূল ঐক্য। এক হ'য়ে যদি আমরা শুধু হাস্‌তে থাকি, ছোট বড় নির্ব্বিশেষে আমরা যদি বিপক্ষকে দেখলেই—দন্তরুচি-কৌমুদী বিকিরণ ক'রে স্বধু হাস্‌তে থাকি, তা হ'লে সে যত বড় বিপক্ষই হ'ক না, তাঁকে আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি। পথে, ঘাটে, সভায়, সমিতিতে, আদালতে, কন্‌ভোকেশনে, কাউন্সিলে, ক্লাবে, রেলে, ট্রামে, ষ্টীমারে, ঘরে বাইরে - দেখো আর হাস, দেথ্‌মার করে যদি না পার, দেখন্-হাসি করে উড়িয়ে দিতে পারবে। আমি শুনিচি না কি ইজিপ্টে সাহেব দেখলেই, ছেলে বুড়ো, মাগী মিন্সে, পথে ঘাটে, হাটে মাঠে—জগ্‌লুল, জগ্‌লুল, জগ্‌লুল—এই বুলি আওড়াত; যেন কে কাকে বল্‌চে, কিন্তু যাকে বল্‌চে সে মনে বুঝে

এমন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠত যে, পালিয়ে তবে তার প্রাণ বাঁচত। এই ঘাড় নেড়ে নেড়ে জগ্‌লুল, জগ্‌লুল বলা হিংসও নয় অহিংসও নয়, একটা বিরাট বিদ্রূপমাত্র ; সেটা কোন দণ্ডবিধির কবলে পড়ে না, অথচ প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তোলে।

তাই বলি, যদি একজোটে হাস্‌তে পার, কি কাঁদতে পার, কি হাই তুল্‌তে পার, কি ঢেঁকুর তুলতে পার—তা হ'লে প্রতিপক্ষের আর ঘরের বার হওয়া দায় হ'য়ে উঠবে এবং সত্বরই পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হ'বে।

কিন্তু এখানেও সেই "কিন্তু"র ঠেলা—যদি একজোটে হাস্‌তে পার ইত্যাদি, কিন্তু পারবে কি ?

দিন দুনিয়ার মালিক যতদিন এক ছিলেন—ছিলেন। একদিন তাঁর ইচ্ছা হ'ল "বহু স্যাম্", আর বহু হলেন ; সেইদিন হ'তে "বহু স্যাম্" এই আকাঙ্ক্ষাই দুনিয়াকেও ব্যাপ্ত করল—শরীরী অশরীরীর মধ্যে, স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে বিশ্ব প্রপঞ্চের সর্ব্বস্থলে—বহুত্বই আইন হ'য়ে গেল। কিন্তু তত্ত্বদর্শী বল্লেন, সে বহুত্ব বাহ্যিক, ব্যবহারিক, মায়িক—মৌলিক নয় ;—তাই তিনি এই বহুত্বের মধ্যে একের সন্ধান করে দেখালেন—বিশ্ব এক, যেহেতু আত্মা এক—সেই এককে উপলব্ধি করতে পারলেই বহু এক হয়ে যাবে।

এই একীকরণের চেষ্টায় তত্ত্বদর্শী মানুষকে তত্ত্বদর্শন করতে শিখালেন—যে তৃতীয় নেত্রে মায়ার আবরণ ভেদ ক'রে সে তত্ত্বদর্শন সম্ভব হয়, সেই তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করবার জন্য পর পর বহুতর অনুশীলনের স্তর উদ্ভাবিত করলেন। এই অনুশীলনের পর্য্যায়ের নাম হ'ল ধর্ম্ম, সংস্কার, যোগ ইত্যাদি ;—কিন্তু সেই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এক হলেও তিনিও "বহু স্যাম্" ; তাই আজ যত দেশ তত ধর্ম্ম, দেশে যত জাতি তত ধর্ম্ম, জাতিতে যত গোষ্ঠী তত ধর্ম্ম, গোষ্ঠী মধ্যে যত লোক তত ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম দিয়ে বহুকে এক করা কোন যুগে, কোন দেশে হল না—আমাদের দেশেও নয়।

আমাদের দেশে ছিলেন হিন্দুধর্ম্ম ;—কালে তিনি বহু হলেন ; তারপর এলেন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম,—তাঁরাও বহু হলেন ; তারপর এলেন মুশলমান ধর্ম্ম ;—তিনিও অখণ্ড রইলেন না ; তারপর খৃষ্টান ধর্ম্ম ;—তাঁরও অনেক শাখা প্রশাখা। এত ধর্ম্ম-বাহুল্যে একত্ব আসে কোথা হ'তে !

ধর্ম্ম মানুষটাকে হয়ত বাঁধতে, সংযত করতে পারে ; জাতিটাকে—ভারতীয় মনুষ্যগোষ্ঠীকে সমগ্রভাবে ধরে' আটি বাঁধে কি প্রকারে ? সুতরাং আত্মাই এক হ'ক আর পরমাত্মাই এক হ'ক—মানুষ ধর্ম্মের দিক দিয়ে বহু হ'য়েই আছে ও থাকবে।

তবে উপায় কি ? হিন্দুকে বাঁধতে গেলে মুসলমান রাগ করে, আবার হিন্দু মুসলমানকে বাঁধতে গেলে হিন্দু মুসলমান ছাড়া যে তৃতীয় সম্প্রদায়, হয় সে চেষ্টাকে হেসে উড়িয়ে দেন, নয় ত রাগে গর্ গর্ করতে থাকেন ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে, যদি এক হয় এই আশঙ্কায়, কাঁপতেও থাকেন ; আমরাও, যদি হয়, এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

কিন্তু হবার নয় ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই নিয়েই আমরা, মানুষ মাত্রেই—"বহু স্যাম্"। তবে একীকরণের উপায় কি ?

কবি বলিয়াছেন—

জন্মিলে খাইতে হ'বে
নিখাগী কে কোথা কবে
(অতএব) মধুহীন কোরো না গো
তব পদ-কোকনদে।

কবি হলেও তিনি নিখাগী নন, তাই বলেচেন কোকনদের শোভার সঙ্গে একটু মধু রাখিও—কেননা স্বধু তোমার ও রাঙ্গা পায়ের শোভা দেখিয়াই পেট ভরিবে না।

আমি এই কবিবাক্য পর্য্যালোচনা করে দেখলাম—কবিই প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্বদর্শী বটেন ;—জন্ম-মৃত্যুর অধীন এই মনুষ্য-দেহের মধ্যস্থিত যে উদররূপী গহ্বর—তা'তেই একত্বের সমস্যা পচ্যমান। মানুষের পেটই একত্বের নিদান। কেহ কেহ বলেছেন—Man does not live by bread alone—সেটা তাঁদেরই কথা, যাঁদের ঘরে আট্‌কে বাঁধা আছে ; এবং সেটা স্বধু কথার কথা মাত্র। আমি দেখ্‌তে চাই, পেট যখন পিতৃপুরুষের অন্তকামী হ'য়ে ওঠে, তখন কোন্ কবি কবিতা লিখে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন ; যে কবির অমর চরণ উপরে উদ্ধৃত করেছি তিনি যখন খেতে পেতেন, তখন মেঘনাদ-বধ কাব্য লিখেছিলেন ; আর যখন খেতে পান নি, তখন রোগগ্রস্ত হয়ে হাঁসপাতালে মরেছেন। হিন্দুর গোঁড়ামী তাঁর ক্ষুধাবৃদ্ধি করেছিল, খৃষ্টান ধর্ম্ম তা নিবারণ করে নি।

অতএব এই ক্ষুধার সেবা কর তবেই একত্র মিল্‌বে, এবং একত্র মিল্‌লেই বাঁচ্‌বে! যদি ক্ষুধার ডাকে সাড়া দিতে পার, ত সে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়ারই মত শুনাবে; কেননা মা আমাদের ক্ষুধারূপিণী;—এই তেত্রিশ কোটির ক্ষুধা যদি মায়ের ক্ষুধা না হয়, তবে সে আমাদের মা নয়!

আজ ১৪ই জুলাই, ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ফরাসী জাতি এই ক্ষুধার ডাকে সাড়া দিয়েছিল; আবালবৃদ্ধ বনিতার জঠরাগ্নি বাড়বানলের রূপ ধারণ করে অনাচার অত্যাচারের বিশাল বারিধিকে পরিশুষ্ক করেছিল; সেটা ফরাসী মায়ের ডাকেরই মত শুনিয়েছিল। বুভুক্ষিত ফরাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা যে Come children of the fatherland, the day of glory is come বলে সমস্বরে গেয়ে উঠেছিল, সে স্তোত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির সম্ভাবনা-জনিত উল্লাসেরই অভিব্যক্তি মাত্র; তারা day of glory না বলে day of feasting বল্‌লে ভাবগত বৈষম্য কিছুই হ'ত না! অতএব 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' এই ঋষিবাক্যের যে উত্তর বুভুক্ষিত নিপীড়িত মানুষ যুগে যুগে প্রদান করেচে, যদি সেই উত্তর সমস্বরে দিগন্ত-বিদারী বজ্র-নির্ঘোষে দিতে পার, তবে তুমি আহিত-জঠরাগ্নি অফুরন্ত হব্যের সঙ্গে সঙ্গে অফুরন্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

যদি বল পেটের ক্ষিদেকে patriotism করে তুল্‌লে, কথাটা ভাল শুনায় না;—কিন্তু কখন ও জিনিষটাকে তলিয়ে বুঝেচ কি? যে কোন দেশে, যে কোন যুগে মানুষের যে কোন চেষ্টা, সবই ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টামাত্র। আদিম মনুষ্য-সমাজ মধ্য-এসিয়ার আদি নিবাস হতে ছড়িয়ে পড়ে "পশ্চিমে হিস্পানি দেশ পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দু দেশ" পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল কিসের জন্য? পেটের দায়ে। প্রাচীন রোম গ্রীস হতে বর্ত্তমান ইংলণ্ড আমেরিকা জর্ম্মানি পর্য্যন্ত যে বিরাট উদ্যমে বিজ্ঞান বাণিজ্য ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেচে—এই বিপুল উদ্যমের মধ্যে অন্নসংস্থান করা ছাড়া আর কিসের লক্ষণ দেখতে পাও? যাকে Pure science বা Pure adventure বা Pure Philanthropy বল, উত্তরমেরু আবিষ্কারের প্রচেষ্টা বা এভারেষ্ট অভিযান, কোনটাই জঠরানল নিবৃত্তির সহিত সম্পর্কশূন্য নয়।

যদি ভালরকম একটা নাম দিতে চাও দাও, তা'তে কাজের সুবিধা হতে পারে—যারা পেটের জন্য 'এই কর' বল্‌লে মাত্‌বে না, তা'রা যদি patriotism বল্‌লে মাতেত তাই কর। এরকম পদ্ধতির নিদর্শন চারিদিকেই আছে—white man's burden বল্‌তে মূলতঃ white man's bread বুঝালেও, প্রথমোক্ত আখ্যাটীতে লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহজে সগৌরবে কার্য্যসিদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু এই নামের মাহাত্ম্যে আসল কথাটা ভুলো না;—আসল কথাটা যে পেটেরই কথা সেটা ভুলো না, তা'তে কার্য্যহানির সম্ভাবনা।

অতএব দেখা গেল—ক্ষুধা আছেন, সে বিষয়ে "যদি" কিছু নাই; এবং ক্ষুধা সকলেরই আছেন, সে বিষয়েও "যদি" কিছু নাই; এবং ক্ষুধার তাড়নে মানুষ অসাধ্য-সাধন করে, সে বিষয়েও মানুষের সৃষ্টির দিন হতে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়ে আস্‌চে; সুতরাং এখানেও "যদি" কিছু নাই। যেখানে "যদি" নাই সেখানে "কিন্তু"ও নাই—যেখানে সন্দেহ নাই সেখানে বিভিন্ন অনুমান নাই, বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও নাই। খেতে হবেই, নইলে মরতে হবে,—ইহার ভিতর "যদি" বা "কিন্তু" কিছুই নাই।

অতএব, এই বিশ্বব্যাপী ক্ষুধাকে ফুটিয়ে মুখর করে তোলো;—এমন ঐক্যের ভিত্তি, এমন অটুট বাঁধন আর কোথায় পাবে?

১৪ই জুলাই '২৪ কমলাকান্ত

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

১

গীতার যে শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ হইবে, সেই শ্লোকটা বারংবার করিয়া পড়িয়া সুরেশের দুই চোখে যখন জল আসিবার মত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় শৈল আসিয়া কহিল, 'ও-সব কি পড়ছ,—জান না খবর?'

সুরেশ শৈলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কি?

শৈল কহিল, ঠাকুরপো যে উইলের মামলা করছে—শোন নি?

শ্লোকের চরণ-দুটা তড়িতের মত বুকের মধ্যে খেলিয়া গেল; সুরেশ কহিল, হাঁ জানি।

শৈল চোখ দুটা কপালে তুলিয়া কহিল, জানো, তবু ব'সে ব'সে ঐ সব পড়ছ? একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। উইল-টুইল ত' সব মিথ্যে!

সুরেশ বড়, সতীশ তাহার ছোট বৈমাত্রেয় ভাই। সুরেশের পিতা কালীশঙ্কর বাবু বিহারে ওকালতী করিয়া অনেক সম্পত্তি করিয়া সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী, এবং দুই ছেলে। দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী নয়নতারার ঝাঁঝ এত বেশী যে, তাঁহার জীবদ্দশাতেই কালীশঙ্কর বাবু সুরেশকে পৃথক বাটী করিয়া দিয়াছিলেন,—সুরেশ তাহাতেই থাকিত। সুরেশ একটা স্কুলে মাষ্টারী করিত। সতীশ কিছুই করিত না, এবং এই কিছু-না করার ফল দাঁড়াইয়াছিল এই, যে, দিন দিন তাহার চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল বে-পরোয়া হইয়া উঠিতেছিল। কালীশঙ্কর বাবু ভরসা করিতেন যে, কালে এই চাঞ্চল্য কাটিয়া গিয়া সতীশ মানুষ হইবে; কিন্তু এই অপূর্ব্ব ভরসা লইয়া যেদিন সহসা তিনি পরলোকে যাত্রা করিলেন, সে দিন পর্য্যন্ত সতীশের পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

শোনা গিয়াছিল যে, সে একটা মিথ্যা উইল তৈয়ার করিয়াছে, এই মর্ম্মে, যে, কালীশঙ্কর বাবু সুরেশকে মাত্র তাহার থাকিবার বাড়ীটি দিয়া বাকী সমস্তই সতীশকে দিয়াছেন।

এ-কথা কেহ বা বিশ্বাস করিত, কেহ করিত না। সুরেশ নিজে বেশ ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না; এবং এ সম্বন্ধে স্ত্রীর সঙ্গে তর্কও করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে যখন উইলের মামলা দায়ের হইল, তখন আর না বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ রহিল না।

ছেলেবেলায় যে শুধু নিজের মাকে হারায় না, পরন্তু একটি বিমাতাও লাভ করে, তাহার দুর্ভাগ্য অপরিসীম হইলেও এটা ঠিক যে, শিক্ষার অবসর সে প্রচুর পায়। স্বভাবতঃ শান্তস্বভাব সুরেশকে এই দুর্ভাগ্য যাহা দান করিয়াছিল, মনের পক্ষে তাহার মূল্য কম নয়। আনন্দ তাহার ভাগ্যে কমই জুটিয়াছিল, কিন্তু দুঃখ তাহাকে আর ষোল আনা দুঃখ দিতে পারিত না।

সুতরাং সে স্ত্রীর কথায় শান্তভাবে উত্তর করিল; জানি—উইল মিথ্যে, কিন্তু আমি কিছুই করব না।

শৈল উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিছু করবে না?—সমস্তটা ওর হাতে তুলে দেবে?

সুরেশ কহিল, ও ত' ভাইই! ওই না হয় সবটা ভোগ করুক!

শৈল অবাক্ হইয়া গেল। কহিল, আশ্চর্য্য তোমার মন! আমাদের দশা হবে কি?

সুরেশ কহিল, যা চলছে তাই চলবে। কেন, এই মাষ্টারি ক'রেই চলবে! এতে ত' কোন কষ্ট নেই শৈল।

শৈল চুপ্ করিয়া রহিল। গীতা বুঝিবার মত তাহার বয়স না হইলেও, সে স্বামীর উদারতা মাঝে মাঝে অনুভব করিত। এখন এই কথাটাই তাহার সব চেয়ে আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, এই যে লোকটি

আশী টাকা মাষ্টারির ভরসা করিয়া হেলায় এত বড় একটা সম্পত্তি অপরকে দান করিতে চলিয়াছে, তাহাকে লাভের জন্য এতটুকু চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে রাজী নয়, কি অদ্ভুত এর মন। এই মনের বিশালতা বোধ করি তাহার অন্তরকেও স্পর্শ করিল। সে খানিকটা চুপচাপ করিয়া থাকিয়া সুরেশের কাছে আসিয়া বসিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত আপনার দুই হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, কিন্তু একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে ক্ষতি কি ?

সুরেশ কহিল, শৈল, সে কথাও ভেবে দেখেছি। ওর তরফে ডাক্তার সাক্ষ্য দেবে, আরও ছোট বড় অনেক সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে, গোকুলানন্দ বাবুও সাক্ষ্য দেবেন।

শৈল বিস্মিত হইয়া কহিল, গোকুলানন্দ বাবুও ! তিনি কি বলবেন ?

সুরেশ হাসিল, কহিল, কেন, বলবেন যে, বাবা তাঁর সামনে ঐ উইল লিখেছেন, আর তাঁর দস্তখতও তাতে আছে ?

এই গোকুলানন্দ প্রসাদ সেই জেলার সব চেয়ে বড় উকীল, এবং ধর্ম্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও আছে। কালীশঙ্কর বাবুর জীবদ্দশায় উভয়ে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং এ কথা সকলেই জানিত যে, তাঁহার সাক্ষ্য বিচারক কোন মতেই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

শৈল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তিনিও মিথ্যে বলবেন—কেন ?

সুরেশ কহিল, টাকা, শৈল টাকা !

শৈলর গৌরবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে কহিল, টাকা হলো সত্যের চেয়ে বড় ! কেন, তাঁর ত' নিজের টাকার অভাব নেই।

সুরেশ কহিল, যার টাকার অভাব নেই, তারই অভাব সব চেয়ে বড় শৈল, আর যে গরীব, সেই সুখী।

শৈল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পর খপ্‌ করিয়া স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, তবে আমরা গরীবই থাকব, কি বল ? হাঁ, সেই ভাল—বলিয়া চকিতের মত অন্তর্হিত হইয়া গেল।

২

দ্বিজেন বাবুও একজন বড় উকীল, কালীশঙ্কর বাবুর বন্ধু। তিনি আসিয়া সুরেশকে বলিলেন, সুরেশ, এত বড় একটা অধর্ম্ম আমাদের চোখের সামনে হ'তে চললো, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি কালীদার মনের ভাব জানতাম, তিনি তাঁর কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি উচ্ছৃঙ্খলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তোমাকেই অধিকাংশ দেবেন স্থির করেছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তা' হ'য়ে ওঠেনি। ন্যায়তঃ তুমি অর্দ্ধেকের অধিকারী, সুতরাং এ মামলা ভাল ক'রে লড়তে হবে।

সুরেশ কহিল, কিন্তু আমি ত' মনে করেছি যে মোটেই লড়ব না।

দ্বিজেন বাবু কহিলেন, কেন ?

সুরেশ কহিল, ওতে আমার কোন লোভ নেই। আর সতীশ পেলে আমারও পাওয়া হোল।

দ্বিজেন বাবু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, না, তোমারও পাওয়া হোল না, সুরেশ ! তুমি না লড়ো, আমি লড়ব। তুমি শুদ্ধ আমাকে একটা ওকালতনামা দেও, তার পর আমি দেখে নেবো।

সুরেশ অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু পিতৃবন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। অবশেষে সে ক্ষমতা-পত্র লিখিয়া দিয়া কহিল, কিন্তু আমাকে ওর ভেতর টানবেন না, যা হয় আপনারাই করুন।

কয়দিন ধরিয়া মোকদ্দমা খুব চলিল। দ্বিজেন বাবু প্রাণপণ পরিশ্রম করিলেন ; কিন্তু যে দিন রায় বাহির হইল, সেদিন দেখা গেল, সাক্ষী গোকুলানন্দের কথার উপর একান্ত বিশ্বাস করিয়া বিচারক উইল সত্য স্থির করিয়া সতীশকে ডিক্রি দিয়াছেন।

* * * *

দ্বাদশীর চাঁদ সন্ধ্যার পরেই বেশ উজ্জ্বল হইয়াছিল। বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া শৈল বসিয়া ছিল। স্বামীর কথায় তাহার মন অনেকটা শান্ত হইয়াছিল ; কিন্তু মনে মনে এ ভরসাও ছিল, যে হয় ত অবশেষে সত্যেরই জয় হইবে। আজ সে জানিত, ফলাফল বাহির হইবে, তাই কতকটা উৎকণ্ঠার সহিত স্বামীর অপেক্ষা করিতেছিল।

এমন সময় সুরেশ আসিল। শৈল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, কি হোল ?

সুরেশ হাসিয়া কহিল, যা হবার তাই হ'য়েছে—সতীশ জিতেছে।

শৈল চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, ঠাকুরপো হেরেছে আমরা জিতেছি। মিথ্যে কখনও জেতে না।

সুরেশ হাসিতে লাগিল, কহিল, মিথ্যে জিতুক আর না জিতুক, আমি ত' এর হেঁপা থেকে বাঁচলুম। আমার পক্ষে সেই মস্ত জিত শৈল !

শৈল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না—না, আমরা হারিনি, হারিনি, আমাদের কেউ হারাতে পারবে না। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় বাড়ীর সামনে একটা গাড়ী থামার শব্দে দুইজনে সেইদিকে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার উপরে গোটাকতক পুঁটুলি ও বাক্স, এবং ভিতর হইতে যে লোকটি নামিল সে স্ত্রীলোক ; এবং বিস্ময়ের সহিত তাহারা চিনিল যে সে নয়নতারা !

নয়নতারা ডাক্ দিয়া কহিলেন, বাবা সুরেশ !

সুরেশ তাড়াতাড়ি গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা-যে ! এ সময়ে ?

নয়নতারা কহিলেন, আমি এইখেনে থাকবো সুরেশ, তাই এলাম।

সুরেশ কহিল, বেশ ত' ! কিন্তু—

নয়নতারা কহিলেন, ও-বাড়ীতে আমার আর থাকা চলবে না, সুরেশ ! এত বড় মিথ্যে বরদাস্ত করে থাকা আমার মতন লোকেরও সম্ভব হোল না। আমি ওকে কত বুঝালাম যে, ওরে নির্ব্বোধ, এ তোর জিত নয়, এ তোর সব চেয়ে বড় হার ! যার প্রাপ্য যা, তাকে তা দিয়ে, এই মিথ্যা জয়ের কলঙ্ক থেকে উদ্ধার হ ; আমাকেও উদ্ধার কর। কিন্তু শোনে কে ? তাই তোমার এখানে এলুম বাবা !

শৈল প্রণাম করিলে পর তাহার মুখে চুমু খাইয়া কহিলেন, মা, রাজরাণী হও।

৩

সেদিন সন্ধ্যার পর পূজার ঘরে গিয়া গোকুলানন্দ দেখিলেন, তাঁহার পরম আরাধ্য দেবতা জানকী-রঘুনাথ জীউ তাঁহাদের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভূমিতল আশ্রয় করিয়াছেন।

সতীশের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পর হইতে বৃদ্ধের মনে কোনো শান্তি ছিল না। অনেকগুলা টাকার লোভে এই কাজ করিয়াছিলেন,—ইচ্ছা ছিল, পূজার ছুটিতে ভাল করিয়া তীর্থ করিয়া সে পাপ স্খালন করিবেন।

পূজার ঘরে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম-প্রবণ মনে একটা গভীর রেখাপাত করিল। বিগ্রহদ্বয় কি করিয়া যে সিংহাসন-চ্যুত হইলেন, তাহা কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না ; সুতরাং তাঁহার একান্ত বিশ্বাস হইল যে, দেবতাদ্বয় তাঁহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিবার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পৃথিবীতে এমন ব্যাপার প্রায়ই দেখা যায় যে, অধর্ম্মে যে ব্যক্তি অত্যন্ত কঠিন, ধর্ম্ম ব্যাপারে সে তেমনি ভীরু। বিশেষতঃ গোকুলানন্দ স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। শুদ্ধ লোভের বশে এই একটা পাপ করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ-যাত্রার দ্বারা সে পাপ স্খালনের সঙ্কল্পও ছিল।

কিন্তু ঘরের দেবতা যেখানে বিমুখ, সেখানে তীর্থ-যাত্রায় আর ফল কি ? গোকুলানন্দের মনে হইল যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের সঞ্চিত পুণ্য আজ এই এক পাপে ভস্মীভূত হইয়া গেছে—এবং তাঁহারই কর্ম্মদোষে এই কৌলিক ইষ্ট-দেবতাদ্বয় আজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

সেদিন আর পূজা করা হইল না—পূজার ঘরের এক কোণে বসিয়া গোকুলানন্দ বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। হায় মানুষের মন, সে যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া চলে, তাহা কল্পনারও অতীত।

সযত্নে বিগ্রহ-দ্বয়কে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া, তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া গোকুলানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিবেন,—তাঁহার মিথ্যা যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাকে তাহার প্রাপ্য তিনি ফিরাইয়া দিবেন।

৪

সেই রাত্রেই গোকুলানন্দ সতীশের নিকট চলিয়া গেলেন। সতীশকে জয়ের উল্লাস তখন পাইয়া বসিয়াছিল,—

সে তাহার বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া নানাপ্রকার আনন্দোৎসবে মত্ত ছিল।

গোকুলানন্দকে দেখিয়া সে পূর্ব্বের মত বিশেষ কোনও খাতির করিল না; তাহার কারণ বোধ করি সে তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। বন্ধুর মত আপ্যায়ন করিয়া সে তাহাদের সহিত আনন্দে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিল।

গোকুলানন্দের বুকে এও বড় একটা কম ব্যথা দিল না। এই বন্ধু-পুত্রের নিকট বরাবর তিনি পিতার সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন,—আজ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, সে গৌরবের স্থান আর তাঁহার নাই। মিথ্যা দ্বারা যে পরকে বঞ্চিত করিতে চায়, পদে পদে তাহাকেও যে বঞ্চিত হইতে হয়, এ সত্যকে আর ভুল করা চলে না।

গোকুলানন্দ সংক্ষেপে কহিলেন, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন, পাশের ঘরে চলো।

পাশের ঘরে গিয়া সতীশকে কহিলেন, সতীশ, তোমার দাদার যে প্রাপ্য, তা তাকে ফিরিয়ে দাও!

এই সংক্ষেপ আবেদনের পিছনে যে কতখানি বেদনা ছিল, সতীশের তাহা বুঝিবার সাধ্য ছিল না; বোধ করি অবসরও ছিল না। তাহার যে মন্ত্রী দুদিন আগে তাহার হইয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ষোল আনা মিথ্যা নিঃসঙ্কোচে বলিয়া আসিয়াছে, তাহার এই সাধুজনোচিত প্রস্তাব সতীশের মনে হাস্যোদ্রেক করিল মাত্র, সে বিদ্রূপের স্বরে কহিল, দাদা বুঝি কিছু টাকা দিয়েছে?

এই একটা কথার ভিতর যে হলাহল ছিল, তাহা বোধ করি সাপের চেয়ে কম নয়, কিন্তু গোকুলানন্দ মনে করিলেন যে, ইহার জন্য সতীশ ততটা দায়ী নয়, যতটা তিনি নিজে! এমন করিয়াও যদি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হয়!

এ কথার জবাব সহজে আসিল না,—গোকুলানন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, না—যা উচিত, তাই আমি বলতে এসেছি সতীশ। অর্দ্ধেক যে সুরেশের প্রাপ্য, এ কথা আমার বেশী কেউ জানে না, তাই তোমাকে অনুরোধ করতে এসেছি যে, তাকে তার অর্দ্ধেক ফিরিয়ে দেও!

সতীশ কহিল, যদি তাই দেবো, তবে এসব প্রহসনের অর্থ কি?

গোকুলানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন। এই মদোন্মত্ত উদ্ধত যুবককে কেমন করিয়া তিনি বুঝাইবেন যে, কি উপায়ে ইহার নূতন অর্থ তাঁহার চোখের সম্মুখে ধরা পড়িয়াছে! দুই হাতে মাথা টিপিয়া গোকুলানন্দ কহিলেন, আমি তোমার পিতৃ-বন্ধু। আমি অন্যায় ক'রেছি, পাপ ক'রেছি, কিন্তু ফিরতে চাই, তোমাকেও ফেরাতে চাই, তাই এই অনুরোধ।

সতীশ কহিল, আপনি ফিরুন, আমার তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু আমার ফেরবার দরকার নেই, কেন না, তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, এবং ক্ষতিও অনেক। তার চেয়ে ও-ঘরে যে সব আমোদের আয়োজন হ'য়েছে—

গোকুলানন্দ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন,—সতীশ, শিক্ষা আমার বড় বিলম্বে হোল, কিন্তু তা হ'ক, আমি ফেরবার চেষ্টাই করবো, বলিয়া আর অপেক্ষা-মাত্র না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

৫

বাড়ী ফিরিতে গোকুলানন্দের প্রায় রাত্রি বারটা বাজিল। বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল, মাথা টিপটিপ করিতেছিল। ছেলেকে ডাকিয়া কহিলেন, রঘুবর আমাকে এক গ্লাস জল এনে দাও।

রঘুবর জল আনিয়া পিতার রুক্ষ কেশ ও মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল, কহিল, বাবা আজ কিছু খাবেন না? আপনার চেহারা ভাল দেখাচ্ছে না।

গোকুলানন্দ কহিলেন, না, আজ আমার মন ভাল নেই, শরীরও বোধ করি ভাল নেই।

রঘুবর পিতার গায়ে হাত দিয়া বলিল, বাবা, আপনার জ্বর হ'য়েছে যে, খুব জ্বর!

গোকুলানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হ'তে পারে!

* * *

পরদিন সমস্ত দিন প্রবল জ্বর রহিল। দুপুর বেলা রঘুবরকে ডাকিয়া গোকুলানন্দ কহিলেন, রঘুবর, তোমাকে একটা কথা বলব, বড় প্রয়োজনীয়, বড় গোপনীয় কথা।

রঘুবর কহিল, বলুন।

গোকুলানন্দ কহিলেন, বলি, কেন না, হয় ত দেরী সইবে না। বলিয়া উইলের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইতে কাল রাত্রে পূজার ঘরের কাহিনী, সতীশের সহিত কথা-

বার্ত্তা, সকল কথা বলিলেন। বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, রঘুবর, তোমার বাবার ভাগ্যে অনন্ত নরক-ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নাই!

রঘুবর কহিল, বাবা, আপনি অকারণ চিন্তিত হ'চ্ছেন।

গোকুলানন্দ কহিলেন, অকারণ নয় রঘুবর। এর চেয়ে সত্য আর আমার কাছে কিছুই নেই! আমি জানি, আর আমি বাঁচব না, তাই আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যেতে চাই! রঘুবর, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলে, তোমাকে অনেক আর্থিক ক্ষতি সইতে হবে, তাই তোমার সম্মতি চাই। তুমি যদি স্বেচ্ছায় সম্মতি দাও ত আমার আর কোন ক্ষোভ থাকবে না।

রঘুবর বুঝিতে পারিল না, পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গোকুলানন্দ কহিলেন, সুরেশকে তার পিতার অর্দ্ধেক সম্পত্তি থেকে আমি বঞ্চিত ক'রেছি, তাই আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাকে দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই! আমার অনেক পরিশ্রমে অর্জ্জিত সম্পত্তি আমার অত্যন্ত প্রিয় পুত্রের জন্য যক্ষের মত সঞ্চয় ক'রে এসেছি। এর দাম অনেক,—সুরেশকে যা থেকে বঞ্চিত ক'রেছি, বোধ করি তারও চেয়ে বেশী,—কিন্তু খুব বেশী দাম না দিলে ত সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত হবে না, রঘুবর! বলো, তুমি রাজী আছ?

রঘুবর বিস্মিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

গোকুলানন্দ কহিলেন, রঘু, আমি তোমাকে চিরদিন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত পালিত ক'রেছি,—মাতৃহীন তোমার সুখকে আমার নিজের সুখের চেয়ে বড় ক'রে দেখেছি। বড় প্রয়োজন না হ'লে আমি তোমাকে তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতাম না। কিন্তু প্রয়োজন বড় বেশী! রঘু, তোমার বাপকে নরক থেকে উদ্ধার করবার উপায় তোমার হাতে! বল—বলিয়া দুই কম্পিত হস্তে রঘুবরের দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিলেন।

রঘুবরের দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার মত হইল; সে কহিল, বাবা, আপনার শান্তির জন্যে অর্দ্ধেক কেন, আমি সব ছাড়তে পারি।

শুনিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিয়া ছেলের মাথা আপনার কোলের উপর টানিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলেন,—ঠিক যেন পাঁচ বৎসরের ছেলেকে আদর করিতেছেন। আর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, সাবাস্ রঘুবর—সাবাস্!

খানিকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া গোকুলানন্দ কহিলেন, বাবা, আজই উইলটা লিখতে হবে। তুমি ডাক্তার আর ভাল ভাল ৪।৫ জন লোককে ডাকবে—দ্বিজেন বাবু উকীলকে ডেকো। বলো, খুব প্রয়োজনীয়, খুব গোপনীয় ব্যাপার।

* * *

বিকাল বেলা উইল লেখা হইয়া যাওয়ার পর বৃদ্ধ পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, বাবা, আমার মন শান্ত হ'য়েছে; কিন্তু একটা কথা বলে যাই,—যেন আমার শ্রাদ্ধের আগেই এই উইলের মত তুমি কাজ করো।

পুত্র কহিল, বাবা, আপনি মিছে ভয় পাচ্ছেন, আপনি সেরে উঠবেন।

গোকুলানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না, আমি সারতে চাইনে! আজ আমাকে জানকী-রঘুনাথজী ডেকেছিলেন—তাঁরা প্রসন্ন হ'য়েছেন! আর আমার ভয় নেই!

তাহার পর পাঁচ দিনের রোগ-ভোগের ভিতর কেবল মাত্র একটি আকাঙ্ক্ষাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল! সে জানকী-রঘুনাথজীর সহিত মিলন। পাঁচ দিনের পর প্রসন্ন হাস্যে গোকুলানন্দ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এবং বোধ করি কঠিন-প্রায়শ্চিত্ত-পরিশুদ্ধ এই ভক্তটিকে জানকী-রঘুনাথজী তাঁহাদের সিংহাসনের তলায় ভক্তবাঞ্ছিত স্থান-টুকু হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

৬

সুরেশ বাহিরের ঘরে বসিয়া ছিল, এমন সময় নয়নতারা আসিয়া অনুযোগের সুরে কহিলেন, ভাল বউ বাবা তোমার। আজ হাত পুড়িয়েছে, তা আমি বল্লাম আমি রাঁধি, বউ কিছুতেই দিলে না!

সুরেশ স্মিত-হাস্যে কহিল, তোমার ত অভ্যেস নেই মা, কষ্ট হবে।

নয়নতারা কহিলেন, বেঁচে থাকলে কত রকম অভ্যাস করতে হয় বাবা, শৈলরই বা কবে অভ্যেস ছিল,—বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বোধ করি চোখের জল ঢাকিবার জন্য।

সুরেশ কহিল, তা হ'ক, তোমার কষ্ট হবে মা ! এমন সময় একটা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিয়া রঘুবর সুরেশের নিকট আসিতে আসিতে কহিল, আস্‌তে পারি কি ?—জরুরী দরকার।

নয়নতারা পাশের ঘরে সরিয়া গেলেন। সুরেশ আগাইয়া গিয়া রঘুবরকে সাদরে ভিতরে লইয়া আসিয়া বসাইয়া কহিল, বলুন।

রঘুবর আগাগোড়া সমস্ত কথা বলিয়া, উইলের একটা অংশ পাঠ করিল এইরূপ; "আমার আত্মার শান্তির জন্য আমি চাই যে, আমার পুত্র সুরেশকে তাহার অর্দ্ধেক, আমার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দেয়। বুঝাইয়া দিলে তবে এ পাপ-মুক্ত আত্মার শ্রীশ্রীজানকী-রঘুনাথজীউর শ্রীচরণ-লাভ ঘটিবে।"

পরদিন টাকায় নোটে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া রঘুবর সুরেশকে কহিল, নগদ টাকার এই অর্দ্ধেক আপনার। স্থাবর সম্পত্তির বিভাগও আমি ক'রে রেখেছি, দয়া ক'রে এরি মধ্যে এক দিন দখল নেবেন।

সুরেশ স্তব্ধ বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিল। এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী তাহাকে স্তম্ভিত, মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। অনেকক্ষণ তাহার কথা কহিবার শক্তি রহিল না। তাহার পর কহিল, কিন্তু এ-সব ত' আমার দরকার নেই !

রঘুবর কহিল, আপনার দরকারের জন্যে ত' নয়—এ-সব আপনাকে দেওয়া যে আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন !

বলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর নয়নতারা আসিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা। সুরেশ কহিল, মা, কাঁদছ যে ! নয়নতারা কহিলেন, বাবা, পাপীকে যে সাহায্য করেছিল, তার যখন এত কঠিন প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হোল, তখন সেই পাপীর নিজের প্রায়শ্চিত্তের শাস্তি-মূল্য কত ভীষণ হবে, সেই কথা ভেবে আমার মার প্রাণ কিছুতেই সুস্থির হ'তে পারচে না !

মিনতি

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আসিলে যদি আজ দুয়ারে মোর,
ফিরিয়া যেয়ো না কো যেয়ো না,
তরল-কলকল বেদন-ছলছল
করুণ আঁখি তুলি চেয়ো না।
বাসিলে ভালো যদি এ অভাজনে
হৃদয় দিয়ো তবে ভরিয়া,—
কোরো না অবহেলা আপন মনে
হৃদয়-মন মোর হরিয়া।
বাসিতে হয় যদি বাসিয়ো ভালো
আপন মরমেতে নীরবে,
সকল দুঃখ-তাপ হরণ করি'
আপন মহিমার গরবে।
তোমার তরে আছে আসন পাতা
আমার হৃদয়েতে গোপনে,
আসিয়ো তুমি সখা—নীরব রাতে
প্রেয়সী আসে যথা স্বপনে।
আমার অধরেতে নিবিড় ক'রে
আঁকিয়া যেয়ো তব চুম্বন,
আমার দেহটিরে আকুল করি'
রাখিয়া যেয়ো তব কম্পন।
মুছো না আঁখিজল, কোরো না দ্বিধা
বক্ষে নিয়ো মোরে টানিয়া,
আমার প্রতি প্রাণ তোমারে চায়—
এ কথা রাখো আজ জানিয়া !
তোমারি তরে উঠে তারকা-শশী,
তোমারি তরে গায় পাপিয়া ;
তুমি যে আছ তাই, পাতার গায় গায়—
রবির আলো উঠে কাঁপিয়া।
তুমিই আছ তাই জগৎ ভরি'
গানের সুর জাগে পুলকে,
তোমারি লাগি মেলে কমল আঁখি
চাঁদের আলো জলে ঝলকে।
তুমি যে আছ, তাই আমিও আছি
আমার গান তাই হের না,—
আসিলে যদি আজ, এসো গো কাছে—
নীরবে অবহেলি যেয়ো না।

হরপার্ব্বতী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

প্রত্নতত্ত্ব

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

আমি এ গল্প আমার বন্ধু স্নকুমার বাবুর মুখে শুনেছি।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যাঁরাই কিছু আলোচনা করেচেন, তাঁদের সকলেরই কাছে ডাঃ স্নকুমার সেনের নাম স্নপরিচিত। ডাঃ সেন অনেক দিন গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেচেন। পাটনা excavationএর সময় তিনি স্পুনার সাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন। মধ্যে দিনকতক তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের Curatorও ছিলেন। বৌদ্ধ Iconographyতেও তিনি স্নপণ্ডিত। "প্রাগ্‌গুপ্ত যুগের মূর্ত্তি-শিল্প" ও "ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের ক্রমবিকাশ" নামক তাঁর প্রসিদ্ধ বই তুখানা ছাড়া, এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে এবং বহু দেশী-বিদেশী সাময়িক পত্রিকায় এ বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর পড়্‌বার ঘরটায় নানা স্থানের ভাঙা পুরোনো ইট, ভাঙা কাঠের তক্তি-বসানো তুলট কাগজ ও তালপাতার পুঁথির স্তূপ এবং কালো পাথরের তৈরী দেবদেবীর মূর্ত্তির ভিড়ে পা দেওয়ার স্থান ছিল না। এই সব মূর্ত্তির শ্রেণীবিভাগ কর্ত্তে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম কর্ত্তেন। কোনো নতুন-আনা মূর্ত্তি পেলে তিনি বেশ ভাল করে দেখ্‌তেন, পুঁথি মেলাতেন; তার পর টিকিট আঁট্‌তেন "বৌদ্ধমূর্ত্তি—তারা"। দিনকতক

বর্ণনা তাঁর মনঃপূত হোত না; তিনি আপন

"উহুঁ—ওটা ললিতক্ষেপ pose হোল

হবে?" তার পর আবার

ওপিঠ ভাল করে দেখ্‌তে

সেটার দিকে চেয়ে বল

—হুঁ—মানে—বেশ

আবার পুরোনো টি

"বৌদ্ধমূর্ত্তি—জম্ভ

হাসি পেত। অ

বলত, "হ্যাঃ,

নইলে কোথাকার পাটলিপুত্র কোথায় চলে গেল, ওঁরা আজ খোঁড়া ইট্‌পাথর সাজিয়ে হুবহু বলে দিলেন—এটা অশোকের নাটমন্দিরের গোড়া, ওটা অশোকের আস্তাবলের কোণ—দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক প্রকাণ্ড রাজবাড়ী মাটির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠ্‌লো—চাক্‌রী তো বজায় রাখা চাই? কিছু নয়রে বাপু ওসব চাক্‌রীবাজী!"

তবে এসব কথার মূল্য বড়ই কম; কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার ও এসব বিজ্ঞ লোকের চিরদিন ভাস্থর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

সেদিন তুপুরবেলা ডাঃ সেন যখন তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে সেন-রাজাদের শাসনকাল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, আমি তখন একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের মত সেখানে গিয়ে হঠাৎ হাজির হলুম। আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খানিকক্ষণ খোস-গল্প করে সারাদিনের মানসিক পরিশ্রম দূর কর্ত্তে, বুঝলুম, তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েচেন। একথা সেকথার পর ডাঃ সেন বল্লেন, "চা আনাই, একটা গল্প শুনুন্‌। এটা আমি কখনো কারু কাছে বলিনি; তবে স্পুনার সাহেব

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ শাখা থেকে ওটা কয়েকবার খোঁড়্‌বার প্রস্তাব হয়—কিন্তু টাকার জোগাড় কর্ত্তে না পেরে তাঁরা পিছিয়ে যান। আমার কাছে যখন কথা উঠ্‌লো, তখন আমারও মত ছিল না। কারণ, আমার মনে মনে ধারণা ছিল, খরচ যা পড়্‌বে, তার তুলনায় আমাদের এমন বিশেষ কিছু পাবার আশা নেই। অবশেষে কিন্তু আমার আপত্তি টিঁক্‌লো না। ওটা খোঁড়্‌বার জন্য টাকা বরাদ্দ হোল। আমি বিশেষ অনুরোধে পড়ে তত্ত্বাবধানের ভার নিলাম।"

"গিয়ে দেখ্‌লাম, যে ঢিবিটা কাটাতে হবে, তার কাছে আর একটা ঠিক তেমনি ঢিবি আছে। এই ঢিবির কাছে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তা প্রায় মজে এসেচে। ঢিবিদুটো খুব বড় বড়,—ময়নাকাঁটার বন আর বড় বড় আগাছায় পশ্চিমদিকের ঢিবিটার উপরের অংশ একেবারে দুর্গম। পূব দিকের ঢিবিটা একটু ছোট, তার পিছনের ঢালু দিকটায় খানিকটা ফাঁকা ঘাসের জমি আছে। স্থানটা কতকটা নির্জ্জন।"

"সাধারণতঃ খননকার্য্য আরম্ভ করবার সময় আমরা প্রথমটা plan তৈরী করে নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। তার পর কাজ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আন্দাজে, কতকটা খুব ক্ষীণ সূত্র ধরে আমরা সেই plan ক্রমে ক্রমে বদ্‌লে চলি; অর্থাৎ তখন যা জিনিস বেরুতে থাকে, তার ... excavationএর সময় এতে খুব কাজ ...লতে

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ভিটা। যাক্ সে কথা। আমি কিন্তু জান্‌তে পেরেছি, ওখানে কে বাস কর্ত্তেন। আমি যা জান্‌তে পেরেছি, পূর্ব্বে কেউ কেউ তা আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু জোর করে কিছু বল্‌তে পারেন নি। আমি জোর করে বল্‌তে পারি, কিন্তু বলিনি। কেন বলিনি, আর কেমন করে আমি তা জান্‌লাম, সেইটেই শুনুন।"

"কিছুদিন ধরে ঢিবির ওপরকার বন কাটানো হোল। তার পর প্রকৃতপক্ষে খনন কার্য্য সুরু হোল। আমার সঙ্গে আমার বন্ধু ঢাকা মিউজিয়মের ক—বাবু ছিলেন। তিনি শুধু প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার চেয়ে বেশী—প্রত্নতত্ত্বগ্রস্ত। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে ও উৎসাহে আমরা এ কাজে হাত দিই। দিনের পর দিন ঢিবি দুটোর সামনে একটা প্রকাণ্ড ঘোড়ানিম গাছের ছায়ায় ক্যাম্প চেয়ার পেতে আমরা তীর্থের কাকের মত বসে থাকতাম, আমার বন্ধুর চোখ-মুখের ভাব ও উৎসাহ দেখে আমার মনে হোত, তিনি আশা করেন, খুঁড়তে খুঁড়তে একটা পুরোনো আমলের রাজবাড়ী টাড়ী, বা একটা তালপাতায় লেখা আস্ত বাংলা ইতিহাসের পুঁথি, অভাবপক্ষে সেই অজ্ঞাত নাস্তিক পণ্ডিতের fossil শরীরটাই বা মাটীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে!"

"খুঁড়তে খুঁড়তে প্রথমে বেরুল একটা মাটীর ঘট। ওরকম গড়নের ঘট এখন আর বাংলার কোনো জায়গায় তৈরী হয় কি না জানি না। ঘটের গলার নীচে থেকে তলা পর্য্যন্ত curveটী যে দিয়েছিল, সে গ্রাম্য কুমোরটীকে ...শ্রদ্ধা করি। ঘটটার মধ্যে প্রায় আধ-ঘট কড়ি। ...কেনা-বেচার জন্যে কড়ি ব্যবহার হোত তা ... অতীত দিনে গৃহস্বামী ভবিষ্যৎ ...যত্নে ঘট ভরে মাটীর মধ্যে পুঁতে ... কত দিন হোল সুদূর ... অর্থের আর প্রয়োজন ...ক জিনিস বেরুতে ...ভাঙা ঘট, কলসী, ...র, একটা প্রদীপ, ...য় বেরুল একটা ...কে নিয়ে আমার

"দেবীমূর্ত্তিটী পাওয়া যায় টোলবাড়ীর ভিটায়। মূর্ত্তিটী রাজমহলের কালো পাথরের তৈরী, চক্‌চকে পালিশ করা। বহু দিন মাটীর তলায় থেকে সে পালিশ যদিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মোটের উপর তখনও যা ছিল, তা খুব কম মূর্ত্তিতেই আমি দেখেছি। মূর্ত্তিটা সরস্বতী দেবীর হোলেও, তাতে বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের কিছু প্রভাব আছে বলে মনে হয়েছিল। হাতে বীণা না থাকলে ও দেবী না হোয়ে দেবমূর্ত্তি হোলে, তাকে মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারতো। সে কথা যাক্—কিন্তু মূর্ত্তিটা যখন পরিষ্কার করে আমার সামনে আনা হোল, তখন তার দিকে চেয়েই আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়্‌লাম! অনেক মূর্ত্তি গত ১৫ বৎসর ধরে পরীক্ষা করে আস্‌চি,—কিন্তু এ কি! বাটালির মুখে পাথর থেকে হাসি ফুটিয়ে তুলেচে কি করে! খানিকটা একদৃষ্টে মূর্ত্তিটার দিকে চেয়ে রৈলাম। আমি খুব কল্পনাপ্রবণ নই, কিন্তু সেদিন সেই নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় পত্রবিরল ঘোড়ানিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অল্পক্ষণ...অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্য মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাব...সৌন্দর্য্যে ঝলমল, চক্‌চকে কাল পাথরের পালিশ করা নিটোল সে দেবীমূর্ত্তির, তার মুখের দৃঢ়রেখাগুলির, দেহের গঠনের শিল্প ভঙ্গীর, হাতের আঙ্গুলগুলি বিন্যাসের সুন্দর ধরণের—সকলের ওপর মূর্ত্তির মুখের সে হাসি-মাখা জীবন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রৈলাম। শিল্পের যে প্রভাব কালকে তুচ্ছ করে যুগে যুগে মানুষের প্রাণ স্পর্শ কর্চ্ছে, তার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় সেই আমার প্রথম হোল...জয় হোক্ সে অতীত যুগের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর,... জয় হোক্ তার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার!..."

"মূর্ত্তিটাকে বাড়ী নিয়ে এসে, আমার লাইব্রেরীতে কাগজ-চাপা ধ্যানীবুদ্ধের দলের মধ্যে তাকে রেখে দিলাম। রোজ সকালে উঠে দেখ্‌তাম—দীর্ঘ ভ্রূ-রেখার নীচে বাঁশ-পাতার মত টানা চোখ দুটোর কোণ হাসিতে যেন দিনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌চে। কয়েকদিন ধরে নানা কথা মনে হতে লাগ্‌লো। খুঁড়তে খুঁড়তে এমন কোন জিনিস পাই নি, যাতে মূর্ত্তিটার বা ভিটার সময় নিরূপণ কর্ত্তে পারি। তবে মূর্ত্তিটী গুপ্তযুগের পরবর্ত্তী সময়ের এবং পূর্ব্ববঙ্গের শিল্পীর হাতের তৈরী, এটা আমি তার মাথার উপর ছাতার মত চিহ্ন দেখে কতকটা আন্দাজ করতুম। পাথরের মূর্ত্তির মাথার ওপর এই গোল ছাতার মত চিহ্ন, পূর্ব্ববঙ্গের ভাস্কর্য্যের একটা রীতি—এ আমি অন্য অন্য মূর্ত্তিতেও দেখেছি।"

"সেদিন রবিবার সন্ধ্যাবেলাটা আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে এক বাজী দাবা খেলে সকাল সকাল শুতে গেলাম।"

"এইবার যে কথা বোল্‌বো, সে কেবল তুমি বলেই তোমার কাছে বলচি,—অপরের কাছে এ কথা বল্‌তে আমার বাধে; কারণ, তাঁরা আমায় বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাতে কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কিসের অত্যন্ত সুগন্ধ পেলাম। পূজার মন্দিরে যেমন ধূপ ধুনো গুগ্‌গুল ফুল ঘি চন্দন সবশুদ্ধ মিলে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ পাওয়া যায়, এটা ঠিক সে ভাবের। সুগন্ধটা আমার নিদ্রালস মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে আমায় কেমন একটা নেশায় অভিভূত করে ফেল্লে। রাত কটা হবে ঠিক জানি না...মাথার কাছে ঘড়িটা টিক্ টিক্ কর্চ্ছিল...হঠাৎ দেখ্‌লাম, খাট থেকে কিছুদূরে ঘরের মেজেয় কে একজন দাঁড়িয়ে...তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, পরণে বৌদ্ধ পুরোহিতের মত হল্‌দে পরিচ্ছদ, মুখের হাতের অনাবৃত অংশের রং যেন শাদা আগুনের মত জ্বল্‌চে...বিস্মিত হয়ে জোর করে চোখ চাইতেই সে মূর্ত্তি কোথায় মিলিয়ে গেল! বিছানায় তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লাম, ঘড়িতে দেখ্‌লাম রাত ২টা...ভাল করে চোখ মুছ্‌লাম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। ভাব্‌লাম, আরে গেল যা, রাত দুপুরের সময় এ যে দেখ্‌ছি, ছেলেবেলাকার সেই Abon Ben Adhem (May his tribe increase)! খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থাক্‌বার পর ঠিক করে নিলাম, ওটা ঘুমের ঘোরে কি রকম চোখের ধাঁধা দেখে থাক্‌বো। তার পর আবার শুয়ে পড়্‌লাম। একটু পরে বেশ ঘুম এল। কতক্ষণ পরে জানি না, আবার কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল...ঘুম ভাঙ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সুগন্ধটা পেলাম...আবার সেই নেশা...এবার নেশাটা যেন আমায় পূর্ব্বের চেয়েও বেশী অভিভূত করে ফেল্লে...তার পরই দেখি, সেই মুণ্ডিত-মস্তক পীতবসন জ্যোতির্ম্ময় বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার খাটের অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন!...

"তার পর আর কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘট্‌লো।"

"হঠাৎ আমার ঘরের দৃশ্যটা আমার চোখের সাম্‌নে থেকে মিলিয়ে গেল...দেখ্‌লাম, এক বিস্তীর্ণ স্থান, কত বাড়ী, শ্বেতপাথরে বাঁধানো কত চত্বর, কত গম্বুজ, দেউল... অনেক মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুর মত পরিচ্ছদ-পরা লোকেরা এদিক ওদিক যাতায়াত কর্চ্ছেন, অসংখ্য ছাত্র ঘরে ঘরে পাঠনিরত...একস্থানে অশোক-বৃক্ষের ছায়ায় শ্বেত-পাথরের বেদীতে একদল তরুণ যুবক পরিবৃত হয়ে বসে আমার পরিচিত সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু। দেখে মনে হোল, তিনি অধ্যাপনানিরত এবং যুবক মণ্ডলী তাঁর ছাত্র। অশোককুঞ্জের ঘনপল্লবের প্রান্তস্থিত রক্তপুষ্পগুচ্ছের ঝরা পাপ্‌ড়ি গুরু ও শিষ্যবর্গের মাথার উপর বর্ষিত হতে লাগ্‌লো।"

"দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল...আমার তন্দ্রালস কাণের মধ্যে নানা বাজনার একটা সম্মিলিত স্বর বেজে উঠ্‌লো...এক বিরাট উৎসব-সভা! উৎসব-বেশে সজ্জিত নরনারীতে সভা ভরে ফেলেছে...সব যেন অজন্তার গুহার চিত্রিত নরনারীরা জীবন্ত হয়ে উঠে বেড়াচ্ছে। কোন্ প্রাচীন যুগের হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ...সভার চারিধারে বর্শাহাতে দীর্ঘদেহ সৈনিকেরা দাঁড়িয়ে, তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াগুলো মূল্যবান সাজ পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুক্‌চে...সভার মাঝখানে রক্তাম্বর-পরনে চম্পক-গৌরী কে এক মেয়ে,...মেয়েটীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ইস্পাতের বর্ম্ম আঁটা এক যুবক,...তার কোমরে ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের খাপে বাঁকা তলোয়ার ঝুলচে...গলায় ফুলের মালা...মুখে বালকের মত সরল সুকুমার হাসির রেখা। মেয়েটীর নিটোল সুন্দর হাতটী ধরে যুবকের দৃঢ় পেশীবহুল হস্তে যিনি স্থাপন করলেন—ভাল করে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার রাত্রের বিশ্রামের ব্যাঘাতকারী সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু।"

"বায়স্কোপের ছবির মত বিবাহ-সভা মিলিয়ে গেল! হঠাৎ আমার হাত-পা যেন খুব ঠাণ্ডা হয়ে উঠ্‌লো। শীতে দাঁতে দাঁত লাগ্‌তে লাগ্‌লো...পায়ের আঙুল যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। চোখের সাম্‌নে এক বিস্তীর্ণ শাদা বরফের রাজ্য...উপর থেকে বরফ পড়্‌চে,...তুষার-বাষ্পে চারিধার অস্পষ্ট...সাম্‌নে পেছনে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের চূড়া...সাম্‌নে এক সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে উচ্চ হতে উচ্চতর পার্ব্বত্য প্রদেশে উঠে গিয়েছে। এক দীর্ঘদেহ ভিক্ষু সেই ভীষণ দুর্গম পথ বেয়ে ভীষণতর হিমবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে পথ চল্‌চেন,...তাঁর মাথা যেন ক্রমে নুয়ে বুকের উপর এসে পড়্‌চে...কিন্তু তবু তিনি না থেমে ক্রমাগত পথ চলেচেন...বহুদূরের এক উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতচূড়া কিসের আলোয় রক্তাভ হয়ে দৈত্যের হাতের মশালের মত সে বিশাল তুহিন-রাজ্যের দূর প্রান্ত আলোকিত করে ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বল্‌চে।"

"তুষার-বাষ্প ঘন হতে ঘনতর হয়ে সমস্ত দৃশ্যটা ঢেকে ফেল্লে। তার পরই চোখের সাম্‌নে—এ যে আমারই চিরপরিচিত বাংলা দেশের গাড়াগাঁ...খড়ের ঘরের পেছনে ছায়াগহন বাঁশবনে বিকাল নেমে আস্‌চে! বৈঁচি ঝোপে শালিখপাখীর দল কিচ্ কিচ্ কর্চ্ছে! কাঁটালতলায় কোন্ গৃহস্থের গরু বাঁধা! মাটীর ঘরের দাওয়ায় বসে এক তরুণ যুবক! তার সাম্‌নে আমার খুঁড়ে-বার-করা সেই দেবী-মূর্ত্তি!—দেখে মনে হোল, যুবকের অনেক দিনের স্বপ্ন ঐ পাথরের মূর্ত্তিতে সফল হয়েচে...বর্ষাসন্ধ্যার মেঘ-মেদুর আকাশের নীচে ঘনশ্যাম কেতকী-পল্লবের মত কালো ভাব-গভীর চোখদুটী মেলে সে পাথরের মূর্ত্তির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।"

"হঠাৎ সে দৃশ্যও মিলিয়ে গেল। দেখি, আমি আমার ঘরে খাটেই শুয়ে আছি, পাশে সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু! এবার তিনি কথা বল্লেন। তাঁর কথাগুলো আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বল্লেন—তুমি যে মূর্ত্তিটী মাটী খুঁড়ে বার করেছ, তারই টানে অনেক দিন পরে আজ আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম! ৯০০ বৎসর আগে আমি তোমার মতই পৃথিবীর মানুষ ছিলাম। যে স্থান তোমরা খুঁড়েছ, ওই আমার বাস্তুভিটা ছিল। তুমি জ্ঞানচর্চ্চায় সমস্ত জীবন যাপন করেছ,—এই জন্যই তোমার কাছে আসা আমার সম্ভব হয়েছে; এবং এই জন্যই আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমার জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা তোমাকে দেখালাম। আমি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান,—নরপালদেবের সময়ে আমি নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির ছিলাম। ভগবান তথাগতের অমৃতময়ী বাণীতে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল;

এজন্য দেশের হিন্দু সমাজে আমার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়, দেশের টোলের অধ্যাপনা ছেড়ে আমি নালন্দায় যাই। বুদ্ধের নির্ম্মল ধর্ম্ম যখন তিব্বতে অনাচারগ্রস্ত হয়ে উঠ্‌ছিল, তখন ভগবান শাক্যশ্রীর পরে আমি তিব্বত যাই—সে ধর্ম্ম পুনরুদ্ধারের জন্য। আমাদের সময়কার এক গৌরবময় দিনের কথা আমার আজও স্মরণ হয়। আজ অনেক দিন পরে পৃথিবীতে—বাংলায় ফিরে এসে সে কথা বেশী করে মনে পড়্‌চে। চেদীরাজ কর্ণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে দেশজয় কর্ত্তে কর্ত্তে গৌড়-মগধ-বঙ্গের রাজা নয়পাল-দেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে যেদিন সন্ধি কর্ল্লেন, আমি তখন নালন্দার অধ্যাপক। মনে আছে, উৎসাহে সেদিন সারারাত্রি আমার নিদ্রা হয় নি। এই সন্ধির কিছুদিন পরেই কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে নয়পালদেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের যে বিবাহ হয়, আমিই সে বিবাহের প্রধান পুরোহিত ছিলাম। অল্পবয়সে আমি একজন গ্রাম্য শিল্পীর কাছে পাথরের মূর্ত্তি গড়তে শিখি, এবং অবসর মত আমি তার চর্চ্চা রাখ্‌তাম। তার পর আমি যখন পিতামহের টোলে সারস্বত ব্যাকরণের ছাত্র, তখন সমস্ত শক্তি ও কল্পনা ব্যয় করে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক মূর্ত্তি গড়ি। মূর্ত্তিটী আমার বড় প্রিয় ছিল। ওই মূর্ত্তিটীর টানেই অনেক দিন পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। দেশের লোকে আমায় নাস্তিক বল্‌তো; কারণ, আমি একে বৌদ্ধ ছিলাম, তার পর সাধারণ ভাবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস আমার ছিল না। যে অরুণচ্ছটারক্ত হিমবান্ শৃঙ্গ জনহীন তুষার-রাজ্য আলোকিত করেছে—তোমায় দেখিয়েছি, তা সত্যের রূপ। সাধারণ লোকের পক্ষে সে সত্য দুরধিগম্য। আমার কথা ধরি না, কারণ, আমি নগণ্য। কিন্তু যে বিশাল সঙ্ঘারাম আমাদের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার সমস্ত অধ্যাপকই সে উচ্চ দার্শনিক সত্যকে চিরদিন লক্ষ্য করে চলেছিলেন। আমিও অনেক বিপদ মাথা পেতে নিয়ে, সাধ্যমত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম। যেখানে এখন আছি, সেখানে সে সব যুগপূজ্য জ্ঞানতপস্বী আমার নিত্যসঙ্গী!...তোমরাও অমৃতের পুত্র,—সে লোক তোমাদের জন্যও নির্দ্দিষ্ট আছে।"

"অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযান জয়যুক্ত হোক্।"

"বৌদ্ধ ভিক্ষু কোথায় মিলিয়ে গেলেন। কিসের শব্দে চমক্ ভেঙে গিয়ে দেখি, ভোর হয়েচে, বাইরের বারান্দায় চাকরের ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।"

ডাঃ ঘোষ গল্প শেষ কর্ল্লেন।

আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লুম, "মূর্ত্তিটা কোথায়?"

ডাঃ ঘোষ বল্লেন, "ঢাকা মিউজিয়মে আছে।"

কবি-বিতান

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

I lie and dream of your full Mermaid wine.

—*Beaumont.*

কল্পনে! কোথা সে কবি প্রফুল্ল আসরে,
লয়ে হাস্য-কল-রোল সঙ্গীত-ঝঙ্কার!
কোথা সে কবিতা-সুধা ঝরিছে নির্ঝরে,
পূত মন্দাকিনী ধারা মর্ত্ত্যে অলকার!
মৃগাক্ষি-গঞ্জিনী কোথা সে মৃদুহাসিনী,
চকিতে ভরিছে পাত্র চম্পক-বরণে!
মদিরা-বিভোরা কোথা প্রমদা যামিনী,
জাগায়ে রাখিত চিত ত্রিদিব স্বপনে!
আছে স্মৃতি, আছে গীতি, রূপসী ললনা,
শীধু-সুধাধরে চুমি, মজি অনিবার;
সৌন্দর্য্যে সৌরভে চির ধরিত্রী মগনা,
স্বরগে নিবাস শুধু সে কবি-আত্মার।
রচি' সে মন্দার-কুঞ্জ, তুলি' সে রাগিনী,
পিয়াও তুষিতে পুনঃ মদিরা মোহিনী।

বিবর্ত্তন

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(নক্সা)

১। সেকাল—

"সেকাল" কথাটার কোন বিশেষ অর্থ না থাকিলেও, ও-কথাটা বলিবার অবাধ অধিকার বাল, বৃদ্ধ সকলেরি সব যুগে আছে। ওর আদি অন্ত না থাকায় কাজের লোকেরা ওর মধ্যটাকে 'সালের' বেড়া দিয়া কাজ সারেন। আমাদের এই আলোচ্য 'সেকালের' খানিকটা গত শত-বর্ষের মধ্যেই পড়ে, বাকিটা তার ও-পারে।

তখন ছিল চতুষ্পাঠী বা টোল; সেখানে ব্রাহ্মণ-বালকেরা শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভান্তে 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' বনিতেন; "ধর্ম্ম (+ দশকর্ম্ম) আর মোক্ষ" ছিল সে শিক্ষার লক্ষ্য। অধ্যাপকেরা শিক্ষার্থীদের এই বিদ্যা দান করিতেন—মায় অন্ন। আর সর্ব্বসাধারণের জন্য ছিল পাঠশালা; সেখানে নাম মাত্র দাম দিয়া, প্রচুর পরিমাণে বেত্রদণ্ড প্রাপ্তি সহ বালকেরা "কাম আর অর্থ" আদায়ের উপায় লাভে সমর্থ হইত। অর্থাৎ পাঠশালা আর চতুষ্পাঠী এতদুভয়ের চেষ্টায়, দেশের চতুর্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) বজায় থাকিত।

চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। শাস্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইতেও পারে, কিন্তু পাঠশালের পড়ুয়াদের সে ফাঁক আদৌ ছিল না;—সেখানে শাসনকর্ত্তা স্বয়ং গুরুমহাশয়—বেত্রাসুর মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। কাজেই বালকদের বা বিদ্যার্থীদের লেখাপড়ার বয়সে কোনরূপ বিলাস-বাসনা বা সখের সম্পর্ক মাত্র রাখিবার বিধি কোথাও ছিল না। নিবৃত্তিমার্গই ছিল তাহাদের রাজপথ।

* * * * *

এবম্বিধ কালে একদা বারোয়ারি-তলায়, নবপ্রসিদ্ধি-প্রাপ্ত গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হইয়া গেল। শিরোমণিমহাশয়ের পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র পঞ্চানন বাপের কাছে পাণিনি পড়িত। তাহাকে কঠোর নিবৃত্তি-চর্চ্চার সাধক করিয়া রাখিলেও, সে-দিন সে কোনমতে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অতি গোপনে উক্ত যাত্রা শুনিয়া আসিয়াছে। তাহাতে তাহার চখের ঠুলি একটু সরিয়া পড়িয়া সহসা তাহাকে একটা নূতন দিক দেখাইয়া দিয়াছে; তাহার অবরুদ্ধ প্রকৃতি একটু ছাড়া পাইয়াছে। সেইটুকু আনন্দই সে সামলাইতে পারিতেছিল না।

সে প্রত্যুষে উঠিয়া যথারীতি পাণিনি খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছিল, কিন্তু প্রাণ তাহার অন্যত্র থাকায় পাণিনির সূত্রগুলি ছিঁড়িয়া কেবল তাল পাকাইতেছিল। ক্রমে এদিক-ওদিক দেখিয়া পঞ্চানন সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল——

"বিদ্যের লাগি হব' সন্ন্যাসী—ও হীরে মাসি,—
× × × × ×
× × না হয় হব কাশীবাসী।"

গীতটি তাহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

বেচারা জানিতে পারে নাই যে, ইতিমধ্যে শিরোমণি-মহাশয় তাহার শিয়রে উপস্থিত হইয়াছেন।

পুত্রের এই অভাবনীয়, তথা অশাস্ত্রীয় আচরণে সর্ব্বনাশের সূচনা দেখিয়া, তিনি রাগে হতাশায়—"তবে রে পাজি" বলিয়া সজোরে এক শাস্ত্রীয় চপেটাঘাতে পঞ্চাননকে পাড়িয়া ফেলিলেন। এই বজ্রপাতটা হঠাৎ হওয়ায়, আহত পঞ্চানন mustard-flower (সরষে ফুল) দেখিতে লাগিল। সে শব্দ ছিটেবেড়ার ছিদ্রপথে অন্দরে প্রবেশ করায় ব্রাহ্মণী ছুটিয়া আসিয়া দেখেন পপাত-পঞ্চাননের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির আয়োজন আসন্ন। শিরোমণি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে খড়ম খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়ায় হাতটা কেবলি ভূলুণ্ঠিত কাছায় ঠেকিয়া বাধা পাইতেছে।

এই সময় সহসা ঘূর্ণীর মত ব্রাহ্মণীর আবির্ভাবে শিরোমণিমহাশয় একটু থতমত খাইয়া গেলেন; ব্রাহ্মণ-

পণ্ডিতের এটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু উষ্মা প্রবল থাকায় অসামাল হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"তোমার গর্ভটি যে গন্ধর্ব্বপুরী তা জানতুম না;—পেঁচো আজ পঞ্চমসুরে পাণিনি আলাপ করছিল, সেটা শ্রবণ করা হয়েছে কি? বেটা বলে—'বিদ্যের লাগি হব সন্ন্যাসী,—না হয় হব কাশীবাসী!' বলিতে বলিতে রাগ ব্রহ্মরন্ধ্রে ঠেলিয়া উঠায়,—"তবে র‍্যা বেল্লিক্" বলিয়া খড়ম খুলিতে খুলিতে বলিয়া ফেলিলেন—"অনড্বানের আজ রক্ত মোক্ষণ কোরব'!"

ব্রাহ্মণী ক্ষিপ্রহস্তে খড়ম কাড়িয়া লইয়া মুহূর্ত্তে অক্ষিগোলকদ্বয়কে ভ্রূদ্বয়ের স্থানে এবং ভ্রূদ্বয়কে কপালের পরপারে পাঠাইয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মুমূর্ষপ্রায় মৃদু আওয়াজে বলিলেন—"অ্যাঁঃ—ব্রাহ্মণ হয়ে কি সর্ব্বনাশ করলে বল' দিকি!"

শিরোমণি ভয়ে একদম কাট মারিয়া বলিলেন—"কেন, কি করলুম গিন্নি!"

ব্রাহ্মণী এইবার তারছেঁড়া তানপুরোর সুরে বলিলেন, "কি কোরলে? সর্ব্বনাশ করলে আর কি করলে! এ'তো বিদেয়ের সভা নয়, পণ্ডিতি ক'রে "মোক্ষণ" কথাটা না বললে কি শিরোমণিত্ব যেত'! ঐ শব্দটা যদি বাইরের কারুর কাণে গিয়ে থাকে, সে ঠিক শুনে থাকবে "ভক্ষণ"। ও-কথাটা ত সচরাচর ব্যবহার হয় না—সাধারণেও বোঝে না। তার ওপর "অনড্বান"ত ছিলই! তা হ'লে দাঁড়ায় কি?"

শিরোমণি কাণে আঙ্গুল দিয়ে তিনবার শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু বলিতে বলিতে এতটুকু হইয়া গেলেন; তাড়াতাড়ি মুক্তকচ্ছ অবস্থাতেই, কেহ শুনিল কি না দেখিতে বাহিরে ছুটিলেন! যদু গোয়ালাকে গরু চরাইতে যাইতে দেখিয়া—"যদু—যদু—শোন্, আমি ব্রাহ্মণ—নির্ব্বংশ হবি যদি—"

ব্রাহ্মণী ধমক্ দিয়া বলিলেন—"এদিকে এস', ওকে ডাকা হচ্ছে কেন—"

শিরোমণি।—শুনেছে কি না সেটা পরীক্ষা—

ব্রাহ্মণী।—আর ঘাঁটিয়ে ঢাক বাজাতে হবে না;—সে আমি সামলে নেব অখন—

শিরোমণি মিনিট খানেক স্বস্তির দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণীর দিকে তাকাইয়া অর্দ্ধসিক্ত নয়নে কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলিলেন—"নারায়ণ না করুন—তোমার অভাবে আমাকে শাঁসশূন্য সামুকের খোলার মত শেষ পর্য্যন্ত হাঁ ক'রে চিৎ হয়ে পড়ে' থাকতে হবে—"

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণীর চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি বাধা দিয়া চখের কোণে অস্ফুটন্ত হাসি চাপিয়া বলিলেন—"বেশ ত'—আব্রহ্ম নস্য ঠেসে নিরেট হ'য়ে থাকতে পারবে—"

শিরোমণিমহাশয় সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না—না সে হতেই পারে না, আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি দীর্ঘজীবী হও, আমি যেন তোমাকে রেখে যেতে পারি—"

ব্রাহ্মণী ঈষৎ রোষভরে বলিলেন—"এ কি শিরোমণির মত কথা হচ্ছে, লোকে শুনলে বল্‌বে কি?"

পঞ্চাননের কথা শিরোমণির আর স্মরণ ছিল না, তিনি বলিলেন—"চুলোয় যাক্ লোকের কথা, তুমি না থাকলে আর শিরোমণি রইল কই,—দীপশূন্য দেরকো! যদি যাওই (ওরে বাপরে—তা হবে না) তো আমাকে নিয়ে যেও,—আমার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটবে! আমি অনাথ হ'য়ে—"

ব্রাহ্মণী ধমক্ দিয়া বলিলেন—"তুমি চুপ কর ত'। কিন্তু বলে দিচ্চি—খবরদার আর মিথ্যে মিথ্যে ছেলেকে মারধোর কোর না।"

এতক্ষণে ছেলের উপস্থিতি সম্বন্ধে হুঁস্ হওয়ায়, শিরোমণি একটু সুর সামলাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা তাই হবে, তা ও-গুওটা বিদ্যের লাগি—"

ব্রাহ্মণী—হ্যাঁ তাতে হয়েছে কি। বিদ্যের লাগি লোক কি না করছে, সন্ন্যাসী হবে তা আর বড় কথা কি! ব্রাহ্মণের ছেলে কি মুখ্খু হয়ে ঘরে বসে' থাকবে! নিজে শিরোমণি হয়েছ, ওর আর কিছু হয়ে কাজ নেই তো!

শিরোমণি। (একটু ভাবিয়া) ওঃ—তাই না কি?

ব্রাহ্মণী। তা না ত' কি। সব কথার অত কদর্থ কর' কেন?

শিরোমণি। তবে,—গুওটার হীরে মাসী জোটে কোথা থেকে?

ব্রাহ্মণী। (সহাস্যে) আঃ আমার পোড়াকপাল! তোমার বড় শালীর নামটাও শোননি! সে যে পাঁচুকে মানুষ করেছে, তাই ওর মত' কথা মত' আবদার তার কাছে; স্বপ্নেও তার সঙ্গে কথা কয়।

শিরোমণি। সুরে না কি? সুর জোটে কোথা থেকে?

ব্রাহ্মণী। তুমিই জুটিয়েছ, আর তোমার পাণিনি জোটাচ্ছেন।

শিরোমণি আশ্চর্য্য ও বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে বলিলেন—"কি রকম? আমাদের বংশে ও অপবাদ কোন' পুরুষে নেই।"

ব্রাহ্মণী। তুমি পাঁচুকে বেদ পড়তে কাশী পাঠাবে বলনি? সুরে সামবেদ পাঠ করতে হয় শুনে পর্য্যন্ত বাছা আমার ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেল! কি করে বল',—ছেলে কোকিল ডাকলে কাণ খাড়া ক'রে থাকে।

শিরোমণি। অ্যামন্ দাঁড়িয়েছে! উঃ বেদের মধ্যে যে এত খেদের বীজ গাঢাকা আছে, তা জানতুম না। কিন্তু ঐ যে বললে পাণিনি সুরে সাহায্য করেন, এবম্প্রকার অনুযোগ এই তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম—

ব্রাহ্মণী। কেন? একটু লক্ষ্য করলে এমন কথা বলতে না;—ওর নামটাই ত' সুর-সপ্তকের উচ্চাংশ নিয়ে গড়া,—পা—ণি—নি। নিত্য ওই নাম তোলাপাড়া করলেই ত' সুর আপনি জোটে। নয় কি?

শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী ছিলেন বাচস্পতি মহাশয়ের বিশেষ বুদ্ধিমতী কন্যা। তাঁহার চতুষ্পাঠীর চৌহদ্দির মধ্যে থাকিয়া ও বাড়িয়া বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ও বহু আলোচনা শুনিয়াছিলেন, এবং তাহা আবশ্যকমত' ব্যবহারেও আনিতে পারিতেন। আজ তাহারই সাহায্যে পঞ্চাননের প্রাণ রক্ষা হইল।

শিরোমণি কিছুক্ষণ অবাক থাকিয়া, পরিশেষে বলিলেন—"বেশ,—ও গুওটাকে আর বেদ পড়তে কাশী যেতে হবে না,—মাসীকেও ডাকতে হবে না, সুরের তরে কোকিলের ডাকে কাণ খাড়া রাখতে হবে না; ও "অ-সুর" হয়েই বাড়ী থাক; বিবাহ হলে শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারে। আমি দিব্য দিয়ে যাব—এ বংশে যেন কেউ 'বিদ্যের' লাগি বেদ না পড়ে এবং তার তাড়সে কাশীবাসী না হয়।

বিদ্যার্থী পুত্র সঙ্গীতালাপ করিতেছে, এই বীভৎস দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া ও স্বকর্ণে শুনিয়া, শিরোমণিমহাশয় লজ্জায় ক্ষোভে বড়ই মর্ম্মপীড়া বোধ করিয়াছিলেন, এবং সেই তাপ ও পাপ ক্ষালনার্থ তিনি আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

জাহ্নবীদেবী বেশ অনুভব করিলেন—স্বামী কতটা আঘাত পাইয়াছেন।

পঞ্চানন চপেটাঘাত খাইয়া কচ্ছপের মত হাত মুখ গুটাইয়া চাকা মারিয়া পড়িয়াছিল। জাহ্নবীদেবী বলিলেন—"খবরদার বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে—পাঠ্যাবস্থায় আর কখনো গান গেয়োনা। ও সব চর্চ্চার ঢের সময় আছে,—আমরা গত হ'লে কোরো।"

(২) মধ্যকাল—

মধ্যকালটাকে সালের বেড়া দিয়া বাঁধা সহজ নহে—তাহা এতই conical বা কোণবিশিষ্ট। তখন শিক্ষার অভিনব শাখা সকল, সহরে সদরে দ্রুত গজাইয়া উঠিতেছিল। তখন সহর সদরের ভদ্রসম্প্রদায় পরিবর্ত্তন প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছেন; বাঙ্গলার প্রাণে নূতন ভাব, কাণে নূতন কথা, হু হু করিয়া আসিয়া পৌঁছিতেছে। সহরে সহরে ইস্কুল, স্থানে স্থানে বঙ্গ-বিদ্যালয়, বসিতে আরম্ভ করিয়াছে; গ্রামের মধ্যে মিশনরি মেম সাহেবের গতিবিধি দেখা দিতেছে। পণ্ডিতদের মুখে "গেল গেল" রব উঠিয়াছে।

পঠন পাঠনের ধারা বদলাইলেও, সেকালের জের হিসাবে, শাসন সম্বন্ধে পূর্ব্বসংস্কার তখনো ছাড়পত্র পায় নাই, হরিতকীর খোসার মত শাঁসে আবদ্ধই আছে। গীতবাদ্যাদি চর্চ্চা যে পাঠশালার প্রবল পরিপন্থী, সে সংস্কার শিক্ষকদের ছাড়ে নাই;—শাসন পর্ব্ব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। বেত্র সর্ব্বত্র সহজপ্রাপ্য না থাকায়—ইস্কুল কম্পাউণ্ডে মেথি গাছের বেড়ার চাষ রীতিমত চলিত, এবং তাহাই ছিল শিক্ষক মহাশয়দের অস্ত্রাগার। সেই ব্যূহ ভেদ করিয়াই বাঙ্গলার বিখ্যাত ও স্মরণীয় রথীরা বাহির হইয়াছিলেন।

*   *   *

এ হেন "কালে" কস্মিংশ্চিদ উচ্চ ইংরাজি ইস্কুলের থার্ডমাষ্টার বেণীবাবু একদা অকস্মাৎ রজনীর "Moral class book পুস্তকের (নীতিবোধ) এক নিভৃত স্থানে, পেন্সিলে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা—

"পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব,—
তা বিনু সকলি পর।"

আবিষ্কার করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ফলে রজনীর মাথায় গাধার টুপি উঠিল, এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে ছোট বড় সব ক্লাসে ঘুরাইয়া শেষে হেডমাষ্টারের কাছে হাজির করা হইল। এই গুরুতর অপরাধটি টীকাসহ বর্ণনান্তে বেণী মাষ্টার দৃঢ়তার সহিত রায় প্রকাশ করিলেন—"এ ছেলের আর কিছু হবে না; অপর ছেলেদের মাথা খাবার যন্ত্রস্বরূপে ওকে আর ইস্কুলে রাখা সমীচীন নয়।" ইত্যাদি

জেরার জোরে ও সাক্ষ্যের মুখে প্রকাশ পাইল—বেণী মাষ্টারের পুত্র কিশোরী ও রজনী গঙ্গার আঘাটায় বটতলায় বসিয়া সুরলয়ে উক্ত পদটি আলাপ করে। কিশোরীর কাছেই রজনী শিখিয়াছে।

শুনিয়া মাষ্টারেরা নির্ব্বাক। বেণী মাষ্টার মৃদু হাসির পরদায় ক্রোধ ঢাকিবার বিফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"কি সব ধড়িবাজ ছেলে, আমার ছেলেকে জড়িয়ে কেসটা হালকা করতে চায়। আমি তাকে সর্ব্বক্ষণ চখে চখে রাখি,—আমার ছেলেকে আমি চিনি না! কত পরের গাধা পিটে মানুষ বানিয়ে ছেড়ে দিলুম, আর নিজের ছেলের ওপর আমার নজর নেই! ও অন্য চর্চ্চার ফাঁক্ পেলে ত;—সন্ধ্যাহ্নিকের বদলে সকাল সন্ধ্যে মহাভারত মুখস্থ করতে দিয়েছি, সুভদ্রাহরণ পর্য্যন্ত সেরেছে—"

দয়াল পণ্ডিতমশাই গোঁফবর্জ্জিত বদনে বিস্ময়ের রং চড়িয়ে বলিয়া ফেলিলেন "অ্যাঁ—বলেন কি, এত দূর এগিয়েছে? বা রে কিশোরী! সে গেল কোথায়?" বলিয়াই কাসির মধ্যে হাসি সামলাইতে সামলাইতে বারাণ্ডায় আসিয়া দেখেন—কিশোরী তখন বেড়ার বাইরে।

হেডমাষ্টার রজনীর বইখানি লইয়া রবার দিয়া পিরীতি ঘসিয়া, তাহার একপুরু ছাল তুলিয়া দিলেন। Moral class bookএর কলঙ্ক মোচনান্তে রজনীকে বলিলেন—"এটা ছিল তোমার পিরীতির খসড়া, তাই ক্ষমা পেলে। ও সব চর্চ্চা তোমার এ বয়সের নয়—পঠদ্দশার নয়। আর যেন না শুনতে পাই।" সে যাত্রা রজনী রক্ষা পাইল।

এই মোলায়েম বিচারে বেণী মাষ্টার খুসী হইলেন না, তিনি বলিলেন—"এরূপ caseএ আজ আপনি বেতের ব্যবস্থা না করায়, সন্দেহ হয় আমাদের বেতনও আর বেশী দিন পেতে হবে না; এ ইস্কুল উঠে যাবে।"

*   *   *

টিফিন্‌রুমে (Tiffin roomএ) মাষ্টার ও পণ্ডিতদের এই আলোচনাই আজ চলিতে লাগিল। দয়াল পণ্ডিতমশাই ডাবা হুঁকায় টান দিয়া, বিশেষ উদ্বেগব্যঞ্জক বদনে বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া আপনাআপনি আবৃত্তি করিলেন

"এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে!"

নবীন মাষ্টার বলিলেন—"যৌবন ত' নয়, এরা তরলমতি তরুণ; স্বভাবতই খেলা, গীত, বাদ্য, এদের প্রিয়। আপনার যত্ব নত্ব নিংড়ে যে সুমধুর রস পায়, আর গ্রামারের সঙ্গে "মার্" যোগে যে আরাম ভোগ করে, সেটা বহু আয়াসে এদের হজম করাতে হয়। এ সময় খেলা বা গীত বাদ্যাদির ঝোঁক্ ধরলে, সেইটাই ২৪ ঘণ্টা মাথায় থাকবে, কারণ তাতে স্বাভাবিক আনন্দ বর্ত্তমান; তাতে ওদের লওয়াতে কাকেও কষ্ট পেতে হয় না। বাপ মা মাইনে দিয়ে খালাস, ছেলে মানুষ করবার ভার মাষ্টারের, এই তাঁদের ধারণা, আর মাসিক ছ'গণ্ডা পয়সা দিয়ে এই তাঁদের আবদার আর দাবী! সুতরাং ইস্কুলে ও সব সহজ-প্রিয় জিনিসের প্রশ্রয় দিলে, ছেলেদের যে জন্যে বিদ্যালয়ে আসা, সেটা ভেতর ভেতর বারো আনা বাদ পড়ে যাবেই। এই ত' আমার মনে হয়, তা পণ্ডিতমশাই যতই সমর্থন করুন। সকল রসোপলব্ধিরই বয়স আছে—ছেলেদের লেখাপড়াটা কিন্তু জোর করেই শেখাতে হয়, তারা প্রায়ই কেউ ইচ্ছে ক'রে ঝোঁকে না। তাই আমার ধারণা—গীতবাদ্যাদি বা স্বাস্থ্যের নামে লম্বা খেলা—লেখা পড়ার অন্তরায়।"

নবীনবাবুর কথা সকলেই সমর্থন করিলেন। দয়াল পণ্ডিতমশাই দেয়ালের গায়ে পেরেকে হুঁকাটি

সংলগ্ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন—"হরে মুরারে"।

* * *

ইস্কুলে আজ মাসিক মিটিংয়ের দিন ছিল। ইস্কুলের ছুটির পর তাহা আরম্ভ হয়, মাষ্টারদের বাড়ী ফিরিতে রাত আটটা বাজে। কিন্তু আজ ছেলেদের এই রস-সঞ্চারের ফলাফল আলোচনার পর মাষ্টারদের মিটিং করিবার মত মানসিক অবস্থা না থাকায় তাহা স্থগিত হইয়া গেল; বেণী মাষ্টারের উপর বিদ্যার্থী বালকদের রসস্থ হইবার কুফল সম্বন্ধে একটি essay (প্রবন্ধ) লিখিবার ভার পড়িল। এই শনিবার Hallএ (হল ঘরে) ছাত্রদের সমক্ষে তাহা পাঠ করা হইবে। বেণী মাষ্টার উৎসাহের সহিত ভার লইয়া, ও এক পাঁইট্ কালি লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

প্রহ্লাদ ফোর্থ্ ক্লাসে পড়িলেও, সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার গুণমুগ্ধ ছিল। সে কলিকাতার থিয়েটার দেখিয়াছে ও সেই অনুকরণে—"বসন্ত নিতান্ত সখি সুখকর সেজনে" প্রভৃতি গানগুলি গাহিতে পারে। বেণী মাষ্টারের ছেলে কিশোরী থিয়েটার না দেখিলেও তাহার গলা ভাল। প্রহ্লাদ ওস্তাদ হইলেও, সম্প্রতি ছেলেরা কিশোরীর গান শুনিতে ঝুঁকিয়াছে। সে-কারণ প্রহ্লাদ বিশেষ ঈর্ষা অনুভব করিতেছিল।

বহু পূর্ব্বে ইস্কুল হইতে সরিয়া পড়ায়, আজ যে মাষ্টারদের মাসিক মিটিং বন্ধ রহিল, এ সংবাদ কিশোরী পায় নাই। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরের ঘরে ওয়েবেষ্টার বাজাইয়া একটি গান প্রাক্‌টিস্ করিতেছিল। প্রহ্লাদ সব জানিত, সে ইস্কুল হইতে সত্বর আসিয়া, কিশোরীর অজ্ঞাতে বাহির হইতে তাহার গান শুনিতেছিল। বেণী মাষ্টার মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া সে সেই দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইল। বেণী মাষ্টারের মেজাজ ভাল ছিল না, তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"কিরে পেল্লাদে, এখানে আবার কি হচ্ছিল? কিশোরীর মাথা খাবার চেষ্টা বুঝি! ফের দেখি ত' আছড়ে মেরে ফেলবো।"

প্রহ্লাদ সে কথার উত্তর না দিয়া, বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিল—"মাষ্টার মশাই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে বোধ হয় গোপাল বাবু এসেছেন।" বেণী বাবু বিরক্তির সহিত প্রশ্ন করিলেন—"কে গোপাল বাবু?" প্রহ্লাদ—"বোধ হয় গাইয়ে নুলোগোপাল বাবু" বলিয়াই সরিয়া গেল। গাইয়ে গোপাল বাবু ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রহ্লাদ কয়েকবার কলিকাতায় মাসীর বাড়ী গিয়া এ সব সংবাদে পাকা হইয়া আসিয়াছিল। নুলোগোপাল বাবু যে বেণী বাবুর আলাপি বন্ধু, এবং কিশোরীর উপনয়নের সময় আসিয়াছিলেন, সে তাহাও জানিত।

বেণীবাবু তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া তাঁর ধূলিধূসর পেনেলা জুতা জোড়াটি ঝাড়িয়া, মুখ মুছিতে মুছিতে অগ্রসর হইলেন। বহির্বাটীর বাগান পার হইতেই মৃদু মিঠে সুর কাণে আসিল—

"বাঁধা যার কাছে মন—আছে তার কাছে প্রয়োজন;

* * *

সে বিনে যে প্রাণে, বাঁচিনে বাঁচিনে,
কতকাল আর প্রবোধি বচনে,—
মন না মানে বারণ।"

বেণী মাষ্টারের প্রাণে যে রুদ্ররস ছাড়া আর কোন রস থাকিতে পারে, এ কথা তাঁহার পত্নীও ভাবিতে পারিতেন না। গান পশুপক্ষীকেও মুগ্ধ করে, বেণী মাষ্টার এ দুয়ের একটিও না হইলেও, ছেলেদের মধ্যে তিনি বাঘা-বেণী বলিয়াই সুপরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, গান শুনিয়া বেণী মাষ্টারের মেজাজ নিমেষে মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ হইয়া গেল, মুখে হাসি খেলিল, এবং বুকে একটা স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। ভাবিলেন, বন্ধু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, এই গীতটি রহস্যচ্ছলে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সেই আনন্দের ঝোঁকে, প্রবেশ মুখে—পাল্‌টা হিসাবে, মাথা নাড়িয়া—

"সে চাঁদ চকোর' হয়ে, কেন ভূমে লুটাইয়ে,
শ্যাম—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না।"

ভাঁজিতে ভাঁজিতে একদম ঘরের মধ্যে হাজির!

এ কি! এ যে কিশোরী! তাঁর চখের সামনে বিশ্বটা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর তার হো হো শব্দ কর্ণে যেন বিকট বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে,—রাগে লজ্জায় আহত ফণীর মত ফুলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্যটা কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন, তাহা মাথায় না আসায়—রোষ-কম্পিত হস্তে বোতলের সমস্ত কালিটুকু

কিশোরীর মাথায় ও মুখে নিঃশেষ করিবার পর বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, ও আসল কাজে হাত দিলেন—রাস্‌কেল, ব্রুট্, র‍্যাগার্ড, ডেভিল্,—এক একটি উচ্চারণের সহিত এক একখানি বাঁধানো-বই কিশোরীর মাথায়, পিটে, সজোরে পড়িতে লাগিল। শেষ শিবশূল সদৃশ ছারপোকার শান্তি নিকেতন প্রাচীন ওয়েবেষ্টারখানি তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে পত্নী দ্রুত আসিয়া তাহাতে ধাক্কা দিতেই, সাতখানা হইয়া দূরে গিয়া পড়িল। বেণীবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্নীকে বলিলেন—"চলে যাও এখান থেকে"—পত্নী বলিলেন—"কি হয়েছে কি? মেরে ফেল্‌লে যে!"

বেণী মাষ্টার। ও তো মরতেই বসেছে, আমি না মারলেও ও মোরবে।

পত্নী। হয়েছে কি শুনি।

বেণী মাষ্টার। বিশেষ কিছু হয়নি, কেবল "সে বিনে" তোমার ছেলে "বাঁচিনে বাঁচিনে" হয়েছে, আর আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে;—স'রে যাও, ও এখুনি দূর হয়ে যাক, যেখানে ওর "আছে প্রয়োজন"! "Infernal wretch" বলিয়াই পদাঘাত; বেরো ও রাস্‌কেল "বাঁধা যার কাছে মন"! মাষ্টারের ছেলের গান! ওর আজ জান্ নেবো।" বলিয়া তৃতীয় আক্রমণের উদ্‌যোগেই, মাতার সাহায্যে বাহির হইয়া কিশোরী ঊর্দ্ধশ্বাসে লম্বা দিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

প্রহ্লাদ মজা দেখিবার জন্য অদূরেই ছিল, সে এখন প্রমাদ গণিল;—এতটা সে ভাবে নাই। এখন সে তাহার ভবিষ্যৎটা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল।

তাহার পর শোনা গেল—কিশোরী একদম মাতুলালয়ে গিয়া দম লইয়াছে; প্রহ্লাদ কলিকাতায় মাসীর বাড়ী প্রস্থান করিয়াছে।

গ্রামের মেয়ে পুরুষে সবিস্ময়ে বলিল—"ইস্কুলের ছেলে গান গায় কি গো! অমন ছেলে গাঁয়ে না থাকাই ভাল, সব ছেলের মাথা খাবে।" ইত্যাদি।

বেণী মাষ্টার এতটুকু হইয়া গেলেন। তাঁর Essay লেখা ফেঁসে গেল। ইস্কুলে মাথা নীচু করিয়া আসিতেন যাইতেন, আর টিফিন্ রুমের একটি কোণে "বৈরাগ্য শতক" খুলিয়া সময় কাটাইয়া দিতেন।

(৩) একাল—

ভূমিকা অনাবশ্যক।

আগামী শনিবার ছাত্রদের প্রাইজ বিতরণের দিন। প্রাইজ-অন্তে পূজার ছুটী আরম্ভ হইবে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে সম্মত হইয়াছেন; মেম সাহেব প্রাইজ্ বিতরণ করিবেন। সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য মহোদয়গণকে এবং বালকদের অভিভাবকদের কার্ড ও পত্র বিলি সুরু হইয়াছে। তাহার পরপৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কার্য্য তালিকা বা প্রোগ্রাম দেওয়া আছে—

(১) রিপোর্ট পাঠ, (২) আবাহন ও মাল্যদান সঙ্গীত এবং প্রার্থনা সঙ্গীত, (৩) আবৃত্তি বা রিসিটেসন্, (৪) কথোপকথন বা ডায়েলগ্, (৫) অভিনয়, (৬) সংকীর্ত্তন, (৭) প্রাইজ্ বিতরণ, (৮) বক্তৃতা ইত্যাদি।

কার্য্যটিকে সম্যক সফল করিবার জন্য নানারূপ আয়োজন চলিতেছে। এটিকে উপাদেয় উৎসবে পরিণত করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়দের উৎসাহের অবধি নাই।

আজ শুক্রবার। কেবল সাজানো গোছানো (decoration) আর রিহার্সেল চলিতেছে।

জগতে অনেক জিনিস আছে, তাহারা যত ছোট হইবে ততই তাহাদের কদর বেশী। তাক্ লাগাইবার জন্য ছেলে বাছাইও সেই লক্ষ্যে হইয়াছে, সুতরাং বালক, বাচ্চা, ডিম্ব "চয়নিকা" লইয়া তালিম ও মহলা চলিয়াছে। গোবরা ইস্কুলের বাগানের পেয়ারা চুরি করিয়া 'অর্দ্ধগ্রাস' অবস্থায় পকেটে পুরিয়াছিল, তাহার প্রাণ সেইখানে পড়িয়া থাকায়, চারিদিক দেখিয়া সন্তর্পণে বাহির করিয়া আর এক কামড়ে তৃতীয়াংশ মুখে পুরিয়া ফেলিল; গুটুলের পকেটে আমসত্ব ছিল, সে পকেটে হাত পুরিয়া তাহার গুলি পাকাইতেছিল, সুযোগমত সেটি মুখে ফেলিয়া টিপিয়া রহিল। থার্ড মাষ্টার, একটি বালকের দিকে নজর পড়ায়, বলিলেন—"কাঁদচিস্ কেনর‍্যা ধ্যাবড়া!" হুলো হাম্‌রাই হইয়া বলিল—"কাঁদবে কেন মাষ্টার মশাই, নাকে এক থাবা নস্যি পুরেছে!" মাষ্টার মশাই উৎসাহ দিয়া বলিলেন "তাতে আর হয়েছে কি, নেপোলিয়নের মা পর্য্যন্ত নস্যি নিতেন। নে আরম্ভ কর,—

মনে আছে ত, যে যে কথায় 'জোর্ গমক্' দিয়ে গাইতে হ'বে? নেঃ—

"মম চিত্ত গগন দীপ্ত করিয়া ভাগ্য চন্দ্র উদ্দিল,"—

ইতিমধ্যে গোবরার ছঃসময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল; গেঁড়ার মুখ চলিতে দেখিয়া পকেটে হাত দিয়া বুঝিল, তাহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তখন মহলা সুরু হইয়া যাওয়ায় "আচ্ছা বেটা দেখে নেব!" বলিয়াই, বিক্ষিপ্ত ও অন্যমনস্কভাবে যোগ দিল ঃ

"মম চিত্র গহন ক্ষিপ্ত করিয়া ব্যাঘ্র চন্দ্র ছুটিল;"—

পেয়ারার চতুর্থাংশ চুরি যাওয়ায় সে "বুদ্ধিভ্রংশ" হইয়াছিল, তবে 'চিত্ত' শব্দটিতে রফলা যোগ সে সজ্ঞানেই 'গমক্' হিসাবে করিয়াছিল। ছঃসময়ে যাহা হয়,—প্যাংচাঁদ তাহাকে রেহাই দিল না, রফলার ভুলটি মাষ্টার মহাশয়ের গোচর করিয়া দিল। মাষ্টার আজ মাটীর মানুষ, তিনি বলিলেন—"গানে ওকে ভুল বলেনা, গানের প্রধান জিনিস্ সুর, সুর বজায় রাখবার জন্যে "মুদ্রাদোষ"ও অভ্যাস করতে হয়। কালোয়াতি গান যখন শেখাব তখন সে সব দেখিয়ে দেব। খেয়াল যখন শিখবে তখন বুঝতে পারবে সুর ঠিক্ রেখে যা' তা' বলে গেলেই হ'ল,—সেঁইঞা, বেইঞা, মেইঞা ইত্যাদি। আমাদের ভাষায় ঞ বর্ণটির ব্যবহারই নেই, কিন্তু হিন্দুস্থানীরা কায়মনবাক্যে উটির ব্যবহার করেন, তাই বড় বড় ওস্তাদদের মিঞা বলে। দেখেও থাকবে—তাঁরা যখন কোমরে চাদর জড়িয়ে, মের্জ্জাই এঁটে, পাগড়ি বেঁধে, জানু পেতে বসে সারেঙ্গির ছড়ি টানেন, তখন 'ঞ'র' মতই দেখায়। তদ্ভিন্ন ছড়ি সমেত সারেঙ্গি যন্ত্রটিতে 'ঞ'র সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। এই সবগুলির একত্র সমাবেশ হয়ে 'মুদ্রাদোষ'যুক্ত হলেই মিঞা উপাধি লাভ হয়। যাক, সে সব পরে হবে। গোবরা যে বৃথা কথার দিকে নজর না রেখে মূল সুরের দিকে দৃষ্টি রেখেছে, এতে আমি খুসী হয়েছি; ওর হবে। এখন লেগে যাও।" তালিম সজোরে চলিতে আরম্ভ করিল। মাষ্টার মহাশয়ের উৎসাহ পাইয়া গোবরা পেয়ারার কথা ভুলিয়া চতুর্গুণ উৎসাহে চেত্তা মারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় বৃদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ লোক, তিন 'কাল'ই দেখিয়াছেন; হেড্ মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, আমি নিরামিষভোজী, কাল আর আমি আসব না বাবা।" হেড্ মাষ্টার মশাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি পণ্ডিত মশাই, কাল একটা বচ্ছরকার দিন, এত বড় উৎসব, শিবহীন যজ্ঞ কি সম্ভব!" পণ্ডিত মশাই বলিলেন, "আমি অভয় দিচ্ছি, তাতে কোন অনর্থপাতের সম্ভাবনা নেই, কোন "সতী" কেঁদে আছাড় খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন না, তিনি বহুদিন হ'ল স্বর্গে গেছেন।" হেড্ মাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সত্যি কারণটা কি, নিরামিষভোজীর সঙ্গে এ উৎসবের বিরোধটা কোথায়! এবার ত' কোন ভোজেরই ব্যবস্থা নেই।" পণ্ডিত মশাই বলিলেন "একটু আছে বই কি,—আমি সেকেলে লোক, আমার অনেক কুসংস্কারই রয়ে গেছে, তুমি ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না,—বালকদের মাথা খাওয়াটায় আমার রুচি নেই।" হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের মুখের হাসি নিমেষে মিলাইয়া গেল, তিনি মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তবে আসবেন না; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আপনার খোঁজ নেবেনই, কি বোলব'?" চন্দ্র পণ্ডিত মশাই সহাস্যে বলিলেন "বৃথা চিন্তা রেখ না, দিনের বেলা কোন বুদ্ধিমানেই "চন্দ্রের" খোঁজ করবে না।" এই বলিয়াই ছাতাটি বগলে করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বিদায় লইলেন। হেড্ মাষ্টার মহাশয় সেই ছাতা-বগলে ব্রাহ্মণটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পণ্ডিত মশাই অদৃশ্য হইবার কয়েক মিনিট পরে তাঁর হুঁস হইল, তিনি ছুই হাতে কোটের ছুই আস্তিন ঝাড়িয়া যেন মোহমুক্ত হইলেন, ও আপনাআপনি বলিলেন, "নাঃ কালধর্ম্ম বজায় কোরে চলতেই হবে।—"আগে চল্—আগে চল্ ভাই" বলিতে বলিতে উচ্চ শিরে দ্রুতচালে গট্‌গট্ শব্দে রিহার্সেল রুমের দিকে চলিয়া গেলেন।

* * * *

সুসজ্জিত ইস্কুল 'হলে' প্রাইজ্ বিতরণ সভা বসিয়াছে। নিমন্ত্রিত স্থানীয় গণ্যমান্য ডেপুটি, জমীদার, খেতাবী, উকীল চেয়ারে বসিয়াছেন; সাধারণ ভদ্রলোক ও বালকদের অভিভাবকেরা অবশিষ্ট চেয়ার বা বেঞ্চ পাইয়াছেন।

সম্মুখে সভাপতির আসন ও তৎপুরোভাগে টেবিলের উপর ফুলের তোড়া, পুরস্কার—মেডেল ও পুস্তকাদি।

পত্নীসহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সভাপতির আসন অধিকার করিবার পর কার্য্যারম্ভ হইল।

হেড মাষ্টার বার্ষিক বিবরণী বা রিপোর্ট পাঠ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, ড্রিল্, ফুটবল্, ক্রিকেট্, হকি, টেনিস্ এবং ম্যাচ্ সম্বন্ধে বেশ জোর নজর রাখা হইয়াছে; এবং তাহাতে ব্যয়ও বেশ ভদ্রোচিত। বালকদের স্বাস্থ্য ও আনন্দদানের জন্য গত বৎসর আর অধিক কিছু করা সম্ভব হয় নাই, সেজন্য শিক্ষকেরা বিশেষ ছুঃখিত।

তাহার পর প্রাইজ বিতরণান্তে, বালকদের সম্মিলিত সঙ্গীত, একক সঙ্গীত, আবৃত্তি, কথা-কাটাকাটি, অংশাভিনয়—ঘনঘন করতালির মধ্যে এক এক করিয়া শেষ হইল। পরিশেষে বাচ্ছা, ছা, ডিম্ সহযোগে একটি গুড়্‌গুড়ে পার্টি দেখা দিল; মাথায় রংবেরংয়ের রেশমী রুমাল বাঁধা।

সকলেই ভাবিল সং বা ফার্স; মেমসাহেব ক্লাউনের প্লে (ভাঁড়ামী) ভাবিয়া করতালি দিয়া হাসায়, সকলেই করতালি দিলেন ও হাসিলেন।

ফটিক হারমোনিয়ম টিপিল. ঘুঁতে খোলের পশ্চাতে থাকিয়া চাঁটি দিল, ঘেঁচি বেডউল টমেটোর মত গাল ফুলাইয়া চিকুলুতে ফুঁ মারিল, পটলা কীর্ত্তনের সুর ছাড়িল

বাঁশরী রশি হৃদে মরমে রহিল বিঁধে,—

এতো স্বর নয়—শর গো ও-ও-ও

এই পর্য্যন্ত গাহিয়া বেদনায় যেন মচ্‌কাইয়া পড়িল।

বাহবা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ অবাক হইয়া শুনিতে কি দেখিতে লাগিলেন, তাহা ঠিক্ বলা কঠিন। কীর্ত্তন প্রবল উৎসাহে চলিতে লাগিল ও (creditably) বাহবার মধ্যে শেষ হইল। মেম সাহেবকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি অতিষ্ঠ বোধ করিতেছেন। আর কে একজন (নিশ্চয় বে-সমজদার হইবেন) বলিয়া ফেলিলেন—"এগুলি অনাথ বালক, না বাপ মা বর্ত্তমান!"

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মন্তব্য ও বক্তব্য আহ্বান করায়, সুবক্তারা উঠিয়া পত্নীসহ সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দিলেন, বালকদের উৎসাহ দিলেন, ও রাজভক্ত হইতে উপদেশ দিলেন—অবশ্য ইংরাজি ভাষায়।

স্মার্ত্ত শিরোমণিমহাশয় ছুই তিন বৎসর হইল বিক্রমপুর হইতে এখানে আসিয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন; সাতটি বিদ্যার্থী বালককে বিদ্যা ও অন্নদান করেন। দেশের হাওয়া আর উদরান্নের অবস্থা বুঝিয়া, কনিষ্ঠ পুত্র ছুইটিকে কয়েক মাস পূর্ব্বে এই ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্বর সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া,—ফোঁটা চন্দন, গরদের জোড় ও কটুকে চটি পরিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি সাহেব পুনরায় বলিলেন "আর কাহারো কিছু বলিবার আছে?"

শিরোমণি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"অনুমতি হয়ত' আমি বঙ্গভাষায় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমি সংস্কৃত অধ্যাপক, ইংরাজি জানি না। টোল আছে, বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা আমার ধর্ম্ম। মুন্সিপাল মাসিক ছুই তঙ্কা সাহায্য করেন।"

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাংলায় বলিলেন—"আপনার মণ্টব্য আমি আনণ্ডের সহিত শুনিতে ইচ্ছা করি।"

শিরোমণি। আমার ছুই পুত্রকে এই আখরায় ভর্ত্তি কইরে দিয়াছি। পরাশুনা কি হয় আমি জানিনা, বুঝিনা, সে সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই; স্বীকার করলাম্ ভালই হয়। বিদ্যার্থীর ক্যাশ ব্যাস বিলাসের কথাও দরিদ্রের আলোচ্য হইতে পারে না। কিন্তু সন্ধ্যান্তে বালকদ্বয় ইস্কুলের ফুটোব্ব্যাল্ (foot-ball) চর্চ্চা ক'রে ঘরে আসে যেন—লাঙ্গল-চষা হেলে বলদ্, জান্ নাই, পা লর্‌বর্ করছে, চক্ষু মুদে আসছে, চিৎপাৎ হইয়ে হাপ্ ছারছে। পুথি লয়্যা বসছে কি ঢুলছে। না হয় ছুই ভ্রাতায় লরুই লাগছে—টিম্ টিম্ (team) বক্‌ছে। কয়ডা গোল্ (goal) হইল, কয়ডা উট্ (out) হইল, কে বালো ক্যাক্ (Kick) করছে, কে শাবাস স্যুৎ (shoot) মারছে;—এই সব প্রলাপ কয়! বলদারা পরবে কখন! খ্যাদ্—কলায়ের দাল, বাইগুন ভাজা ভাত খাইয়ে মরার মত নিদ্রা! অর্দ্ধপ্যাট্ শাকান্ন খাইয়ে, আর বাপুদের সন্তান চরবির জেলাপী চুষিয়ে যক্ষ্মায় মরছে,—পিতা-মাতাকেও মারছে। স্যাথ্‌চি এই ফুটোব্ব্যাল্ আর বটব্ব্যাল্ (bat ball) বালকদের পরকাল খাইছে। কর্ত্তারা যদি ঐ সঙ্গে অন্ততঃ ছুই ছটাক্ কইরে খাটি ঘৃত

পক্কের ব্যবস্থা করেন তবেই রক্ষ্যা। আবার ম্যাচ ম্যাচ্ কয়,—অর্থ বুঝবার নারি। কত আর কইব হুজুর,—সেদিন কনিষ্ঠ পশুডা নিদ্রাবস্থায় চিক্কুর দিয়া গোল্ (goal) কইয়ে, এমন পায়ের গুতা লাগাইল যে গরীবের এক কলস গুর চুরমার হইয়ে চরকার উপর পইরে—সেডাকে মধুচক্র বানাইয়া দিল!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি রুমাল মুখে চাপিয়া বলিলেন—misfortune indeed! (দুর্ভাগ্য বটে!)

শিরোমণি। হুজুর আপনি জিলার মালিক, স্বচক্ষে দর্শন করলেন বাপ খু'রা, অধ্যাপক সম্মানিতের সাক্ষাতে ভদ্রবালক তান্ মারছে, ঠেকা ঠুক্‌ছে, লট্‌লটির ভাব দেখাইছে, ছরা কাট্‌ছে, ইডা ক্যামন্ কর্ত্তা!

"আবার কর্ণে আসছে মণ্ডালুচি (Mentality) বদলাইতে হইবা! স্বর্ণচন্দ্রেরা ত' আণ্ডা আর চ্যাপ্ (Chop) চালাইয়ে মণ্ডালুচি বর্জ্জন বহুদিন করছে, এখন কি সেডা মোদের শ্রাদ্ধে আর পিণ্ডদানে চালাইবে! শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু;—যাক্ ইসের (চুলার) মধ্যা। ও যামিনী, হ্যাদে নিশিকান্ত এনে আসো, খুব শিক্ষা হইছে! ঘরকে চলো সুপুত্র আমার, লাঙ্গল চালাইও, চরকা গুরাইও—মানুষ হবা।

"ম্যাম্ সাহিব সাহিব, ভদ্রমণ্ডলী ব্যাবাক্‌কে ধৈন্যবাদ।"

এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় পুত্রদ্বয়ের হাত ধরিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসি পড়িয়া গেল। বড়দের মধ্যে কে একজন তাচ্ছল্যভাবে বিদ্রূপ করিলেন—"নবাবী আমলের টাকা!"

একজন শিক্ষিত সুবক্তা উঠিয়া সাহেবকে ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিলেন—উনি একজন অশিক্ষিত টুলো পণ্ডিত—পুরো সেকেলে লোক—গোঁড়া টাইপের (typeএর)। আজকালের উচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতার ধার ধারেন না; উন্নতিশীল জগতের দ্রুত বিবর্ত্তনের কোন খোঁজই রাখেন না; সময়ের চালে ও তালে চলবার যোগ্যতা একদম নাই; এখনো শতবর্ষ পশ্চাতে সেই অন্ধকারেই পড়ে আছেন। ওঁর কথায় কেহ কাণ দেবে না, দেয়ও নাই। সুখের বিষয় দেশে ওসব জীব (mammoth) দ্রুত নিঃশেষ হ'য়ে আসছে, বেশী দিন আর আমাদের এসব দুর্ভোগ ভুগতে হবে না, সুতরাং ওঁর কথার ভালমন্দ আলোচনা অনাবশ্যক।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্ববঙ্গে বহুদিন ছিলেন; তিনি সবই বুঝিয়াছিলেন; একটু হাসিলেন মাত্র।

বালকদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছে, তাহাদের প্রাইজ দিবার পর সভাপতি মহাশয় আনন্দ প্রকাশ সহ শিক্ষক মহাশয়দের প্রশংসা করিলেন ও বালকদের উৎসাহ দিলেন; করতালি পড়িয়া গেল। God save the King গীতান্তে সভাভঙ্গ হইল।

মেম সাহেব মোটরে উঠিতে উঠিতে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—What do you think of what that old man said (বৃদ্ধলোকটি যা বললেন সে সম্বন্ধে তুমি কি বল)?

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন; Almost every inch correct. They have added many nuisance to Western methods with vengeance! (পনের আনা ঠিক্। এরা পাশ্চাত্য পদ্ধতির উপর টেক্কা মারতে গিয়ে, অনেক উৎপাত চাপিয়ে বসেছে!)

মোটর চলিয়া গেল। বালকেরা অভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহের সহিত "কেয়াবাৎ ইয়াঃ আলবৎ" প্রভৃতি উচ্ছ্বাস তুলিয়া চলিল। পদাতিক অভিভাবকেরা ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই—শরৎ সূর্য্যের সোণার তারে ঝঙ্কার দিতে দিতে একটি সুমধুর সুর কাণে পৌঁছিয়া সহসা সকলকে দাঁড় করাইয়া দিল। অদূরে একটি ভিক্ষুক গাছতলায় বসিয়া আপনমনে গায়িতেছিল:—

"ভাল ফাঁদ্ পেতেছ শ্যামা বাজিকরের মেয়ে!"

ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা

(কটক সাহিত্য-পরিষদে পঠিত)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাঙ্গালোরে শেষণের অপূর্ব্ব বীণা ছাড়া অন্য কোনও উচ্চশ্রেণীর অথচ মনোহর সঙ্গীত শোনা হয় নি। অর্থাৎ, কর্ণাটী বিশেষজ্ঞদের মতে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত এবার দক্ষিণে যথেষ্ট শোনা গিয়েছিল; তবে তার মধ্যে মনোহারিত্ব ছিল না, এই যা দুঃখ। তবু দক্ষিণী গান-বাজনার খুব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শুনেছিলাম অনেকটা কর্ত্তব্য-বোধে। কারণ, এই শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যার মনে একবার সঙ্গে না বলে, নানা সূত্রে বলাই ভাল বলে, আপাততঃ দক্ষিণী গায়ক বাদকদের কি কি গুণপনা আমার চোখে পড়েছিল, সে সম্বন্ধেই দুচারটি কথা বল্‌ব।

বাঙ্গালোরে বৈদ্যনাথ চম্পায়ে ভাগবতার বলে একজন খ্যাতনামা গায়কের গান শুনেছিলাম। শুন্‌লাম যে, ইনি প্রথিতযশা না হলেও, দক্ষিণে উদীয়মান গায়ক বলে গণ্য হয়ে থাকেন। তবে তিনি উদীয়মান কি অস্তমান সে কথা

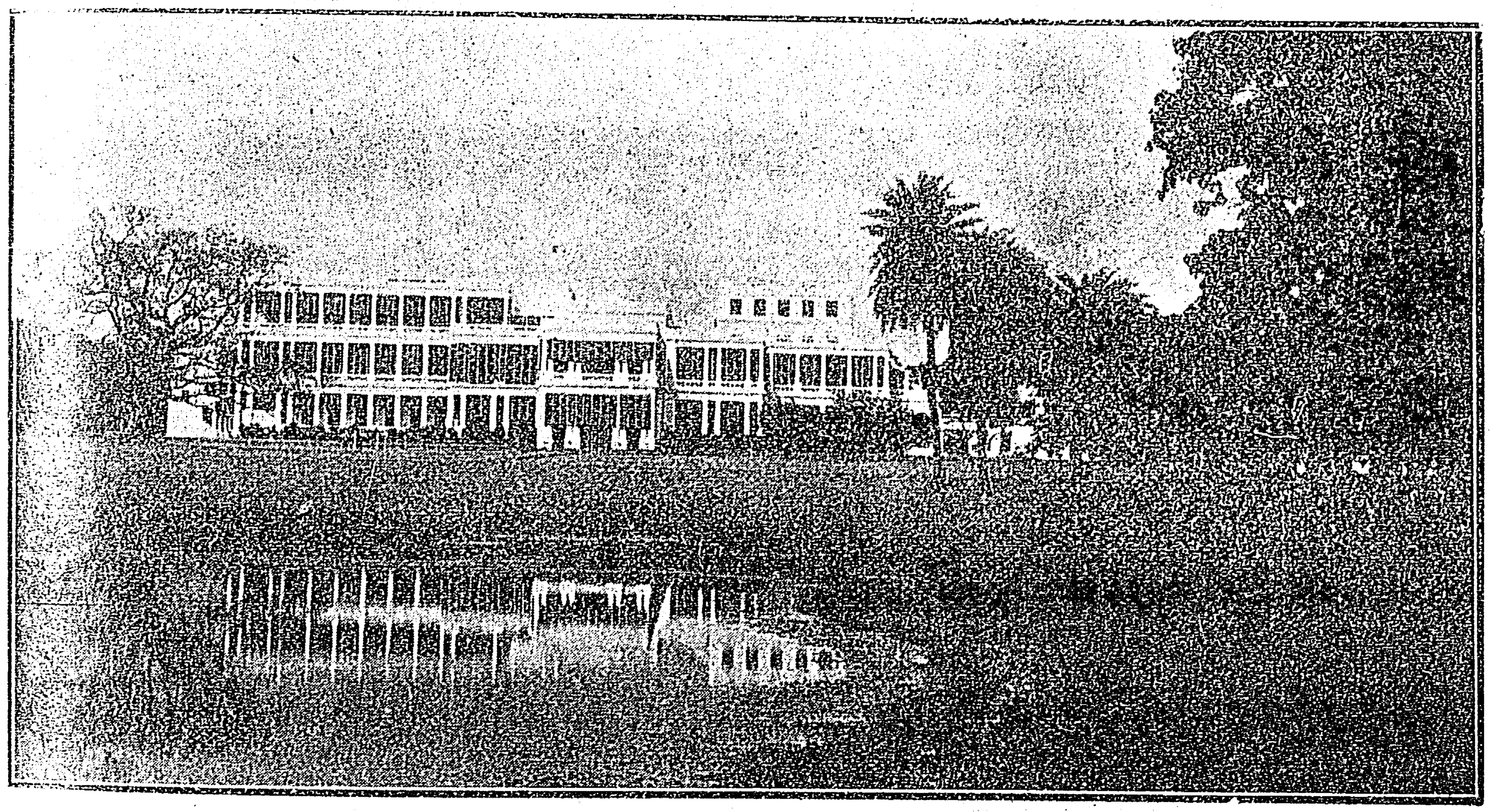

মান্দ্রাজ—লাট-প্রাসাদ

অনুরণন তুলেছে, কর্ণাটী সঙ্গীত তার কেবল কাণের ভিতর প্রবেশ কর্ত্তে পারে মাত্র, "মরমে পশিতে" পারে না। দক্ষিণীরা তাদের সঙ্গীত খুব scientific বলে গর্ব্ব করে থাকে; কিন্তু তারা গানে এমন অদ্ভুত ভাবে স্বরকে নাচায়, যাতে আমাদের মনটা কেমন যেন একটু উদ্‌ভ্রান্ত না হয়েই পারে না। তবে দক্ষিণী সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার ধারণা ও impressionগুলি এক-ছেড়ে দিলে, তাঁর গানের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তাতে কম্পমান না হয়ে থাকৃতে পারে, এমন শ্রোতা এক দক্ষিণেই মেলা সম্ভব। কারণ, তাঁর জীবনের motto ছিল—বিদ্যুদ্বেগে গান করে নিজেকে ও অন্য পাঁচজনকে গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর করে তোলা। তবে তাঁর সে গানের আসরের মধ্যে আমার ভাল লেগেছিল এইটুকু মাত্র যে, সেটা ছিল বিশুদ্ধ গানের আসর। সকলেই সেখানে এসেছিল গান শুনতে,

এবং টিকিট কিনলে সকলেই সে গান শুনতে যেতে পারত। আমাদের দেশে জনসাধারণ উচ্চ সঙ্গীত শোনবার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ পায় না—এ অনুযোগ আমি ইতিপূর্ব্বেই করেছি *। তাই সে প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ না করে আপাততঃ এইটুকুমাত্র বলতে চাই যে, আমাদের সঙ্গীতের আদর ও প্রতিপত্তি যদি বাড়াতে হয়, তবে তা যাতে আমাদের জনসাধারণ শুনতে পায়, সে বন্দোবস্ত করতেই হবে। এ পর্য্যন্ত রাজা-উজীর-জমিদাররা ওস্তাদ-বাইজীদের ডাকতেন নিজেদের প্রিয়পাত্র দুচারজনকে শোনাতে, ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক বলে

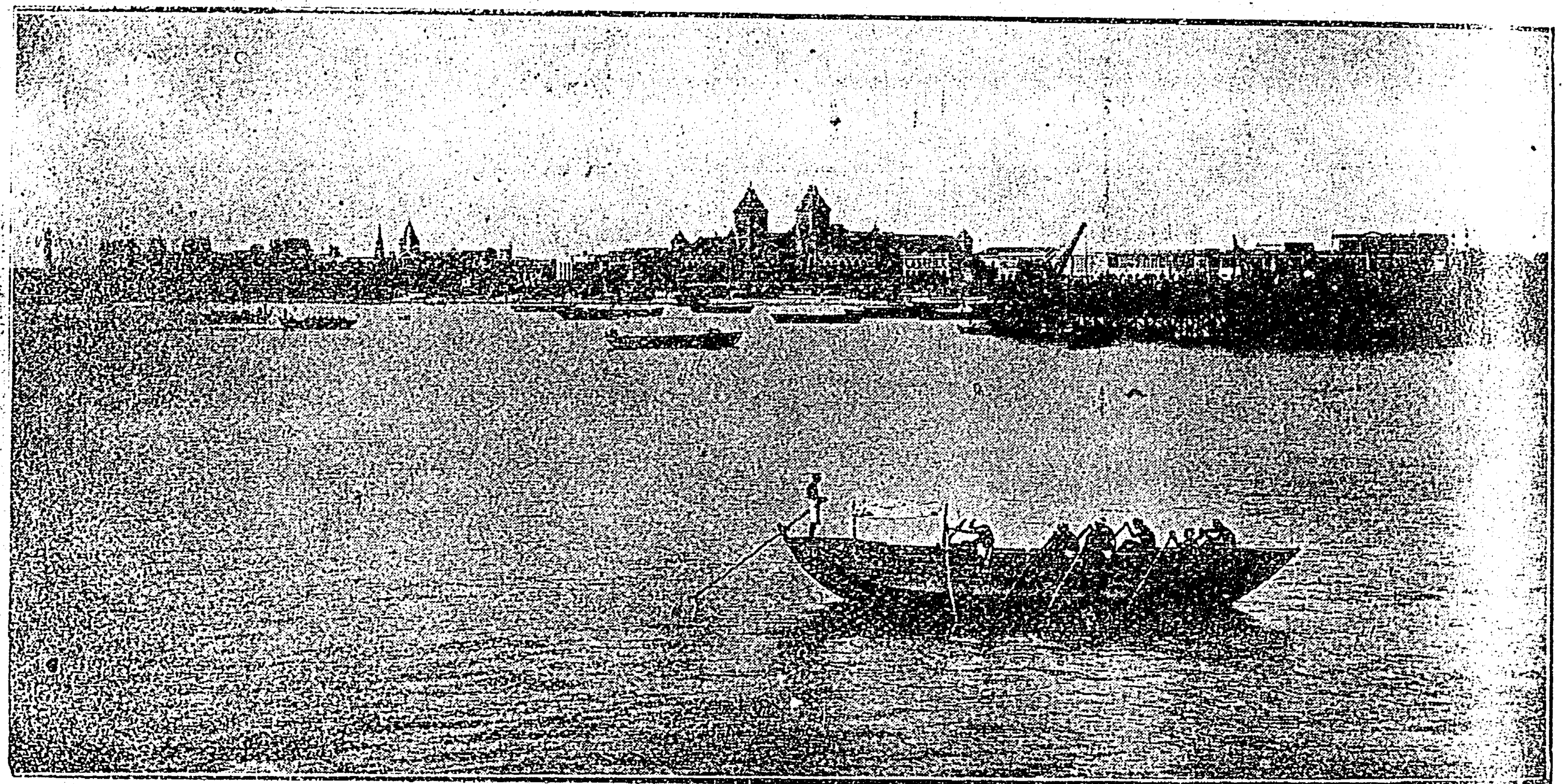

সমুদ্র হইতে মান্দ্রাজ

মনে করে গুম্ফদেশে চাড়া দিতে। এখন আর সে রকমটি চলবে না। কারণ, সঙ্গীত হচ্ছে অনুরাগীর আনন্দের জন্য, রসিকের রস যোগাবার জন্য, সাধকের সাধনার জন্য—বড় মানুষের একচেটে হওয়ার জন্য নয়।

দক্ষিণে এই জিনিষটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল যে, সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েরা টিকিট করে গান-বাজনার আসর করে থাকেন। কারণ এক এই উপায়েই গান-বাজনার সম্বন্ধে রুচি বা লোকমত গড়ে উঠতে পারে। রাজারাজড়ার ওখানে গানবাজনা হলে, যথার্থ সঙ্গীতানুরাগীর সেখানে প্রবেশধিকার বড় একটা থাকে না, কাজেই উচ্চসঙ্গীতের আবেদনে যেখানে পৌঁছন উচিত, সেখানে পৌঁছয় না।

ভাল গান মাঝে মাঝে শুনতে পায় বলেই কিনা জানি না, তবে মান্দ্রাজীরা খুব সঙ্গীতজ্ঞ দেখলাম। রাস্তায় ঘাটে উৎসবাদি উপলক্ষে তারা ছোট ছোট দল করে বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে গাইতে গাইতে নগর পরিক্রমণ করে থাকে। সহজ সঙ্গীত সচরাচর লোকপ্রিয় হয় বলে, এ রকম দৃষ্টান্তকে কোনও জাতির যথার্থ সঙ্গীতানুরাগের প্রমাণ স্বরূপে গণ্য করা চলে না। তবে মান্দ্রাজীরা যে উচ্চ সঙ্গীতও টিকিট কিনে শুনতে যায় ও যথেষ্ট লোক গিয়া থাকে) এ সত্যটিকে তাদের যথার্থ সঙ্গীতানুরাগের প্রমাণ স্বরূপে অনেকটা গণ্য করা যেতে পারে বোধ হয়। বলা বাহুল্য যে, এজন্য আমার মান্দ্রাজীদের ওপর শ্রদ্ধা হ'য়েছিল—তাদের অর্দ্ধমুণ্ডিত অদ্ভুত মস্তকের দৃশ্য সত্ত্বেও। মনে আছে যে তখন আমি প্রথম এই সত্যটি আবিষ্কার করেছিলাম যে তাহ'লে হয়ত মস্তক মুণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গীত-কলানুরাগের খুব নিগূঢ় সম্বন্ধ না-ও থাকতে পারে; যদিও এ অভাবনীয় আবিষ্কারে যে মনটা একটুও বিচলিত হয়ে পড়ে নি, এমন কথা শপথ করে বলা কঠিন। কারণ আশৈশব কোনও জাতিকে

* "আবদুল করিম ও আমাদের উচ্চ সঙ্গীত" প্রবন্ধে।

বেরসিকতার অবতার স্বরূপে মনে করে এসে, যদি হঠাৎ এক দিন তাদের মধ্যে রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ'লে বোধ হয় মনটা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে না পড়েই পারে না।

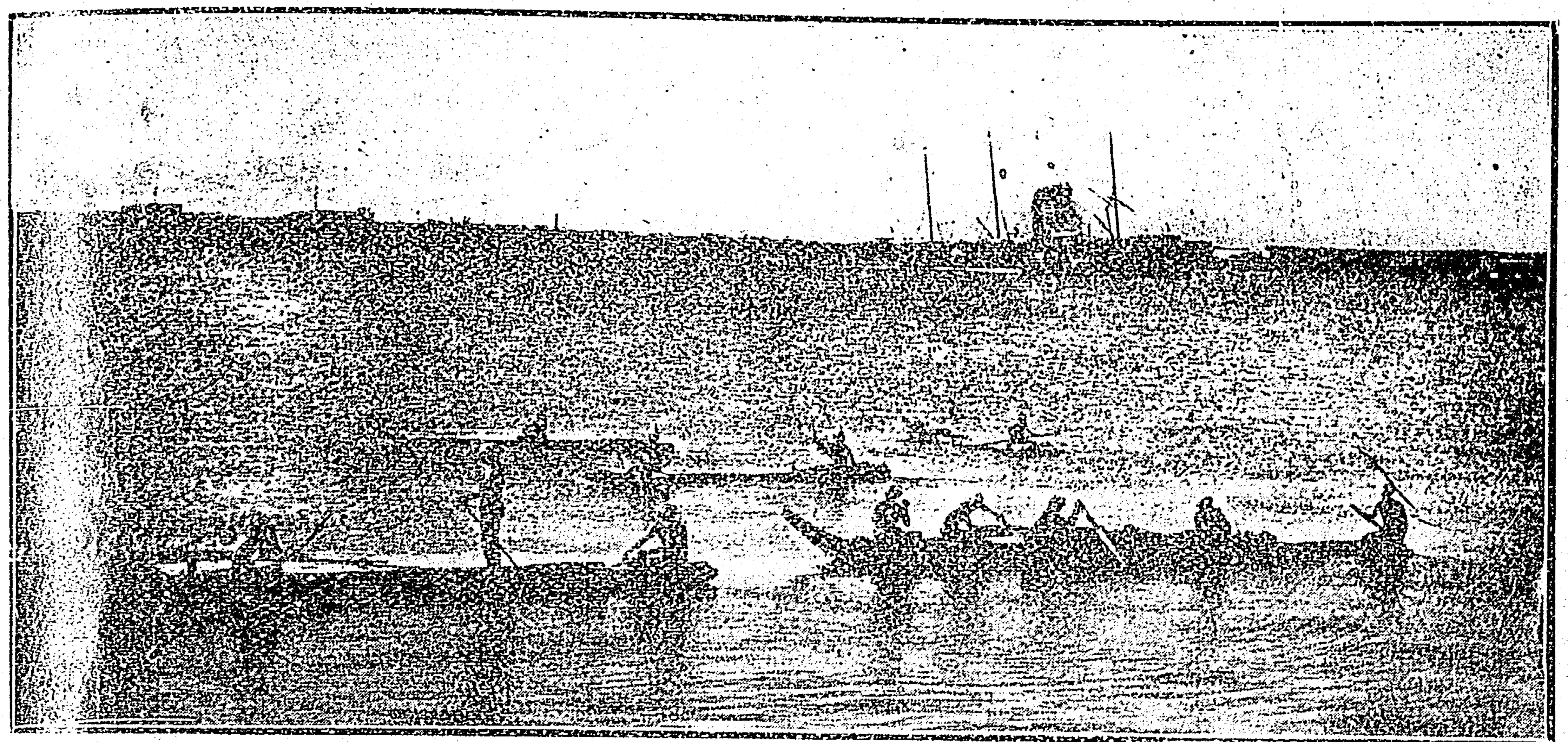

সমুদ্র হইতে মান্দ্রাজ—কাটামারান্স

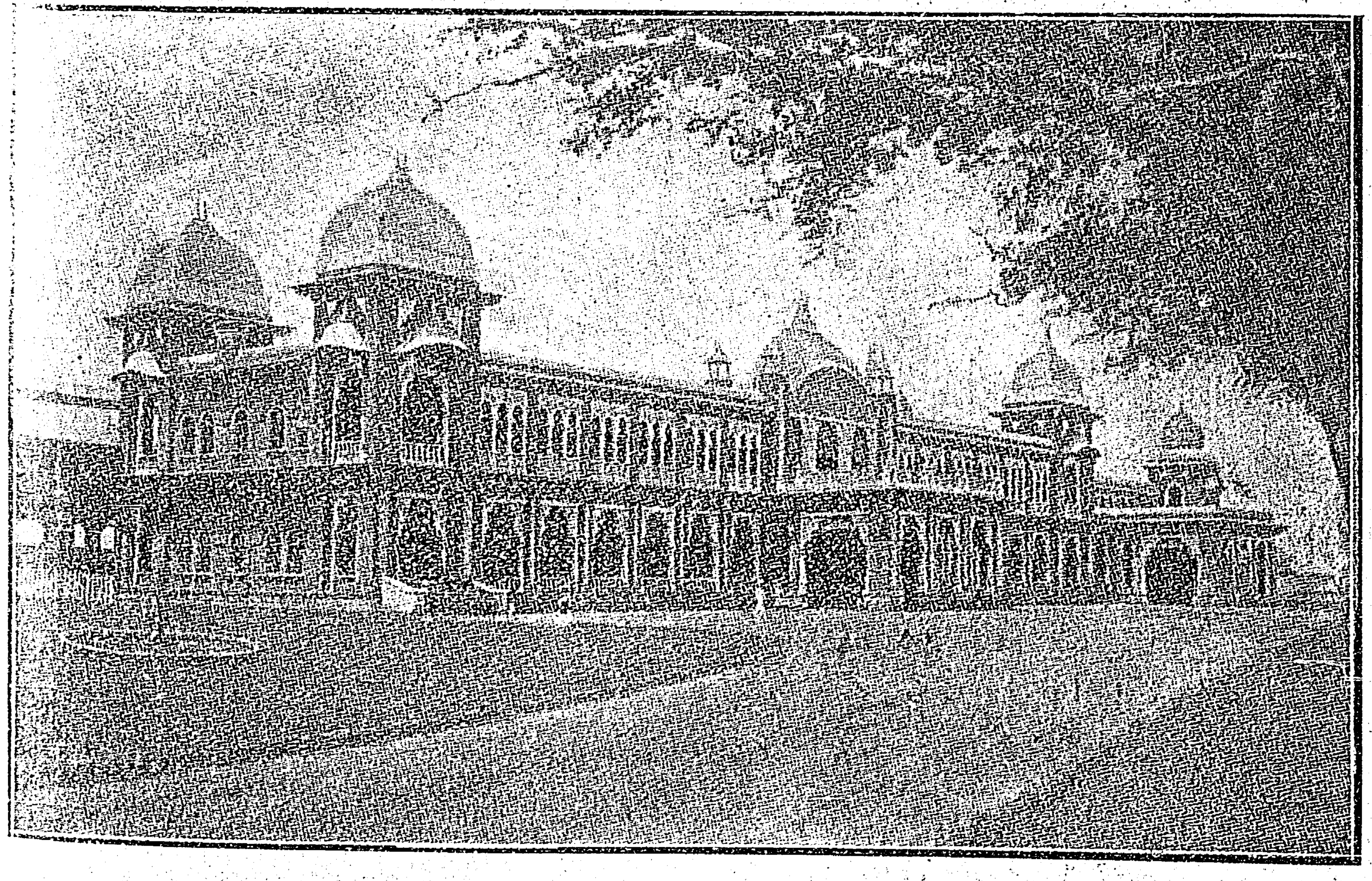

এগমোর ষ্টেসন—মান্দ্রাজ

সে যাই হোক, ভাগবতার মহাশয়ের গানের মধ্যে ছিল বিদ্যুদ্বেগ গতি। আর ছিল সেই অদ্ভুত দক্ষিণী স্বরকম্পন। আর ছিল অসাধারণ তালে দক্ষতা। ছিল না কেবল সুন্দর গিড়ের প্রাচুর্ভাব। ছিল না মনোজ্ঞ স্বাভাবিক তানালাপ। ও ছিল না গানে প্রাণের কোনও বালাই। তবে এক শেষণের বীণায় ছাড়া এ সব গুণগুলির উপদ্রব দক্ষিণী সঙ্গীতে একেবারেই দেখা যায় না। কাজেই এজন্য ভাগবতার মহাশয়কে দোষী করা আমার

অভিপ্রায় নয়। কারণ কোনও দেশের সঙ্গীতের উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রধানতঃ তার traditionএর ওপর। দক্ষিণী বা কর্ণাটী সঙ্গীতের tradition ও আদর্শ হচ্ছে তালে দক্ষতা, রাগের বিশুদ্ধতা ও গতানুগতিকতার আনুগত্য। কাজেই তাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দরদ, মিড়, গমক, প্রশান্ত আলাপ—এসব আশা করা ত ঠিক সঙ্গত নয়।

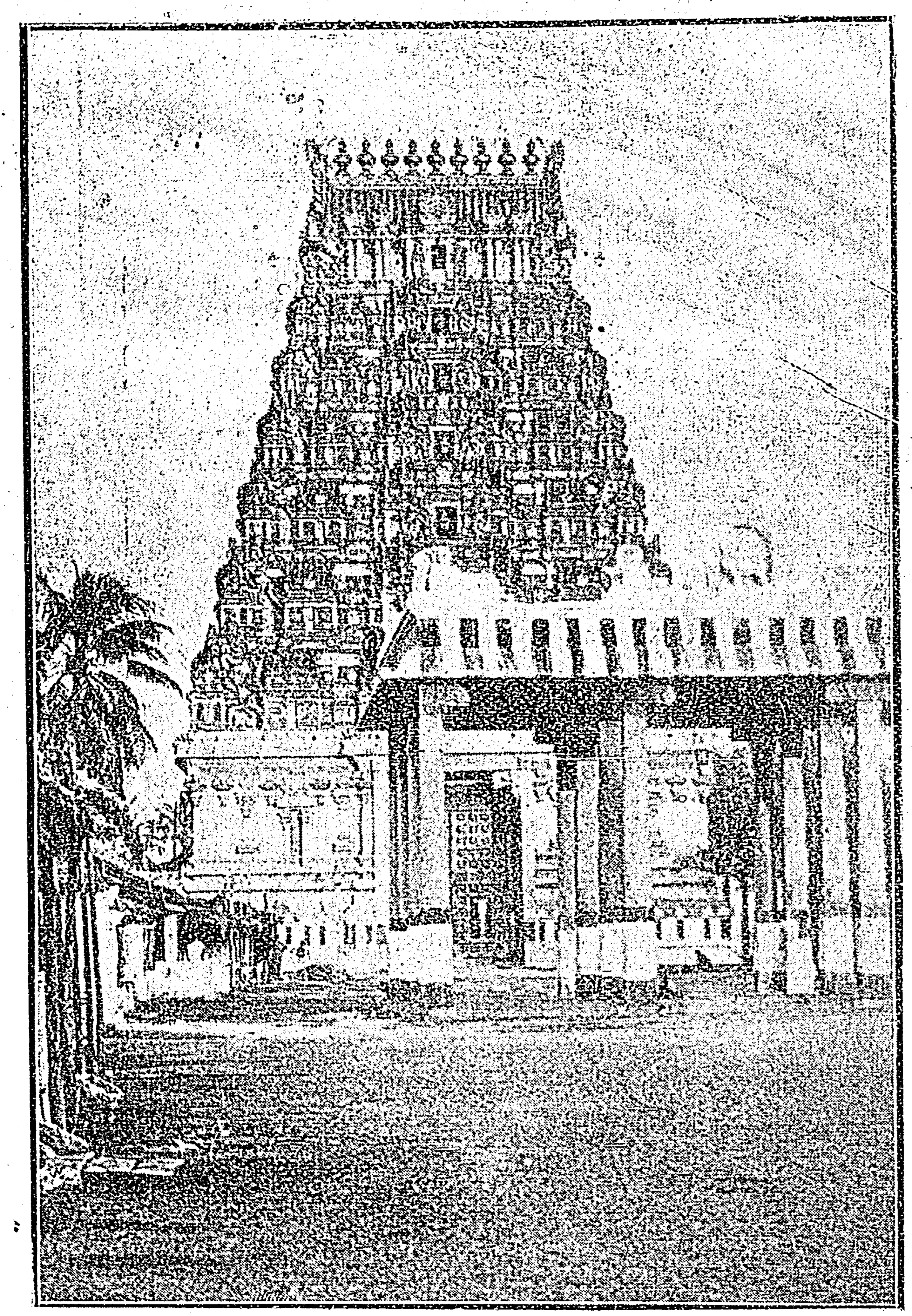

কবলেশ্বর মন্দির—মাইলাপুর

দক্ষিণী সঙ্গীত না কি অত্যন্ত scientific এবং দক্ষিণী গায়কেরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে বড়ই অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, Where ignorance is bliss it is folly to be wise। বিখ্যাত প্রফেসর আবদুল করিম খাঁ যে কর্ণাটী সঙ্গীত হুবহু আয়ত্ত করেছেন, এ কথা আমাকে একজন মস্ত দক্ষিণী সমালোচক বলেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণী কোনও গায়ককে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আয়ত্ত করতে শুনি নি—যদিও মহীশূরের বিখ্যাত গায়ক বিড়ার কৃষ্ণপ্পা মহোদয়কে সে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা কর্ত্তে যে দেখি নি এমন নয়।

দক্ষিণী গায়কেরা একটা জিনিষের বড়ই ভক্ত। তারা এক এক সময়ে এত দ্রুত “সার্গম” আলাপে মত্ত হয়ে ওঠে যে, বাস্তবিকই শুধু তার বিদ্যুদ্বেগ গতির জন্যই শ্রোতৃবৃন্দের রোমহর্ষণ হতে থাকে। মাঝে মাঝে যখন এ “সার্গম” আলাপ প্রায় মেল [illegible] বেগে পৌঁছয়, তখন দক্ষিণী শ্রোতৃবৃন্দের করতালিতে ঘর মুখর হয়ে ওঠে, ও তাতে উপলব্ধি করা যায় যে, হাওয়ার মধ্যে উৎসাহ জিনিষটির তাপ কতখানি।

তবে এখানে একটি কথা বলবার আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, সঙ্গীতের নিছক দ্রুতগতি অনেক সময়ে আমাদের [illegible] করে ফেল্‌লেও, এ মোহ সঙ্গীতের যথার্থ উপভোগ-জনিত আনন্দের ফল নয়। [illegible] একটু পরিষ্কার করে বলি। গানে জলদ গাওয়া বা বাজানোর দ্বারা পাঁচজনের চমক লাগানো যে যায় না তা নয়—বিশেষতঃ যদি অনভিজ্ঞকে নিয়ে কারবার হয়। তবে এ চমক লাগানোর মূল্য খুব বেশি [illegible] মনে হয় না। কারণ, সঙ্গীতে এ শ্রেণীর আনন্দ রস-গ্রহণের আনন্দ নয়, তার কঠিনতার দরুণ বিস্ময়ের আনন্দ মাত্র। অর্থাৎ দুরূহ কিছু দেখ্‌লে বা শুন্‌লে আমাদের মনে একটা স্বাভাবিক বিস্ময় আসে। তার ওপর ভাল সমালোচনার প্রাদুর্ভাব না থাকলে এরূপ মল্লযুদ্ধের প্রশংসা শুন্‌তে শুন্‌তে মনটা একটু hypno-tised হয়ে আসে ও সে মনে করে যে এরূপ মল্লযুদ্ধ বুঝি বা বড় আর্ট। যেখানে যথার্থ সমালোচনার অভাব, সেখানে ছোট জিনিষকে বড় করে দেখার মতন সহজ জিনিষ সংসারে অল্পই আছে। দক্ষিণীদের মধ্যে এই অদ্ভুত জলদ

গাওয়ার উৎসাহ দেখে, এ সত্যটি যেন আমি আরও বেশি করে উপলব্ধি করেছিলাম। দক্ষিণীরা এরূপ বিদ্যুদ্বেগে গাওয়ার দরুণ উত্তেজনাকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ বলে মনে করে থাকে। অথচ তাদের “সার্গম” আলাপের গতি সময়ে সময়ে এতই বেগবতী হয়ে ওঠে যে, তখন তার মধ্যে সুরের বালাই একেবারেই থাকে না। তবে যেখানে মানুষ perspective হারিয়ে বসে থাকে, সেখানে যথার্থ আর্ট যে কি তা তাকে বোঝানর চেষ্টা করার মতন বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। তাই দক্ষিণীরা মুসলমানী চালের গানের দাম দিতে একান্ত অক্ষম।

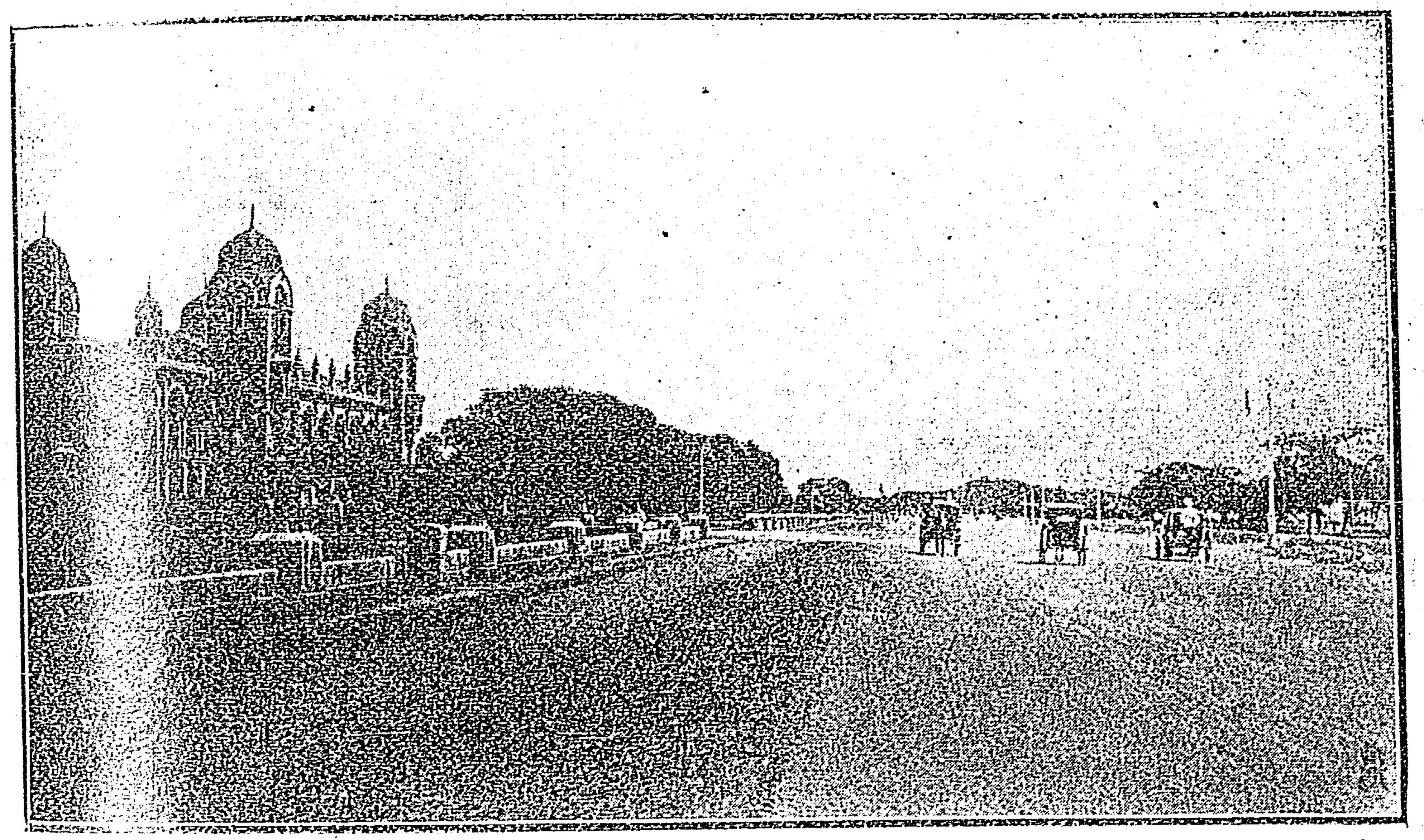

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়

বাস্তবিক কর্ণাটী সঙ্গীতে তালের উপদ্রব (অর্থাৎ জলদ গাওয়া) এত বেশি যে, সেটা বর্ণনা করে বোঝান সম্ভব নয়। এবং এ দ্রুত গাওয়ায় দক্ষিণীরা উন্নতির চরমসীমায় উঠেছে—“সার্গম” সাধনের বেলায়। একে কিন্তু বাস্তবিকই একটা অষ্টম বিস্ময় বল্‌লেও চলে। মানুষে যে কত দ্রুত সা রে গা মা পা ধা নি সা উল্‌টে পাল্‌টে বল্‌তে পারে, সেটাও যে একটা শোন্‌বার জিনিষ, তা যিনিই দক্ষিণী সার্গম আলাপ শুনেছেন, তিনিই জানেন। আমাদের হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব দক্ষিণী ওস্তাদদের অনেক নীচে। আমরা কখনই এ বিষয়ে দক্ষিণীদের সমকক্ষ হতে পারব না। কথাটা কি রকম জানেন? তিন সেকেণ্ডের মধ্যে যদি কাউকে অষ্টাদশ পুরাণ, ষড়দর্শন, ঊনবিংশতি সংহিতা ও চতুর্ব্বেদের নাম করে যেতে বলা হয়, তাহলে তাকে কিরূপ বিদ্যুদ্বেগে এ সব নাম জপ কর্ত্তে হয়, একবার ভেবে দেখুন। তবে যদি কেউ বলেন যে এটা অসম্ভব, তাহলে আমি তাঁকে একবার মাত্র মহীশূরের গায়ক বিড়ার কৃষ্ণপ্পা মহোদয়ের গান শুনে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে আস্‌তে বল্‌ব।

বিড়ার কৃষ্ণপ্পা মহাশয়ের গান আমি শুনেছিলাম মহীশূরে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ওখানে। এখানে কথা উঠ্‌তে পারে যে, বিড়ার কৃষ্ণপ্পার মতন বেখাপ্পা নামধারী লোক বড় গায়ক হতে পারেন কি না। কারণ এ সঙ্গত তর্ক উঠ্‌তে পারে যে, এও যদি সম্ভব হয়, তবে জগদম্বাও সুন্দরী হতে বা হিড়িম্ব-চন্দ্রও কবি বলে গণ্য হতে পারেন কি না। তবে এ গুরুতর গবেষণার ভার দার্শনিকদের হাতে ছেড়ে দিলে বলা যেতে পারে যে, “তথাপি” কৃষ্ণপ্পা মহোদয় মহীশূরে একজন বড় গায়ক বলে গণ্য। যাঁর সন্দেহ হয়, তিনি যেন একবার মাত্র তাঁর সার্গম আলাপ শুনে আসেন।

কর্ণাটী সঙ্গীত অনেকটা মুসলমান প্রভাব হ'তে মুক্ত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তা নয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মুসলমানের দান খুবই বেশি। ফলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢঙের মধ্যে এমন একটা সমৃদ্ধ রস মেলে, যেটা কর্ণাটী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একেবারেই মেলে না। যাঁরা সঙ্গীতে পুরাতনপন্থী—এ সত্যটি তাঁদের অনুধাবনীয়। সঙ্গীতের—শুধু সঙ্গীতের কেন, সব ললিতকলারই—প্রাণ হচ্ছে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের জীবনের

অভিজ্ঞতার উপর। কোনও বিদেশী সভ্যতার অভিঘাত মানুষের একটা বড় অভিজ্ঞতা। তাই যদি এই অভিজ্ঞতাটা একটা মহনীয় অভিজ্ঞতা হয় তবে তার ফল ললিতকলার উপরে না হয়েই পারে না। যেমন ইতিহাসে দেখি, ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল; গ্রীক স্থাপত্য রোমান স্থাপত্যকে গড়ে তুলেছিল; ইতালীর Renaissanceএর চিত্রকলা সমগ্র য়ুরোপের চিত্রকলার উপর তার ছায়া ফেলেছিল; ফরাসীবিপ্লবের সাম্যনীতি তখনকার প্রায় সমস্ত জগতের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল; ইত্যাদি ইত্যাদি। এক সভ্যতার অপর সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করাটা শুধু যে অস্বাভাবিক নয় তাই নয়—বাঞ্ছনীয়। তবে এ সব ক্ষেত্রে বিপদ হচ্ছে বিদেশী সভ্যতার মধ্যে ভাল জিনিষটার আমদানীর মধ্যে নয়, বিপদ হচ্ছে অন্ধ অনুকরণে। আসল্ কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশীর দান হতে সত্য সত্য লাভ কর্ত্তে হলে, সেটাকে অনেকটা আমাদের স্বীয় সভ্যতার ও বিকাশধারার উপযোগী করে নিতে হবে, যাতে সে দানটা একটা বাইরের দান মাত্রে পর্য্যবসিত না হয়; অর্থাৎ যাতে সে দানকে আমরা নিজস্ব করে নিতে পারি। মুসলমানেরা আমাদের মধ্যে ছিল। সুতরাং আমাদের সঙ্গীতে তাদের দানের মধ্যে মৌলিকতা থাকলেও কৃত্রিমতা নেই। একটা স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্তির গরিমায় সে গরীয়ান্। এ কথার প্রমাণ মেলে—তানসেনের সৃষ্ট দরবারী কানাড়া, আড়ানা, মিঞামল্লার প্রভৃতি নূতন রাগ সংমিশ্রণে;

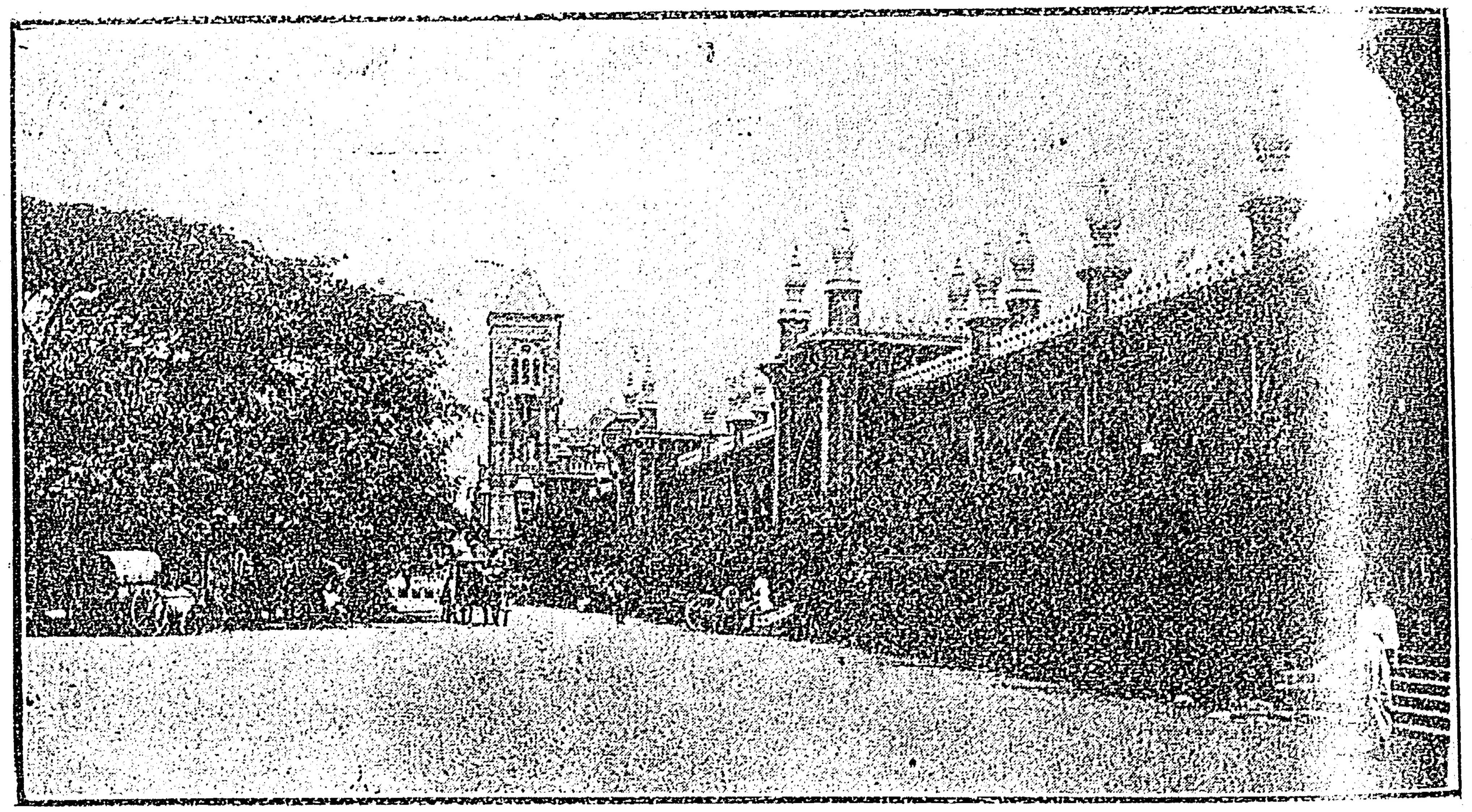

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হল—মান্দ্রাজ

এ কথার প্রমাণ মেলে—আমীর খসরু, সদারঙ্গ প্রমুখ স্রষ্টাদের খেয়ালে; এ কথার প্রমাণ মেলে—শোরী হম্‌দম প্রমুখ গুণীদের টপ্পা ঠুংরী সৃজনে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক কর্ণাটী সঙ্গীতাভিমানীকেই তাঁদের রাগের বা "মেলকর্ত্তা"র বিশুদ্ধতা নিয়েই মত্ত থাকতে দেখা যায়। সংসারে সব জিনিষকেই একটা fetish করা যায়, যেমন দক্ষিণী রাগরাগিণীর ঠাটের বা "মেলকর্ত্তার" বিশুদ্ধতা কর্ণাটী সঙ্গীতরসিকদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন হয়েছে যে, মহীশূরের একজন বুদ্ধিমান সঙ্গীতজ্ঞও * অম্লান বদনে লিখে গেছেন যে, কোনও রাগে দুই মধ্যম (যেমন বেহাগ বা পূরবীতে) বা দুই গান্ধার (যেমন সিন্ধু বা জয়জয়ন্তীতে) বা দুই নিখাদ (যেমন দেশ বা খাম্বাজে) ব্যবহার করা নীতিবিগর্হিত, কর্ণাটী সঙ্গীতে এরূপ প্রয়োগ বিষবৎ পরিত্যজ্য ও সেইটেই আদর্শ হওয়া উচিত; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বেহাগ, খাম্বাজ, পূরবী, সিন্ধু, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগিণীর সঙ্গে যাঁর সামান্য পরিচয়ও আছে তিনিই জানেন, এ কথা কত অশ্রদ্ধেয়। যেহেতু দুই গান্ধার মধ্যম বা নিখাদ ব্যবহার করে এ রাগিণীগুলির সৌন্দর্য্য যে কতখানি বেড়ে গেছে, সে কথা সঙ্গীতজ্ঞের কাছে অগোচর থাকতেই পারে না। ইংরাজীতে একটা প্রবচন

* Krishna Roo.........Psychology of music.

আছে:—"The proof of the pudding lies in the eating." এখন যদি কেউ বলেন যে, যেহেতু এ তরকারীটিতে আদার রস বা গোলমরিচ দেওয়া হয়েছে, সেহেতু এটা খেতে যত চমৎকারই হোক না কেন, আসলে অশাস্ত্রীয় তরকারী তৈরি হয়েছে, তাহলে কথাটা কেমন শোনায়? এরূপ যুক্তিপ্রয়োগের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, যদি আমার কাঠের বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে, তবে জন্ম জন্ম বেঁচে থাকুক আমার কাঠের বেড়াল।

বাঙ্গালোরে আয়প্পা বলে এক ভদ্রলোকের বেহালা শুনেছিলাম, ও মহীশূরে দেবেন্দ্রপ্পা বলে এক ভদ্রলোকের জলতরঙ্গ শোনা গিয়েছিল। মান্দ্রাজীদের "প্পা"ন্তনামধারী গুণীদের বাজনার মধ্যে নৈপুণ্য যেন একটু বেশি রকমের। বিশেষতঃ বেহালায় এত দক্ষ বাদক বোধ হয় ভারতে আর নেই। তবে আমার দুঃখ হ'ত যে, এত শ্রমস্বীকার করে বেহালা না শিখে, এঁরা যদি কোনও উৎকৃষ্ট ভারতীয় যন্ত্র শিখতেন! কারণ বেহালায় আমরা যতই কেন না ভাল বাজাই, য়ুরোপীয় বাদকের সমকক্ষ হ'তে কখন পারব না। তারা বেহালা থেকে যে জলদ-গম্ভীর উদাত্ত স্বর বাহির কর্ত্তে পারে, সে রকম আর্ত্ত স্বর আমি কোনও ভারতীয়ের বেহালায় কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না। য়ুরোপে Kreisler, Hubermann, Mischa Elman, Veschry, প্রভৃতির মনোমুগ্ধকারী বাজনা যিনি শোনেন নি, তিনি বুঝবেন না আমি কেন ভারতীয়ের বেহালা বাজনার বিপক্ষে। এক যদি আমরা আশৈশব য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে বেহালা শিখি তাহলে হয়। কিন্তু তাহলে আবার উল্‌টো বিপদ এই হয়ে পড়ে যে, আমরা সঙ্গীতে আমাদের বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেল্‌ব, যেমন জাপানের ক্ষেত্রে হয়েছে। জাপানে public concert হয় য়ুরোপীয় সঙ্গীতের উপরে। জাপানীরা বাজায় য়ুরোপীয় যন্ত্র ও আলোচনা করে য়ুরোপীয় সঙ্গীত। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রসগ্রাহী হওয়ার আমি বিরোধী নই, কিন্তু আগে আমাদের সঙ্গীতের রসজ্ঞ হ'তে হবে। নৈলে আমার মনে হয় সবই বৃথা। কারণ বিদেশী সঙ্গীতে আমরা স্থায়ী সৃষ্টি কর্ত্তে পারব, এ ভরসা খুবই কম। লাভের মধ্যে হবে এই যে, আমাদের বৈশিষ্ট্যটি আমরা হারিয়ে দেউলে হয়ে বসে থাকব। মহীশূর সহরে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের আতিথ্যে তাঁর সঙ্গে খুব গল্পালাপে কাটানো গিয়েছিল। এমন জ্ঞান-পিপাসু লোক আমি সত্যিই কম দেখেছি। আমাদের শিক্ষিত সমাজ জ্ঞানের সঞ্চয়ের দিকে বড় মনোযোগী বলে মনে হয় না। সাধারণ বি-এ, এম-এর ক্ষেত্রে "কিঞ্চিৎ পঠনং চাকুরীর কারণম্" খানিকটা বোঝা যায়; কিন্তু যখন অধ্যাপকদেরও অবসর সময়টা প্রায়শঃই ব্রিজ বা পাশা বা বিলিয়ার্ড খেলে কাটাতে দেখি, তখন মনে আক্ষেপ না হয়েই পারে না। ছাত্রের মনে জ্ঞানের পিপাসা জন্মিয়ে দিতে পারে কেবল সেই, যার নিজের কাছে ও পিপাসাটি সত্য হয়ে উঠেছে। অধ্যাপকের প্রধান

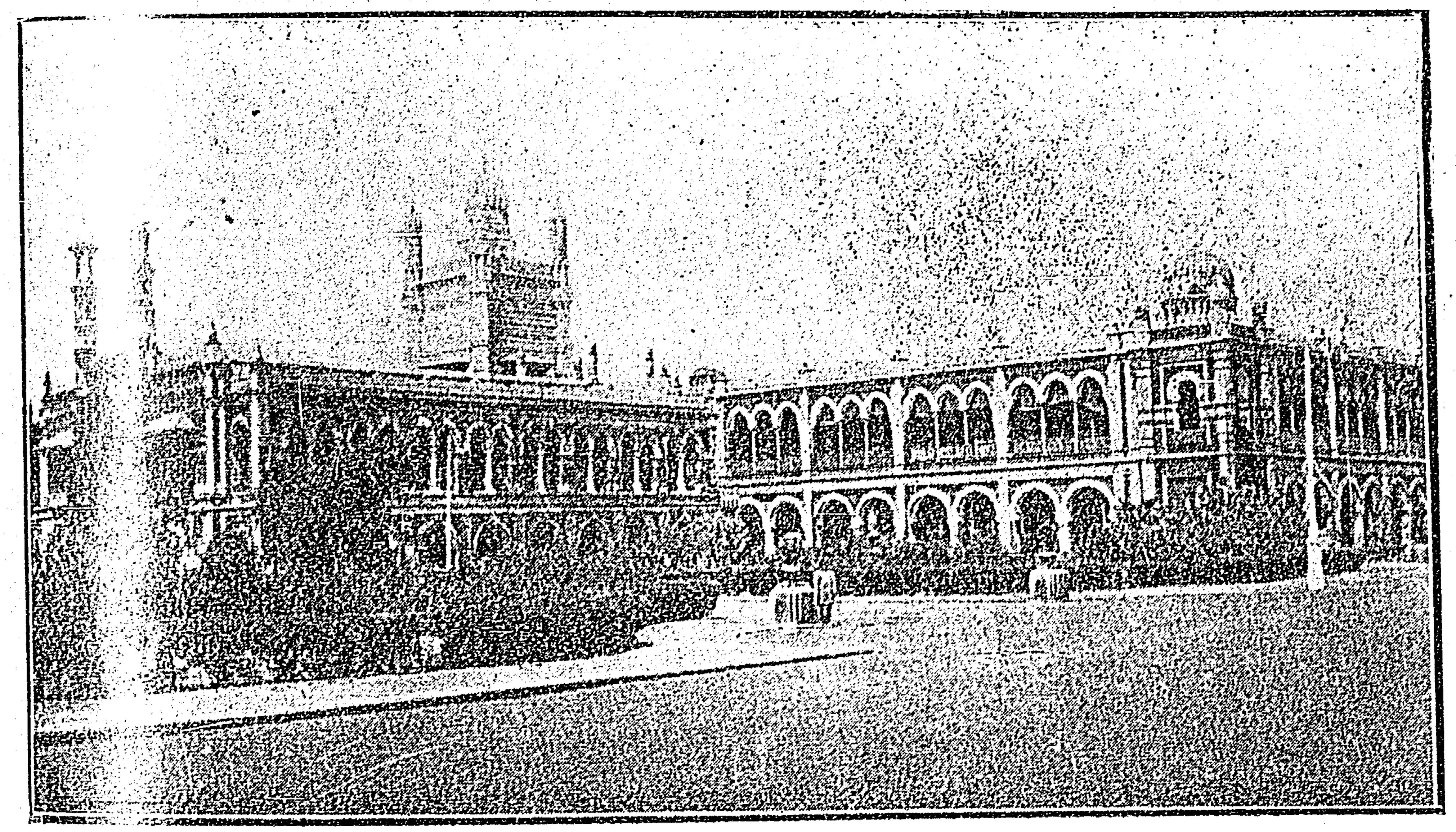

মান্দ্রাজ—চেপুক প্রাসাদ

কাজ ছাত্রদের নানান suggestion দেওয়া যাতে তাদের মনের সত্যানুসন্ধিৎসা বা চিন্তাশীলতার অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু যে অধ্যাপকের মধ্যে এ জ্ঞানস্পৃহা ব্রিজ, বাজে গল্পালাপ প্রভৃতির চাপে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে, সে অপরের মনে এ বীজ বপন কর্ব্বে কেমন করে! যার কিছু নেই, সে যে কিছু দিতে অক্ষম, এ কথাটা বলা বাহুল্য হ'লেও, অস্মদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা অনেক ক্ষেত্রেই এ সাদা কথাটিও উপলব্ধি করেন না। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ন্যায় অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে আমাদের সাধারণ অধ্যাপকদের মধ্যে জ্ঞান সম্বন্ধে ঔদাসীন্য যেন বেশি করেই আমার চোখে পড়েছিল। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব কোন্ খানে—এ প্রশ্ন করলে হয়ত অনেকেই উত্তর দেবেন—তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এইটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পৎ নয়। তাঁর প্রধান মহত্ত্ব হচ্ছে, জ্ঞানরাজ্যের ঐশ্বর্য্য যে কি বস্তু, সে সম্বন্ধে অপরকে তিনি অতি সহজে সচেতন করে তুল্‌তে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় শিখ্‌বার আছে অজস্র—তবে দুঃখ এই যে, তাঁর মর্য্যাদা বোঝবার লোক মহীশূরে নেই বল্লেই হয়। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথের স্থান কলিকাতা—পাণ্ডববর্জ্জিত মহীশূর দেশ নয়।

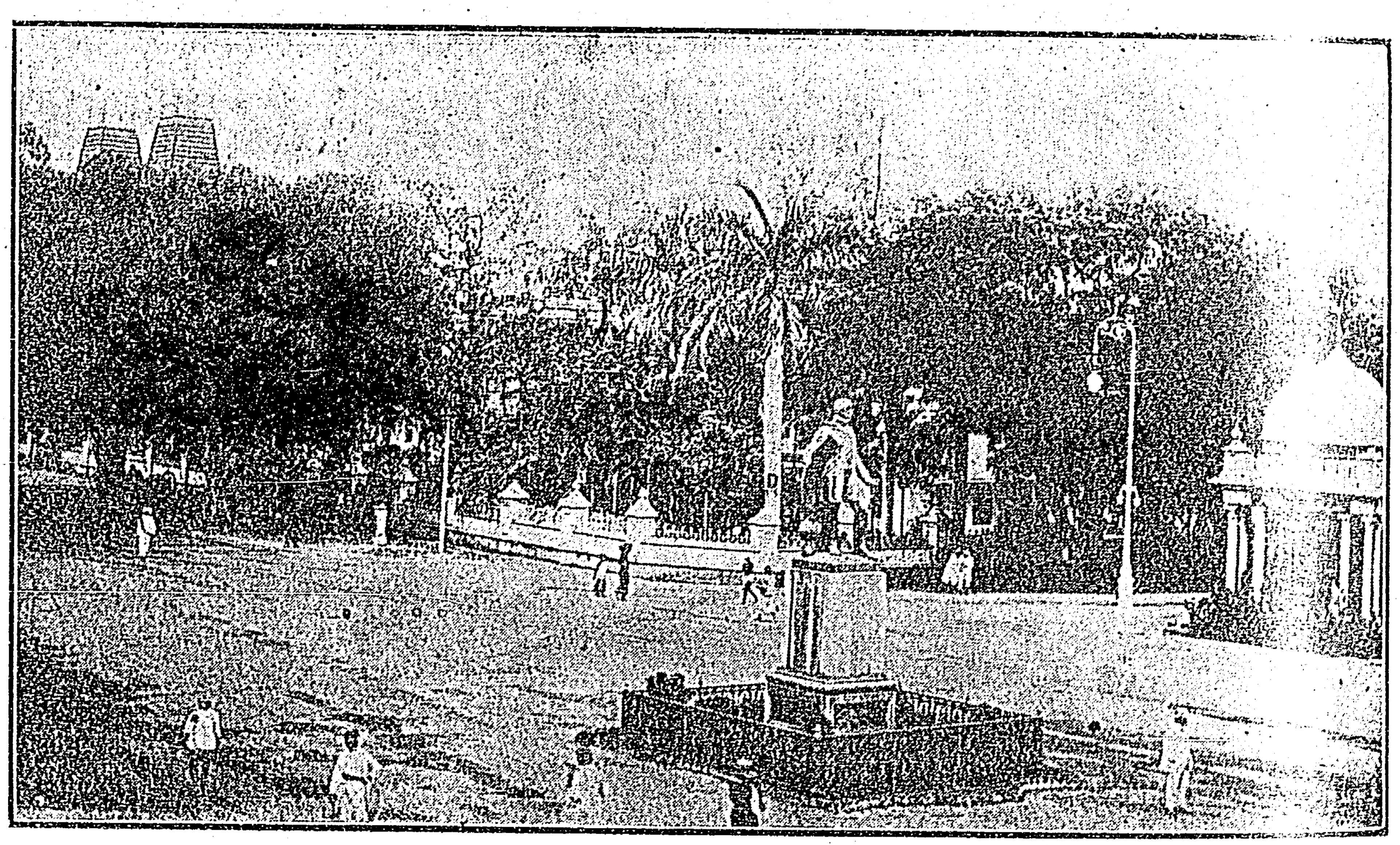

সেনাপতি নীলের প্রতিমূর্ত্তি

মান্দ্রাজ সহরটি বেশ লেগেছিল। অথচ সমুদ্রই মান্দ্রাজের প্রধান শোভা। মান্দ্রাজের সমুদ্র সৌন্দর্য্যে পুরীর সমুদ্রের চেয়ে হীন নয়। এবং বোম্বায়ের সমুদ্রের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। সমুদ্র যদি পুষ্করিণীর মতন শান্ত হয়, তবে তার একটা আলাদা শোভা থাকলেও, সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোলই যদি না রইল, তবে আর তাকে বোধ হয় সমুদ্র নামে অভিহিত না করাই ভাল।

মান্দ্রাজে Theosophical societyর হর্ম্ম্যাবলী ও সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাগান একেবারে সমুদ্রের ধারে। এক দিন সেখানে চাঁদিনী রাতে নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া গিয়েছিল। নানাজাতীয় য়ুরোপীয় নরনারী সমুদ্রতটে bonfire কর্ছিল ও কেক আদি ভক্ষণ করতঃ পার্থিব ও অপার্থিব আনন্দের এক মনোজ্ঞ সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় নিরত ছিল। আমরা সে দলে মিশে গেলাম। বিভিন্ন য়ুরোপীয় জাতির জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হ'ল। ভারতীয় সঙ্গীতও হ'ল। সব জড়িয়ে সেদিনকার রাতের স্মৃতিটি বড় মধুর হয়ে উঠেছিল। একদিকে প্রকৃতির উদার শোভা, চাঁদিনী রাত, সমুদ্রের ঊর্ম্মিরাশির অশ্রান্ত কল্লোল ও খেলাধূলা, অপরদিকে নানা জাতীয় নরনারীর জাতি-অভিমান ত্যাগ করে একত্র মেলামেশা! বড় সুন্দর লেগেছিল। ঘটনাটি দৃশ্যতঃ অকিঞ্চিৎকর বটে, কিন্তু আমাদের মনের উপর কোন্ ছোট্ট ঘটনাটি যে কোন্ অজ্ঞাত নিয়মে একটা প্রগাঢ় ছাপ এঁকে দিয়ে চলে যায়, তা কে বলবে?

মান্দ্রাজে এক দিন এক বড় সঙ্গীত-সমালোচক আমাকে এক সঙ্গীতের আসরে নিয়ে গেলেন। সেখানে

সেই চির একঘেয়ে কর্ণাটী সঙ্গীতের আস্ফালন সেই চির-পরিচিত ভাবে মনকে চির-অবসাদময় ক্লান্তিরসে অভিভূত করে ফেলেছিল মনে আছে। অথচ সে আসরে সকলেই যে কর্ণাটী সঙ্গীতের সেই তাল নিয়ে মারামারি উপভোগ কর্ছিল, সে বিষয়ে কোনও দর্শক বা শ্রোতারই সন্দেহের স্থান ছিল না। মনে হয়েছিল "O Muse! thou hast fled from Southern Ind!"

মনের সেই অবসন্ন অবস্থায় যখন বিখ্যাত আবদুল করিম খাঁর গান মান্দ্রাজে প্রথম শুনি, তখন মনে হয়েছিল যে, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" কথাটি সত্য বটে। আবদুল করিম খাঁ একটি দরবারী কানাড়া ও একটি ভৈরবী আলাপেই সন্ধ্যা শেষ করে দিলেন—কিন্তু আশ আমাদের মিট্‌ল না। করিম খাঁর জলদ তানের মধ্যে মাঝে মাঝে অতিচার-দোষ থাকলেও, তাঁর মতন প্রশান্ত আলাপ আমি জীবনে কখনও শুনিনি। তবে তাঁর আলাপের ঢং এতই সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ভরা যে, সঙ্গীতে techniqueটা একটু ভাল করে না জানলে, সে গানের মর্ম্ম বোঝা প্রায় অসম্ভব। তার আর একটা কারণ এই যে, আবদুল করিমের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য খুব বেশি নয়—যদিও তা কর্কশ নয়, মোটের উপর মিষ্টই বলা যেতে পারে। কিন্তু গানে সাধারণ্যে সর্ব্বাগ্রে দেখে কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতা; কারণ, শিক্ষা অভাবে এই গুণটিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সহজে বোঝা যায়। সুতরাং আবদুল করিমের গান অত উচ্চশ্রেণীর হ'লেও লোকপ্রিয় হবার মতন জিনিষ নয়। তবে হিন্দুস্থানী আলাপের রস যে বোঝে, সে আবদুল করিম খাঁর অসাধারণ বৈচিত্র্য, উৎকৃষ্ট ঢং ও বিশুদ্ধ সুরের গুণে মুগ্ধ না হ'য়েই পারবে না, এ কথা বোধ হয় অনেকটা ভরসার সঙ্গেই বলা যেতে পারে। মুসলমানী ঢং কোথায় হিন্দু গায়কের ঢং এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার নিদর্শন দিতে পারেন এক আবদুল করিম খাঁর শ্রেণীর দুচারজন গুণী।

মান্দ্রাজে বীণাধন বলে একটি বৃদ্ধা গায়িকা ও বীণা-বাদিকা আছেন। তাঁর খুব নাম শুনে তাঁর গানবাজনা শুন্‌তে গেলাম। গান ভাল লাগ্‌ল না, কিন্তু বীণা মন্দ বাজালেন না। তবে মুস্কিল হ'ল এই যে শেষণের মতন অসাধারণ প্রতিভার কলাকারুর পর আর কারুর বীণাতেই হৃদয় মন ভরে ওঠে না। শেষণের প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত অনেকে বীণা ধনকে বড় করে থাকেন; কিন্তু আমার মনে হল যে, শেষণের সঙ্গে অন্য কারুর এক নিঃশ্বাসে গান করাও শেষণের পক্ষে অপমানজনক। কারণ, শেষণকে দক্ষিণী বাজিয়েদের মধ্যে ব্যতিক্রম বলে মনে করা যেতে পারে।* কেন না, তিনি হিন্দুস্থানী সুরও যেমন বাজান, কর্ণাটী সুরও তেম্‌নি অমৃতময় হাতে বাজিয়ে থাকেন। অভ্রভেদী প্রতিভার সঙ্গে সামান্য শ্রমশীল শিল্পীর তুলনা হয় না।

---

* শেষণকে দক্ষিণী গাইয়ে বাজিয়েদের মধ্যে ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য করার কারণ এই যে শেষণ কর্ণাটী সঙ্গীতেই ওস্তাদ হ'লেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ও রাগালাপের ঢঙ্‌ও আয়ত্ত করেছেন। তাঁর মিড় ঠিক উজীর খাঁর মতন অত সুন্দর না হ'লেও বেশ পরিষ্কার হিন্দুস্থানী চালের। তাঁর বেহাগ দরবারী কানাড়া ভৈরবী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী রাগের আলাপ যিনিই শুনেছেন তিনিই আমার এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি কর্ব্বেন।

নির্দ্দোষিণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সেদিন ভোরে
পড়ছে যখন ঝরে
ঝিক্‌মিকিয়ে হীরে মতির তাল,
ফাঁসিয়ে দিয়ে সারা রাতের
বিনিয়ে-বোনা কালো তাঁতের
তিমির-ঘেরা জাল ;
আগুন লেগে পূবে—
লাল্‌চে আভায় দুনিয়াটাকে দিচ্ছে যখন ডুবে,
রাঙা রংয়ের রাংতা-মোড়া আকাশখানা চিরে
জৌলুসে কার জড়োয়া-জরীর হাজার হাজার তীরে
ঠিক্‌রে ওঠে মণি রতন মাণিক্‌ !
আঁধার শুধু খানিক
আট্‌কে ছিল দুয়ার আঁটা ঘরের কোণে মোর,
জড়িয়ে দুটী চোখের পাতা ছড়িয়ে ছিল অঙ্গ ছেয়ে অগাধ ঘুমের ঘোর !
স্বপ্নাহত সুপ্ত-কাতর আঁখি,
দেখ্‌ছে যেন কোন্‌ জটায়ু গরুড় হেন পাখী
হঠাৎ আমার ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গায়
আঁচ্‌ড়ে ন'খের ঘায়
ঝড়ের মতো উড়িয়ে দুটো প্রকাণ্ড তার ডানা
বুকের ওপর দিচ্ছে চেপে হানা,
ক্ষ্যাপার মতো ঠুক্‌রে বেঁধে ঠোঁটে !
ব্যাপার দেখে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে,
ভয়ে আমার প্রাণ ;
চেঁচিয়ে যতই চাইছি পরিত্রাণ,
সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে
গলাটা কে বিষম জোরে
ধ'র্‌ছে যেন চেপে !
সর্ব্ব শরীর থর্‌থরিয়ে উঠছে ঘন কেঁপে !

* * *

এমন সময় পত্নী আমার, ঘরের ভিতর এসে
বল্‌লে যেন হেসে,
চিবুক ধ'রে নেড়ে
"আজ বুঝি গা, উঠ্‌বে না আর বিছ্‌নাটাকে ছেড়ে ?
চেয়ে দেখনা চক্ষু মেলে ঢের হ'য়েছে বেলা,
বাইরে কে যে, ডাক্‌ছে তোমায়, দিচ্ছে দোরে ঠেলা ;
উঠে একবার যাওনা নিচেয় দেখে এসনা নেমে—
এ কি গো ! ইস্‌ ! এ যে দেখ্‌ছি নেয়ে উঠেছো ঘেমে !
আচম্‌কা শিউরে কেন উঠ্‌লে এমন হ্যাঁগা ! ভয় পেয়েছো বুঝি ?
রোসো, রোসো, পাখাখানা রাখ্‌লে কোথায় খুঁজি,"
বল্‌তে বল্‌তে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে নিলে ঘাম
ঠুন্‌ ঠুন্‌ ঠুন্‌ বাজিয়ে কাঁকণ শ্রবণ-অভিরাম ;
হাতপাখাটা উঠ্‌লো ন'ড়ে জোরে—
মুক্ত হ'য়ে দুঃস্বপ্নের বিষম ঘূর্ণীপাক্‌ জেগে উঠ্‌লেম শান্ত শীতল ভোরে !

২

বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিল ভাড়াটে এক গাড়ী ;
দোর খুলতেই নেমে এসে ঢুক্‌লো যেন বাড়ী
আমার মেয়ে 'মেনা' ;
ঘুমভাঙা-চোখ, দৃষ্টি আবিল, গেল না ঠিক চেনা !
প্রিয়ার আমার নারী-চিত্ত চির-কৌতূহলী,
বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ীটা কার কাঁপিয়ে এলো গলি,
দেখ্‌ছিলেন তা উঁকি মেরে খড়-খড়ির এক পাখীর ফাঁকে,
চিন্‌তে পেরে জামাই বাড়ীর পুরোণো ঝী—'বিধুর মা'কে,
দুড়্‌-দুড়িয়ে দৌড়ে এসে নিচেয় হাসিমুখে—
তুলে নিলেন মেয়েকে তাঁর স্নেহব্যাকুল বিহ্বল বুকে !
আমি অবাক্‌ ! এমন সময় 'মেনা' কেন হঠাৎ এলো—?
বে'ই তো সেদিন স্পষ্ট আমার মুখের ওপর বলেছেলো,
'একটী বছর আর
বৌ'কে এখন পাঠাবেন না বাপের বাড়ী তার।'
অপমানের সেই আঘাতে বুকটা আমার আজও আছে জোড়ে
বিয়ের পরে যেদিন প্রথম আন্‌তে গেছ্‌লেম আমি মেয়ে জামাই জোড়ে
আছে যেমন প্রথা ;—
শাশুড়ী তার সেদিন আমায় ইতর নারীর মতো শুনিয়েছিল অনেক কড়া-কথা !
আমি নাকি ঠকিয়ে তাঁদের গলায় নেহাৎ গছিয়ে দিছি
আধ-ধেড়ে এক বুড়ো মেয়ে ভাঁড়িয়ে বয়েস মিছিমিছি !

এম্‌নি তাঁদের রোক্—
তার পরেতে যতবারই পাঠিয়েছিলেম লোক,
মেনার মায়ের মুখের পানে চেয়ে—
হাঁকিয়ে দেছেন কেবল তাঁরা, পাঠান্‌নি-কো মেয়ে !
তবে কেন আজকে আবার যেচে সকাল-বেলা—খবর কিছু নেই,
মেয়েটাকে হঠাৎ এমন পাঠিয়ে দিলেন বে'ই ?
কারণটা কি এই করুণার ভেবে দেখি যত,
মাথায় ক্রমাগত, আস্‌তে লাগলো তত—
অমঙ্গলের দুঃসংবাদগুলো !
মেনা যখন প্রণাম করে নিচ্ছে পায়ের ধূলো,
ব্যস্ত হোয়ে জিগেস্ করলেম "কেমন আছিস মেনি ? খবর কি মা তোর ?
হঠাৎ যে আজ তোকে তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন বড়, রাত না হ'তে ভোর ?"
কথা নেইকো মেয়ের মুখে, বল্‌লেনা সে কিছু,
দোষীর মতো দাঁড়িয়ে রইল ঘাড়টি ক'রে নীচু !
সঙ্গে ছিল 'বিধুর মা' তার শ্বশুরবাড়ার ঝী
তাকে যখন জিগেস ক'রলেম "ব্যাপারখানা কি ?"—
ঝী-মাগী তার আঁচলটাকে তাড়াতাড়ি তুলে,
দুম্‌ড়ে মোড়া চিঠি একখান্ দিলে আমায় খুলে।
বল্‌লে "তাঁরা নিকে দেচেন প'ড়ে দেখুন এই—"
লিখ্‌ছেন দেখি বে'ই,
—"ছিছি, আমি জান্‌তেম নাকো আজও,
ভদ্রলোকে ক'রে এমন কাজও
আপনার মতো এমনতর ইতর,
কেমন ক'রে জন্মেছে এই উচ্চবর্ণের জাতের ভিতর ?
কন্যা আপনার অন্তঃসত্ত্বা জান্‌তেন যখন সে'টা,—
ভদ্রলোকের নাম ডোবাতে নাইবা দিতেন বে'টা !
এই কি উচিত, হিঁদুর যোগ্য কাজ ?
ভাগ্যে এটা ধরা পড়েছে বিয়ের ক'মাস পরেই, তাইতো আমি র'ক্ষে পেলেম আজ
জান্‌বেন আপনি, আমার ছেলে—আজ থেকে আর আপনার জামাই নয়,
দীনুঘোষের পুত্র-বধূ, এই বলে আর ভবিষ্যতে, দেবেন নাকো মেয়ের পরিচয় !
কৌমারে যে কলঙ্কিনী কালি দিয়েছে পিতৃকুলে তার,
সৌকালীনে—সে কুলটার স্থান হবেনা আর ;
চাপা দিতে মেয়ের পাপ চাপিয়েছিলেন চুপি চুপি বিবাহের এই ফাঁকে,
ঘোষবংশে তাকে,
মান ইজ্জৎ যা কিছু সব ডুবিয়ে দিতে আমার,
ছিছি, আপনি এমনিধারা চামার।

ভেবেছিলেন ব্যাপারটা আর পাবেনা কেউ টের ;
আমার ওসব জানা আছে ঢের,
পাপ কখন চাপা থাকে, দেখে নেবেন ঠিক্—এ কলঙ্ক সহরজুড়ে শীঘ্র যাবে রটে—"
এই পর্য্যন্ত পড়েই আমার পিত্তি গেল চটে।
রাগের মাথায় চিঠিখানা মুড়ে
ফেলে দিলুম ছুঁড়ে ;
ব'ল্‌লুম বিষম হেঁকে
ঝী-মাগীকে ডেকে
"এ সব নিছক্ মিছে কথা আগাগোড়াই বাজে,
খাট্‌বে নাকো কাজে,
এলিস্ গিয়ে দীনুঘোষকে আদালত সব খোলা,
চল্‌বেনা তার বেহদ্দ সব কেচ্ছা বানিয়ে তোলা।
ছোট লোক সে, ছুঁচো, পাজি,—
মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেবার করেছে এই ফন্দীবাজি।"
ঝী বললে "আমায় ব'কে ফল কি বলুন বাবু, মিছে কেন লোক করবেন জ'ড়,
আমরা দাসী, গরীব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই, বড় ঘরের বড় কথায় কাণ দিইনে বড় ;
মনিব আমায় হুকুম দিলেন, নিয়ে এলুম তাই, আমার এতে দোষটা বলুন কি ?
আমি তাঁদের মাইনে-করা ঝী,
যখন যেমন হুকুম দেবেন করতে হবে তাই।
আসি তবে মা'ঠাকরুণ, পেন্নাম হই বাবু, বৌঠাকরুণ আমি এখন যাই।"

* * * *

চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে ফের, মেনার দিকে দেখ্‌লেম যখন চেয়ে,
ফুঁপিয়ে তখন কাঁদছে কেবল মেয়ে
আঁচলে তার মুখখানাকে ঢেকে ;
অবাক হ'য়ে জননী তার দাঁড়িয়ে আছে কাছে ; ব'ললেম তাকে ডেকে—
"মেয়েটাকে তুলে নে'যাও ঘরে,
যা হয় ওর বিহিত একটা করবো আমি পরে।"

৩

এক হপ্তাও কাট্‌লো নাকো পাড়ায় একটা সাড়া দিয়ে উঠলো টিটিক্কার্,
কানাঘুষো চুপি চুপি, চলতে লাগলো চতুর্দ্দিকে ;—কখনও বা প্রকাশ্যে ধিক্কার !
বিশেষ আমার আত্মীয়রা এসে বাড়ী ব'য়ে
অপমানের যে সব কথা নির্ব্বিচারে যেতে লাগলেন ক'য়ে,
শক্ত বড় সে সব স'য়ে থাকা ;
ভাবতে লাগ্‌লেম মেয়েটাকে উচিত কিনা বাড়ীতে আর রাখা !
সবার মুখেই এক কথা ঐ—'ওমা—ছিছি—বিয়ের আগে—'
শুনে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলে উঠ্‌তো বিষম রাগে ;

নির্ল্লজ্জা অনেক নারী ব'স্‌তো আবার হিসেব করতে মাস !
হা'ভগবান ! এ সমাজেও মানুষ করে বাস ?
মেয়ে আমার সারাদিনটাই লুকিয়ে থাকে ঘরে, মুখ দেখায় না আর—
বাল্যসখী খেলার সাথী তার
ছিল যারা,
আজকে ঘৃণায় তারা
ত্যাগ ক'রেছে সঙ্গিনাকে সব ;
মেয়ে আমার এই ব্যথাটায় প্রাণের ভিতর তার কী যাতনাই ক'রছে অনুভব !
অবস্থা তার এই অসহায়
নিত্য আমায়
ক'রতে লাগলো বড়ই যেন কাতর,
কিন্তু মেনার মায়ের আমি একটা দিনের তরেও দেখলেম নাকো কোনই ভাবান্তর ;
আমাকেই সে উল্টে ক'দিন থেকে
বিষণ্ণ আর শুষ্ক মলিন দেখে
ব'ল্‌লে একদিন—"হ্যাগা তোমার আঁধার কেন মুখ ?"
উদাসভাবে ব'ল্‌লেম শুধু—"মনটাতে নেই সুখ !"
স্ত্রী বললেন "মেয়ের কথা দিবারাত্র তুমি ভাবছো কেবল বুঝি ?
ভাবনা কিসের, আমাদের ঐ একটা মাত্র মেয়েই যখন পুঁজি ?
ভয় পাচ্ছ, তোমায় আমায় ঠেলবে সবাই জাতে ?
ঠেলুকনা সে ভালোই হবে, ক্ষতি কি আর তাতে ?
অনেক বাড়ীই এমন হয়, দেখেনা কেউ চেয়ে
ছেলের বেলা দোষ ধরেনা—শাস্তিটা পায় কেবল মেয়ে !
যৌবনের এই জোয়ার লেগে
স্রোতের বেগে
যে সব কাঁচা ছেলে
শাস্ত্র-শাসন, পুঁথির বিধান, হিঁদুর ধর্ম্ম ঠেলে,
জীবন-পথে নিত্য ক'রে ভুল
তাদের তো বেশ বজায় থাকে মান-সম্ভ্রম-কুল ?
সমাজে তো হয় না জাতে ঠ্যালা ?
বিচার বুঝি শুধুই কেবল মেয়েমানুষের বেলা,
সাবিত্রী কি সীতা ?—
আর—পতিরা সব চিরদিনই নারীর পরমগুরু জারজ-শিশুর হ'লেও গোপন-পিতা ?
নারী যদি জীবনে তার হঠাৎ করে ভুল, প্রবঞ্চকের প্রলোভনে প'ড়ে,
সুযোগ তাকে দাওনা তোমরা একটীবারও আর জীবনটাকে নিতে আবার গ'ড়ে !
রক্তমাংসে গড়া মানুষ সেও তো সবার মতো ।
তার জীবনেও প্রাণের সাড়া হর্ষ ব্যথায় কেঁপে একই রকম বইছে অবিরত ;

শরীরটা তার ঠাউরেছো কি ঠুন্‌কো কাঁচের পল্‌কা বাসনখানা ?
একটুখানি চিড় খেলে, কি, ভাঙ্‌লে একটু কানা,
ইচ্ছেমতো ক'র্‌বে তাকে বাতিল ?
নারীকে চাও চিরদিনই করে রাখ্‌তে যেন, বাড়ীর একটা আস্‌বাবেরই সামিল ।
পুরুষ কিন্তু হোক্‌না যতই দুষ্টী—
থাকছে যেমন খুসি ;
কেউ তো তাকে চোখ রাঙিয়ে দেয়না কোন সাজা, জীবনটা তার ডুবিয়ে দিয়ে দুঃখে !
এম্‌নি করেই জাতটাকে আজ অধঃপাতের মুখে
এনেছো সব টেনে,
অবিচারের বিচার মেনে মেনে !"

৪

পত্নীর এই বক্তৃতাটা উঠ্‌ছে যখন ক্রমে
প্রবল বেগে জমে,
হেসে বল্লেম "থামো,
মেয়ের জন্যে তোমায় একটু লজ্জা হয় না, রামঃ !—"
স্ত্রী বললেন "যা ঘটেছে তাতে আমার নেইকো কোনই লাজ,
মেয়ের মুখে খুঁটিয়ে আমি শুনিছি সব আজ !
বরং তাঁরাই লুকিয়ে থাকুন মুখ, যাঁদের ছেলের বিয়ের দু'দিন পরে
বউ পোয়াতী ঘরে !
লজ্জা করুক্ তাদের মাথা হেঁট—যাদের এটা চুক্—
তুমি আমি কিসের জন্যে শুখিয়ে বেড়াই মুখ ?—"
আমি বল্‌লেম "দেখ এটা তোমার আমার শুধু ঘরের ভিতর বুঝাবুঝি নয়,
মেয়ের নামে কলঙ্কটা রটে গেছে আজ সারা সহরময় !
আমার এখন লোকসমাজে মুখ দেখানো ভার !
বল্‌ছে সবাই মেয়ের আমার এই অবস্থা জেনেও, লুকিয়ে নাকি বে' দিয়েছি তার ।
চূণ-কালি যে দিচ্ছে লোকে, উপায় কি তার বলো ?
আমি বলি কি ওকে নিয়ে দিনকতকের মতো পশ্চিমে যাই চলো !—"
স্ত্রী ব'ল্‌লেন "বটে—
বুদ্ধি দেখ্‌ছি চতুষ্পদ পূর্ণ তোমার ঘটে !
বাঁধা দিয়ে বসত-বাড়ী সাত পুরুষের সোণার বাস্তু-ভিটে—
এত বড় দেনার বোঝা নির্ভাব্‌নায় তুলে নিয়ে পিঠে
এই সেদিনে বে' দিয়েছ যার,
আজ্‌কে যত বাজে লোকের তুচ্ছ কথা শুনে আখের-উমের মাটি ক'র্‌বে তার ?
তার চাইতে বে'ইকে তোমার সকল কথা খুলে—চিঠি একখান লিখে দাওগে আজই—
পত্রপাঠ বউকে তাদের নে যায় যেন তুলে, তাদের বোঝা বইতে আমরা নইকো মোটেই রাজি !"

* * * *

লিখে দিলেম্ পত্নী আমায় পরামর্শ দিলেন যেমন,
যদিও এ কাজটা যেন ঠেকৃল মনে কেমন-কেমন ;
কোন উত্তর দিলেই না তার, দীনু ঘোষটা এম্‌নি চোর ;
হপ্তাখানেক পরে আবার কড়া-তাগিদ দিতে জোর
এলো একটা জবাব—
লিখেছে সে—"দেখ্‌ছি তোমার ইত্‌রোমিটাই করা স্বভাব।
তোমার মতো ছোট লোককে বোঝাই বল কত ?
চিঠিপত্র লিখোনা আর নির্লজ্জের মতো ;
তোমার সঙ্গে যখন আমার সম্পর্ক কিছুই নেই,
কি হিসাবে পত্রখানার সম্বোধনে লিখ্‌লে 'বে'ই !'
অতি অক্ষম জেনো আমি কুলটা'কে তুলে আনতে ঘরে ;
চেষ্টা দেখো অন্য কোথাও চাপিয়ে যদি দিতে পার প'রে,
দীনুঘোষের কু'য়োর জলে ডুব্‌বে না আর নোংরা তোমার ঘটি,
বলি এমন দৌহিত্র—পূর্ব্বে আরো জন্মেছিল ক'টি ?
শোন, তোমায় স্পষ্ট বলি, ছেলের আমি দিচ্ছি বিয়ে ফের—
আজ থেকে সব শেষ হয়ে যাক্ তোমার সঙ্গে আমার ছেঁড়া কথার জের।"
পত্র শুনে পত্নী বললেন—"দীনুঘোষটা পাজি, ভদ্র নয় ক' সে—
আচ্ছা, আমি দেখ্‌বো বুড়ো কেমন ক'রে ফের দিতে পারে ছেলের আবার বে !"
বল্‌তে বল্‌তে রেগেই প্রিয়ে লাল,
ডালিম-পানা হ'য়ে উঠ্‌লো নিটোল ছটি গাল !
মুক্তো হেন দাঁতগুলি তার চেপে অধর-পুটে
গন্‌-গনিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সে উঠে !

*　　　*　　　*　　　*

খানিক পরে
ঢুকে শোবার ঘরে
দেখলেম্ আমি চেয়ে—
অবিশ্রান্তে কাঁদ্‌ছে আমার মেয়ে !
চখের জলে বুক যাচ্ছে ভেসে,
ব্যথার-ব্যথী জননী তার
বারম্বার
মুছিয়ে দিয়ে মুখ, অভয়-হাসি হেসে
ব'ল্‌ছে "বাছা ভাবিসনে তুই কিছু—
জামাই আমার নিশ্চয় এর বিহিত ক'র্‌বে দেখিস্, সে নয় তার বাপের মত নীচু !"

দেখে তাদের, চখের পাতা এলো আমার ভিজে, কী বেদনায় জানেন অন্তর্য্যামী—
চোরের মতো নিঃশব্দে সেখান থেকে তখন পালিয়ে এলেম আমি।

*　　　*　　　*　　　*

অনেকরাত্রে দেখি আবার দু'টি মায়ে-ঝীয়ে
দুয়ারে খিল দিয়ে
লিখ্‌ছে ব'সে চিঠি,
তাদের দুখে দুঃখী হ'য়ে ঘরের ভিতর যেন দীপটী সেদিন জ্ব'ল্‌ছে মিটির-মিটি !
তারি করুণ-শীর্ণ-আলোক-রেখা
যাচ্ছে দেখা
দ্বারের ফাঁকে ফাঁকে,
বুঝ্‌তে পারলেম অনুমানে পত্র এবার তারা লিখ্‌ছে ব'সে কাকে !

৫

দু'দিন প'রে হঠাৎ পত্নী চ'খেমুখে হেসে
ছোট্ট একটি মেয়ের মতই ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে
বল্‌লে—"ওগো শোনো, শোনো—
ভয় নেই আর তোমার কোনো,
মেয়ের আমার ঘুচ্‌লো অপবাদ,
বে'ইকে তোমার আমি এবার দেখিয়ে দেবো মজা, মিটিয়ে মনের সাধ।
হাড়-পাজি ওই দীনু ঘোষ—
মানুষ নয়তো রাক্কোস,
লোকটা যেন জহ্লাদ ;
জামাই কিন্তু বড্ড ভালো—দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ !
মেনিকে যা চিঠি লিখেছে আজ,
দেখলে তোমার দীনু ঘোষের মাথায় প'ড়বে বাজ !
লাজ-লজ্জার মাথাটি তাই খেয়ে
আনলেম এটা জোর করে এই মেয়ের কাছে চেয়ে,
পড়ে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে—জামাই ভদ্র অতি,
মেয়েও তোমার সতী।"

*　　　*　　　*　　　*

খুলে দেখ্‌লেম চিঠিখানা
আছে বটে মুন্সিয়ানা,
বাবাজীবন লিখ্‌ছেন "প্রিয়তমে—
পত্নীর প্রতি স্বামীর প্রেম জীবনে কি কমে ?

জানি জানি চির-অমল শুক-তারাটির সম,
শুদ্ধঃ-সত্ত্ব নিত্য তুমি চিত্ত-কমল মম,
হৃদয়-সন্তোষিণী,
ওগো নির্দ্দোষিণী !
তোমার কোলে আস্‌ছে শিশু—সে তো আমার সৌভাগ্য প্রিয়ে !
নূতন খেলা খেল্‌বো দু'জন আমাদের এই মিলন-মেলার প্রথম পুষ্প নিয়ে !
অকারণে তোমার শিরে দিয়েছে আজ লোকে যে কলঙ্ক-ভার,
আমি যে তার প্রধান অংশীদার !
অপযশটা রটিয়ে দেছেন যাঁরা
জান্‌তো না ভাই তাঁরা,
আমার অপরাধ ;
আজকে আমি মিটিয়ে দিছি সকল বিসংবাদ !
প্রথমটা কেউ রাজি হ'ননি আনতে তোমায় ঘরে,
আমি যখন বুঝিয়ে দিলেম পরে
বৃথা তাঁদের রোষ,
দায়িত্ব—এর সবটা আমার—নিষ্কলঙ্ক তুমি, তোমার এতে নাইকো কোন' দোষ,
ত্যাগ ক'রলে পুত্রবধূ—বিদায় নেবে পুত্রটীও—সে যখন তার স্বামী,
বিবাহিতা পত্নী আমার কুলটা নয় কোন দিনই—বিশেষ জানি আমি !
তোমার জন্যে যেতে চাইছি বাপ মাকে আজ ফেলে—
শুনে সবাই বললেন, আমি নিমক্‌হারাম-ছেলে,
অতি অসভ্য, স্ত্রৈণ, বোকা—এবং নাকি বড়ই বেহায়া !
যাদু করছো তুমি আমায়—নইলে কিনা আমি—সন্দেহের এই এমন বিরাট ছায়া
উড়িয়ে দিয়ে, তোমায় আবার আনতে চাইছি ঘরে !
অবশ্য কেউ 'তুক্' ক'রেছে ঠিক্ ক'রে তা পরে—
ভেবে চিন্তে বল্লেন—আমার বিগ্‌ড়ে গেছে মাথা—ডেকে আন্‌বেন রোজা !
এবং আমায় হঠাৎ এখন ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে—বৌকে আবার ঘরে আনাই সোজা !
অতএব, তৈরি হ'য়ে থাকবে তুমি কা'ল—দিনটা আছে ভালো—
যাচ্ছি আমি আন্‌তে তোমায় সঙ্গে ক'রে নিজে, আমার আঁধার ঘরের আলো !"

পরশুরাম বিরচিত

লম্বকর্ণ

নারদ বিচিত্রিত

(১)

রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিন্দার এণ্ড অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেয়ালদহ-বেঞ্চ, প্রত্যহ বৈকালে বেলেঘাটা খালের ধারে হাওয়া খাইতে যান। চল্লিশ পার হইয়া ইনি একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছেন ; সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া এক্সারসাইজ করেন, এবং ভাত ও লুচি বর্জ্জন করিয়া দুবেলা কচুরি খাইয়া থাকেন।

কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া বংশলোচন বাবু ক্লান্ত হইয়া খালের ধারে একটা ঢিবির উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—সাড়ে ছটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। সিলোনে মনসুন পৌঁছিয়াছে। এখানেও যে কোনো দিন হঠাৎ ঝড় জল হওয়া বিচিত্র নয়। বংশলোচন উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতের বর্ম্মাচুরুটে একবার জোরে টান দিলেন।

এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি সুরে বলিতেছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ। ফিরিয়া দেখিলেন—একটি ছাগল।

বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ছাগল। কুচ্‌কুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লট্‌পটে কানের উপর কচি পটোলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনো অজাতশ্মশ্রু। বংশলোচন বলিলেন—"আরে এটা কোথা থেকে এল ? কার পাঁঠা ? কাকেও ত দেখচি না।"

ছাগল উত্তর দিল না। কাছে ঘেঁসিয়া লোলুপনেত্রে তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তার মাথায় ঠেলা দিয়া বলিলেন—"যাঃ পালা, ভাগো হিঁয়াসে।" ছাগল পিছনের দু পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সাম্‌নের দু পা মুড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া রায় বাহাদুরকে ঢুঁ মারিল।

রায় বাহাদুর কৌতুক বোধ করিলেন। ফের ঠেলা দিলেন। ছাগল আবার খাড়া হইল এবং খপ্ করিয়া তাঁর হাত হইতে চুরুটটি কাড়িয়া লইল। আহারান্তে বলিল—"অর্-র্-র্" অর্থাৎ আর আছে ?

বংশলোচনের সিগার-কেসে আর একটি মাত্র চুরুট ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া দিলেন। ছাগলের মাথা ঘোরা, গা-বমি বা অপর কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয় চুরুট নিঃশেষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"অর্-র্-র্ ?" বংশলোচন বলিলেন—"আর নেই। তুই এইবার যা। আমিও উঠি।"

ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাস করিতে লাগিল। বংশলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"না বিশ্বাস হয়, এই দেখ্ বাপু।" ছাগল এক লম্ফে সিগার-কেস কাড়িয়া লইয়া চর্ব্বণ আরম্ভ করিল। রায় বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"শ্-শালা।"

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আর দেরি করা উচিত নয়। বংশলোচন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছাগল কিন্তু তাঁর সঙ্গ ছাড়িল না। বংশলোচন বিব্রত হইলেন। কার ছাগল কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না, নিকটে কোনো লোক নাই যে জিজ্ঞাসা করেন। ছাগলটাও নাছোড়বান্দা, তাড়াইলে যায় না। অগত্যা বাড়ী লইয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালই, নতুবা কাল সকালে যা হোক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ লইলেন; কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলিতে পারিল না। অগত্যা তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে আপাততঃ নিজেই উহাকে প্রতিপালন করিবেন।

হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ্ করিয়া উঠিল। তাঁর যে এখন পত্নীর সঙ্গে কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তার পর দিনকতক অহিংস-অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ,—পরিশেষে হঠাৎ এক দিন সন্ধি স্থাপন ও পুনর্ম্মিলন। এ রকম প্রায়ই হয়, বিশেষ উদ্বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাততঃ অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তুজানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার সখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে, তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ।

চলিতে চলিতে রায় বাহাদুর পত্নীর সহিত কাল্পনিক বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একটা পাঁঠা পুষিবেন তাতে কার কি বলিবার আছে ? তাঁর কি স্বাধীন ভাবে একটা সখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই ? তিনি একজন মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁর প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূ-সম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম,—পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্য্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁর কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের নারভস্‌নেস্ ? বংশলোচন বারবার মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারো তোয়াক্কা রাখেন না।

(২)

বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা বসে, তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুয্যে, মোহনবাগান, পরমার্থ-তত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমীর,—কোনো প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল। এই সূত্রে গতকল্য বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূর সম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

বংশলোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত; অর্থাৎ দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি, আয়না, ইত্যাদি টাঙানো আছে। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি, কালো জমির উপর আসমানি রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরাজি অক্ষরে লেখা আছে—CAT. তার নীচে রচয়িত্রীর নাম—মানিনী দেবী। ইনিই গৃহকর্ত্রী।

ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের তৈলচিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন,—একটি প্রকাণ্ড সাপ তাঁহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে,—কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই; কারণ, সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়,—ওঁ-কার মাত্র। ইহা ভিন্ন কতকগুলি প্রেমের ছবি, রাজা-রাণীর ছবি, রায় বাহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত ছোট বড় সাহেবের ফটোগ্রাফ, গিল্‌টির ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, আলমানাক্, ঘড়ি, রায় বাহাদুরের সনদ, কয়েকটি অভিনন্দন-পত্র ইত্যাদি আছে। ঘরে তিনটি বড় বড় তক্তাপোষ জুড়িয়া ফরাস এবং তার উপর গোটা কয়েক তাকিয়া।

আজও যথা সময়ে আড্‌ডা বসিয়াছে। বংশলোচন এখনো বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকীল তাকিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বৃদ্ধ চাটুয্যে মহাশয় হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছেন। নগেন ও উদয় অতি কষ্টে ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে।

আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল—"যাই বল, বাঘের মাপ কখনই ল্যাজ শুদ্ধ হতে পারে না। তাহলে মেয়েছেলেদের মাপও চুল শুদ্ধ হবে না কেন ? আমার বোনের বিনুনীটাই ত তিন ফুট হবে। তবে কি বল্‌তে চাও, বউ আট ফুট লম্বা ?"

দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা

নগেন বলিল—"দেখ উদো, তোর বোয়ের বর্ণনা আমরা মোটেই শুন্‌তে চাই না। বাঘের কথা বল্‌তে হয় বল্।"

চাটুয্যে মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বলিলেন—"আঃ হা, তোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই ?"

এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন।

বিনোদ বাবু বলিলেন—"বাহবা, বেশ, পাঁঠাটি ত। কত দিয়ে কিন্‌লে হে ?"

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন—"বেওয়ারিস মাল, বেশী দিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় করে ফেল,—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।"

চাটুয্যে মহাশয় ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন—"দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।"

নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া বলিল—"উঁহু, হাঁড়ি কাবাব। একটু বেশী করে আদাবাঁটা আর প্যাঁজ।"

উদয় বলিল—"ওঃ, আমার বউ অ্যায়সা শুলি কাবাব করতে জানে!"

নগেন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"উদো, আবার ?"

বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোমাদের কি জন্তু দেখ্‌লেই খেতে ইচ্ছে করে ? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েচে, তা কেবল কালিয়া আর কাবাব।"

ছাগলের সংবাদ শুনিয়া বংশলোচনের সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা টেঁপী এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র ঘেণ্টু ছুটিয়া আসিল। ঘেণ্টু বলিল—"ও বাবা, আমি পাঁঠা খাবো। পাঁঠার ম-ম্-ম—"

বংশলোচন বলিলেন—"যা যাঃ, শুনে শুনে কেবল খাই খাই শিখ্‌চেন।"

ঘেণ্টু হাত পা ছুড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ আমি ম-ম-ম মেটুলী খাবো।"

টেঁপী বলিল—"বাবা, আমি পাঁঠাটাকে পুষ্‌বো, একটু লাল ফিতে দাও না।"

বংশলোচন। বেশ ত। একটু খাওয়া দাওয়া করুক, তারপর নিয়ে খেলা করিস এখন।

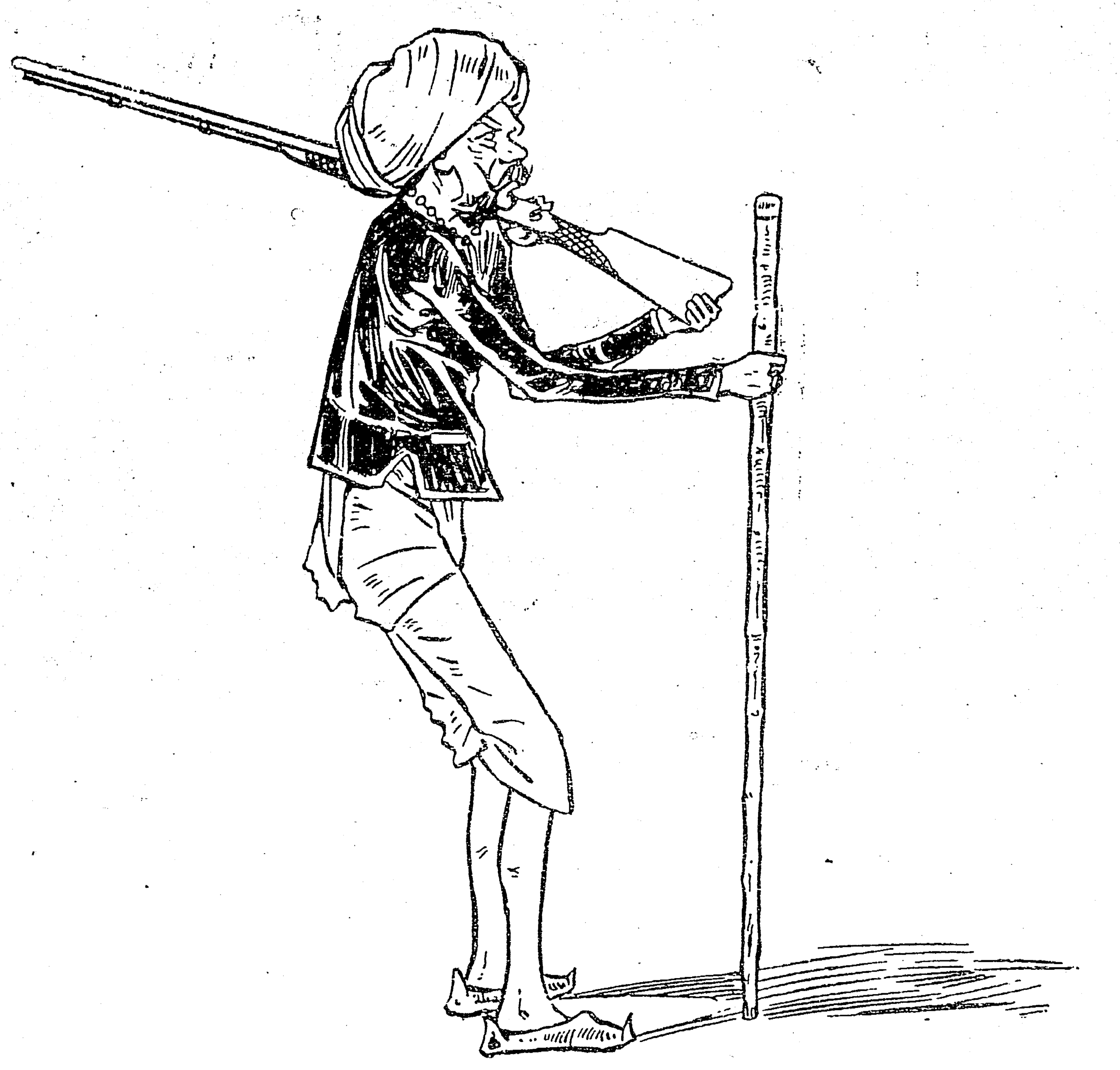

হজৌর

টেঁপী। বাবা, পাঁঠার নাম কি বল না ?

বিনোদ বলিলেন—"নামের ভাবনা কি। ভাস্বরক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—"

চাটুয্যে বলিলেন—"লম্বকর্ণই ভাল।"

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"টেঁপু, তোর মা এখন কি কচ্চে রে ?"

টেঁপী। এক্ষুনি ত কল-ঘরে গেছে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস্ ? তা হলে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দি। দেখ্, ঝিকে বল, চট্ করে ঘোড়ার ভিজানোছোলা চাট্টি এনে এই বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ্, বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাস্‌নি যেন।

(৩)

উৎসাহের আতিশয্যে টেঁপী পিতার আদেশ ভুলিয়া গেল। ছাগলের গলায় লাল ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দর-মহলে লইয়া গিয়া বলিল—"ও মা, শীগ্‌গির এস, লম্বকর্ণ দেখবে এস।"

মানিনী মুখ মুছিতে মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"আ মর্, ওটাকে কে আন্‌লে ? দূর্ দূর্—ও ঝি, ও বাতাসি, শীগ্‌গির ছাগলটাকে বার করে দে,—ঝাঁটা মার্, ঝাঁটা মার্।"

টেঁপী বলিল—"না রে, ওকে ত বাবা এনেচে, আমি পুষ্‌বো।"

ঘেণ্টু বলিল—"ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌ব।"

মানিনী বলিলেন—"খেলা বার করে দিচ্চি। ভদ্দর লোকে আবার ছাগল পোষে! বেরো, বেরো—ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিং—"

"হজৌর" বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। শীর্ণ খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকাল নাম,—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁর প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দরওয়ানকে বলিলেন—"ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই ত এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা।"

চুকন্দর বলিল—"বহুৎ আচ্ছা।"

বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন—"দেখো চুকন্দর সিং, এই বক্‌ড়ি গেটের বাইরে যাগা ত তোম্‌রা নোক্‌রি ভি যাগা।"

চুকন্দর বলিল—"বহুৎ আচ্ছা।"

মানিনী স্বামীর প্রতি একটি অগ্নিময় নয়নবাণ হানিয়া বলিলেন—"হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ি, রাত্তির হয়ে গেল —গিল্‌তে হবে না ? থাকিস্ তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্চি আমি হাটখোলায়।" হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়।

বংশলোচন বলিলেন—"টেঁপু, ঝিকে বলে দে, বৈঠকখানা ঘরে আমার শোবার বিছানা করে দেবে। আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ্, ঠাকুরকে বল্ আমি মাংস খাব না। শুধু খানকত কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।"

(৪)

পুরাকালে বড়লোকদের বাড়ীতে একটি করিয়া গোসা-ঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্য্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্য্যপুত্রদের জন্য সেরকম কোনো পাকা বন্দোবস্ত ছিল না, অগত্যা তাঁরা এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচ-পত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এইসকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর, অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ী। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাঁর ঘুম হয় না, এজন্য ঘরের এককোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়ের সম্বল,—পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্ম্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন—তিনি কি এমন অন্যায় কাজ করিয়াছেন, যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন ? বাপের বাড়ী যাবেন,—ইস্, ভারি তেজ ! তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। গৃহিণী সখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন, তাহা ত বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই ত সেদিন পনরটা জলচৌকি, তেইশটা বঁটি এবং আড়াইশ টাকার খাগ্‌ড়াই বাসন কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা ? হুঁঃ, যতো সব—। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর সুইচ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুটা বর্ম্মা চুরুট খাইয়া তার ঘুম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি দুটা আন্দাজ জোরে হাওয়া উঠিল। ঠাণ্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠকখানা ঘর হইতে মিট্‌মিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তার বন্ধনরজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল, এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাসের এক-কোণে এক গোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুখাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে ; কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চক্ চক্ করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।

* * * *

বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন, সন্ধি স্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁর একটা নরম গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব হইল। নিদ্রা-বিজড়িত স্বরে বলিলেন—"কখন এলে ?" উত্তর পাইলেন—"হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।"

হুলস্থূল কাণ্ড। চোর—চোর—বাঘ হায়—এই চুকন্দর সিং—জল্‌দি আও—নগেন—উদো—শীগ্‌গির আয়—মেরে ফেল্লে।

চুকন্দর তার মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাতা টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ তু

বংশলোচন বলিলেন—"যা যাঃ, শুনে শুনে কেবল খাই খাই শিখ্‌চেন।"

ঘেণ্টু হাত পা ছুড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ আমি ম-ম-ম মেটুলী খাবো।"

টেঁপী বলিল—"বাবা, আমি পাঁঠাটাকে পুষ্‌বো, একটু লাল ফিতে দাও না।"

বংশলোচন। বেশ ত। একটু খাওয়া দাওয়া করুক, তারপর নিয়ে খেলা করিস এখন।

হজৌর

টেঁপী। বাবা, পাঁঠার নাম কি বল না?

বিনোদ বলিলেন—"নামের ভাবনা কি। ভাস্বরক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—"

চাটুয্যে বলিলেন—"লম্বকর্ণই ভাল।"

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"টেঁপু, তোর মা এখন কি কচ্চে রে?"

টেঁপী। এক্ষুনি ত কল-ঘরে গেছে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস্? তা হলে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দি। দেখ, ঝিকে বল, চট্‌ করে ঘোড়ার ভিজানোছোলা চাট্টি এনে এই বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ, বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাস্‌নি যেন।

(৩)

উৎসাহের আতিশয্যে টেঁপী পিতার আদেশ ভুলিয়া গেল। ছাগলের গলায় লাল ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দর-মহলে লইয়া গিয়া বলিল—"ও মা, শীগ্‌গির এস, লম্বকর্ণ দেখবে এস।"

মানিনী মুখ মুছিতে মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"আ মর্‌, ওটাকে কে আন্‌লে? দূর্‌ দূর্‌ ও ঝি, ও বাতাসি, শীগ্‌গির ছাগলটাকে বার করে দে,—ঝাঁটা মার্‌, ঝাঁটা মার্‌।"

টেঁপী বলিল—"বা রে, ওকে ত বাবা এনেচে, আমি পুষ্‌বো।"

ঘেণ্টু বলিল—"ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌ব।"

মানিনী বলিলেন—"খেলা বার করে দিচ্চি। ভদ্দর লোকে আবার ছাগল পোষে! বেরো, বেরো—ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিং—"

"হজৌর" বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। শীর্ণ খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকাল নাম,—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁর প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দরওয়ানকে বলিলেন—"ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও,

একদম ফটকের বাইরে। নেই ত এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা।"

চুকন্দর বলিল—"বহুৎ আচ্ছা।"

বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন—"দেখো চুকন্দর সিং, এই বক্‌ড়ি গেটের বাইরে যাগা ত তোম্‌রা নোক্‌রি ভি যাগা।"

চুকন্দর বলিল—"বহুৎ আচ্ছা।"

মানিনী স্বামীর প্রতি একটি অগ্নিময় নয়নবাণ হানিয়া বলিলেন—"হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ি, রাত্তির হয়ে গেল—গিল্‌তে হবে না? থাকিস্‌ তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্চি আমি হাটখোলায়।" হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়।

বংশলোচন বলিলেন—"টেঁপু, ঝিকে বলে দে, বৈঠকখানা ঘরে আমার শোবার বিছানা করে দেবে। আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ্‌, ঠাকুরকে বল্‌ আমি মাংস খাব না। শুধু খানকত কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।"

(৪)

পুরাকালে বড়লোকদের বাড়ীতে একটি করিয়া গোসা-ঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্য্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্য্যপুত্রদের জন্য সেরকম কোনো পাকা বন্দোবস্ত ছিল না, অগত্যা তাঁরা এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এইসকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর, অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ী। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাঁর ঘুম হয় না, এজন্য ঘরের এককোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়ের সম্বল,—পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্ম্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন—তিনি কি এমন অন্যায় কাজ করিয়াছেন, যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন? বাপের বাড়ী যাবেন,—ইস্‌, ভারি তেজ! তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। গৃহিণী সখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন, তাহা ত বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই ত সেদিন পনরটা জলচৌকি, তেইশটা বঁটি এবং আড়াইশ টাকার খাগ্‌ড়াই বাসন কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা? হুঁঃ, যতো সব—। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর সুইচ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুটা বর্ম্মা চুরুট খাইয়া তার ঘুম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি দুটা আন্দাজ জোরে হাওয়া উঠিল। ঠাণ্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠকখানা ঘর হইতে মিট্‌মিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তার বন্ধনরজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল, এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাসের এক-কোণে এক গোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুখাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে; কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চক্‌ চক্‌ করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।

* * * *

বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন, সন্ধি স্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁর একটা নরম গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব হইল। নিদ্রা-বিজড়িত স্বরে বলিলেন—"কখন এলে?" উত্তর পাইলেন—"হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।"

হুলস্থূল কাণ্ড। চোর—চোর—বাঘ হায়—এই চুকন্দর সিং—জল্‌দি আও—নগেন—উদো—শীগ্‌গির আয়—মেরে ফেল্লে।

চুকন্দর তার মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাতা টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ দু

এক ঘা মার খাইয়া ব্যা ব্যা করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন, বাঘ বরঞ্চ ছিল ভাল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েচে।

(৫)

ভোর বেলা বংশলোচন চুকন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন—কোনো ভালা আদ্‌মি ছাগল পুষিতে রাজি আছে কি না। যে-সে লোককে তিনি ছাগল দিবেন না। এমন লোক চাই, যে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেচিবে না, মাংসের লোভে মারিবে না।

আটটা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্ব্বাটীর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, নাপিত কামাইয়া দিতেছে। বিনোদ বাবু ও নগেন অমৃতবাজারে ড্যালহাউসি ভার্স‌স্‌ মোহনবাগান পড়িতেছেন। উদয় ল্যাংড়া আমের দর করিতেছে। এমন সময় চুকন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"লাটু বাবু আয়ে হেঁ।"

তিন জন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার,—ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্ব্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিষ্ট ওয়াচ, গায়ে আগুল্‌ফলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবী, তার ভিতর দিয়া গোলাবী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্দ্ধ দগ্ধ সিগারেট।

বংশলোচন বলিলেন—"আপনাদের কোথেকে আসা হচ্চে?"

লাটুবাবু বলিলেন—"আমরা বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড। ব্যাণ্ড-মাষ্টার লটবর লন্দী—অধীন। লোকে লাটুবাবু বলে ডাকে। শুনলুম, আপনি একটি পাঁঠা বিলিয়ে দেবেন, তাই সঠিক খবর লিতে এসেচি।"

বিনোদ বলিলেন—"আপনারা বুঝি কানেস্তারা বাজান?"

লাটু। কালেস্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কল্‌সাট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্লারিয়লেট,—এই লরহরি লাগ ফ্লোট,—এই লবকুমার লন্দন ব্যায়লা। তা ছাড়া কর্লেট, পিক্‌লু, হারমোনিয়া, ঢোল, কত্তাল সব লিয়ে উলিশ জন আছি। বর্ম্মা অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট সায়েবের সেদিন বে হল, ফিষ্টি দিলে, আমরা বাজালুম, সাহেব খুসী হয়ে টাইটিল দিলে—কেরাসিন ব্যাণ্ড।

বংশলোচন। দেখুন, আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—

লাটু। আমরা হলুম উলিশটি প্রালী, একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি?

নরহরি। লস্যি, লস্যি।

বংশলোচন। আমি এই সর্ত্তে দিতে পারি যে, ছাগলটিকে আপনি যত্ন করে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।

লাটু। এ যে আপনি লতুন কথা বলচেন মশায়। ভদ্দর লোকে কখনো ছাগল পোষে?

নরহরি। পাঁঠি নয় যে দুধ দেবে।

নবীন। পাখি নয় যে পড়বে।

নবকুমার। ভেড়া নয় যে কম্বল হবে।

বংশলোচন। সে যাই হোক। বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই। নেবেন কি না বলুন।

লাটুবাবু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বলিলেন—"লিয়ে লাও হে লাটুবাবু লিয়ে লাও। ভদ্দর লোক বলচেন অত করে।"

বংশলোচন। কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।

লাটু। সে আপনি ভাববেন না। লাটুলন্দীর কথার লড়চড় লেই।

লম্বকর্ণকে লইয়া বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড চলিয়া গেল। বংশলোচন বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—"ব্যাটাদের দিয়ে ভরসা হচ্চে না।" বিনোদ আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"ভেবো না হে, তোমার পাঁঠা গন্ধর্ব্ব লোকে বাস করবে। ফাঁকে পড়লুম আমরা।"

(৬)

সন্ধ্যার আড্ডা বসিয়াছে। বংশলোচন একটি নূতন গীতা লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং ভাবিতেছেন—ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে, তখন আজ সন্ধিস্থাপনা হইলেও হইতে পারে।

চাটুয্যে মহাশয় বলিতেছিলেন—"সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব'লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই। ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলা হতে যেমন কাঁচ-পোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেচ,—আমাদের ওসব ছেলেবেলা

থেকেই জানা আছে। আমাদের রায় বাহাদুর ছাগলটা বিদেয় করে খুব ভাল কাজ করেচেন। কেটে খেয়ে ফেলতেন ত কথা ছিল না, কিন্তু বাড়ীতে রেখে বাড়তে দেওয়া,—উঁহু।"

বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন—"হে কৌন্তেয়, তুমি শ্রীভগবানকে একটু থামিয়ে রেখে একবার চাটুয্যে মশায়ের কথাটা শোনো। মনে বল পাবে।"

উদয় বলিল—"আমি সেবার যখন সিমলেয় যাই—"

নগেন। মিছে কথা বলিসনি উদো। তোর দৌড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অবধি।

ভুটে বল্লে হালুম

উদয়। বাঃ, আমার দাদাশ্বশুর যে সিমলেয় থাকতেন। বউ ত সেইখানেই বড় হয়। তাইত রং অত—

খগেন। খবরদার উদো।

চাটুয্যে। যা বলছিলুম শোনো। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হল ইয়া লাস, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়ীতে ভোজ,—লুচি, পাঁঠার কালিয়া, এই সব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্চে। বল্লুম—দেখ্‌চ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর,—কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরীবের কথা বাসি হলে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ খোঁজ কোথা গেল। এক বচ্ছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বল্লেই হয়, দাড়ি প্রায় খসে গেছে, মুখ একবারে হাঁড়ি, বর্ণ হয়েচে যেন কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েচে মশায়—আঁজি আঁজি ডোরা ডোরা। ডাকা হল—ভুটে, ভুটে। ভুটে বল্লে হালুম্। লোকজন দূর থেকে নমস্কার করে ফিরে এল।

"লাটু বাবু আয়ে হেঁ।"

সপারিষদ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণও সঙ্গে আছে। বিনোদ বলিলেন—"কি ব্যাণ্ডমাষ্টার, আবার কি মনে করে?"

লাটুবাবুর আর সে লাবণ্য নাই। চুল উস্‌ক খুস্‌ক, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজল-নয়নে হাঁউ মাউ করিয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়েচে মশায়, ধনে প্রাণে মেরেচে। ও হোঃ হোঃ হো।"

নরহরি বলিলেন—"আঃ কি কর লাটুবাবু একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েচেন, তখন একটা বিহিত করবেনই।"

বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন—"কি হয়েচে—ব্যাপার কি?"

লাটু। মশায়, ওঁই পাঁঠাটা—

চাটুয্যে বলিলেন—"হুঁ, বলেছিলুম কি না?"

লাটু। ঢোলের চামড়া কেটেচে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েচে, হারমোনিয়ার চাবী সমস্ত চিবিয়েচে। আর—আর—আমার পাঞ্জাবীর পকেট কেটে লব্বই টাকার লোট—ও হো হো হো।

নরহরি। গিলে ফেলেচে। পাঁঠা নয় হুজুর সয়তান। সর্ব্বস্ব গেছে, লাটুর প্রাণটি কেবল আপনার ভরসায় এখনো ধুক্‌পুক্ করচে।

বংশলোচন। ফ্যাসাদে ফেল্লে দেখচি।

নরহরি। দোহাই হুজুর, লাটুর দশাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা করে দিন,—বেচারা মারা যায়।

বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন—"একটা জোলাপ দিলে হয় না?"

মরচি টাকার শোকে, আর আপনি বল্‌চেন জোলাপ খেতে?

লাটুবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"মশায়, এই কি আপনার বিবেচনা হল? মরচি টাকার শোকে, আর আপনি বলচেন জোলাপ খেতে?"

বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন,—ছাগলটাকে দিতে বল্‌চি।

নরহরি। হায় হায়, হুজুর এখনো ছাগল চিনলেন না। কোন্ কালে হজম করে ফেলেচে। লোট ত লোট,—ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবী, মায় ইষ্টিলের কত্তাল।

বিনোদ। লাটুবাবুর মাথাটি কেবল আস্ত রেখেচে।

বংশলোচন বলিলেন—"যা হবার তা ত হয়েচে। এখন বিনোদ, তুমিই একটা খেসারৎ ঠিক করে দাও। বেচারার লোকসান যাতে না হয়, আর আমার ওপর বেশী জুলুমও না হয়। ছাগলটা বাড়ীতেই থাকুক, কাল যা হয় করা যাবে।

অনেক দর-দস্তুরের পর একশ টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশী কষাকষি করিতে দিলেন না। লাটুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেঁপী ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন—"ও টেঁপুরাণী, শীগ্‌গির গিয়ে তোমার মাকে বল কাল আমরা এখানে খাবো,—লুচি, পোলাও, মাংস—"

টেঁপী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ। বল কি! হ্যাঁ হে বংশু, প্রেমটা একটা পাঁঠা থেকে বিশ্ব-পাঁঠায় পৌঁছেচে না কি? আচ্ছা, তুমি না খাও, আমরা আছি। যাও ত টেঁপু, মাকে বল সব যোগাড় করতে।

টেঁপী। সে এখন হচ্চে না। মা:বাবার ঝগড়া চলচে, কথাটি নেই।

বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—কথাটি নেই,—তুই সব জানিস। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েচিস।"

টেঁপী। বা-রে, আমি বুঝি কিছু টের পাই না? তবে কেন মা খালি খালি আমাকে বলে—টেঁপী, পাখাটা মেরামত করাতে হবে,—টেঁপী, এমাসে আরো ছ'শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন?

বংশলোচন। থাম্ থাম্, বকিস নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না, অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গীন হয়েচে বল?

বংশলোচন। আরে এতদিন ত সব মিটে যেত, ঐ ছাগলটাই মুস্কিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ। তোমারই বা অত মায়া কেন? খেতে না পার—বিদেয় করে দাও। জলে বাস কর, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কোরো না।

বংশলোচন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"দেখি, কাল যা হয় করা যাবে।"

এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহ-শয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুবিধা পায় নাই।

(৭)

পরদিন বৈকালে সাড়ে পাঁচটার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আছে। ঝি চাকর অন্দরে কাজকর্ম্মে ব্যস্ত। চুকন্দর সিং তার ঘরে বসিয়া আটা সানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে বাঁধা আছে এবং দড়ির সীমার মধ্যে যথাসম্ভব লম্ফঝম্ফ করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগলকে লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন।

পাছে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলিপী কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খালধারে পৌঁছিলেন।

আজ তিনি স্বহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জ্জন দিবেন, যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেখানেই ছাড়িয়া দিবেন,—যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলিপীর ঠোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন—

"এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।"

লেখার পর কাগজ ভাঁজ করিয়া একটা ছোট টিনের কৌটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তারপর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে

হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত।

দূরে আসিয়াও বংশলোচন বার বার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। যদি তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এখনি পশ্চাদ্ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন।

আর পারা যায় না, হাঁফ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুল গাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা যায় না। এইবার তাঁর মুক্তি,—আর কিছুদিন দেরি করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। ঐ হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন। গৃহিণী তার উপর মর্ম্মান্তিক রুষ্ট, আত্মীয়স্বজন তাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে,—তিনি একা কাঁহাতক সামলাইবেন? হায়রে সত্যযুগ, যখন শিবিরাজা শরণাগত কপোতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন,—মহিষীর ক্রোধ, সভাসদবর্গের বেয়াদবি, কিছুই তাঁকে ভোগ করিতে হয় নাই।

ড্রুম্ দুদ্দুড়্ দুড়্ দড়ড়ড় ড়। আকাশে কে টেঁটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসারঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক শাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পলাইতেছে। সমস্ত চুপ,—গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্য্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে হাঁটার ফলে তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ,—কড় কড় কড়াৎ,—ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশান কোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দ্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তার পিছনে যা কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ঐ এল, ঐ এল! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল। লম্বা লম্বা তাল গাছগুলা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্ত্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপ্টা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়,—প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইঢিবি,—এই ক্ষুদ্র কলিকাতা সহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।

মান ইজ্জৎ কাপড়-চোপড় সবই গিয়াছে, এখন প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হা রে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে—

বংশলোচনের চোখের সাম্‌নে একটা উগ্র বেগ্‌নি আলো খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশলক্ষ ভোল্ট্ ইলেকট্রিসিটি অদূরবর্ত্তী একটা নারিকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকট নাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

রাশি রাশি সরিষার ফুল। জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই, আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

* * * *

বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু এখনো সোঁ সোঁ করিয়া হাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া মেঘের পর্দ্দা ঠেলিয়া দেবতারা দু'চারটা মিট্‌মিটে তারার লণ্ঠন লইয়া নীচের অবস্থা তদারক করিতেছেন।

বংশলোচন কর্দ্দম-শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কে? রায়বাহাদুর। কোথায়? খালের নিকট। ও কিসের শব্দ? সোনাব্যাং। তাঁর নষ্টস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। ছাগলটা?

মানুষের স্বর কানে আসিতেছে। কে তাঁকে ডাকিতেছে? "মামা-—জামাইবাবু-—বংশু আছ?—হুজোর—"

অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। জন কত লোক লণ্ঠন লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে এবং তাঁহাকে ডাকিতেছে। একটি পরিচিত নারী-কণ্ঠে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।

রায়বাহাদুর চাঙ্গা হইয়া বলিলেন—"এই যে আমি এখানে আছি—ভয় নেই—"

* * * *

মানিনী বলিলেন—"আজ আর দোতলায় উঠে কাজ নেই। ও ঝি, এই বৈঠকখানা ঘরেই বড় করে বিছানা করে দে ত। আর দেখ্, আমার বালিসটাও দিয়ে যা। আঃ, চাটুয্যে মিন্‌সে নড়ে না। ও কি—সে হবে না,—

"হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—"

বংশলোচন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ, ওটা আবার এসেচে? নিয়ে আয় ত লাঠিটা—"

লুচি ক'খানি খেতেই হবে

এই গরম লুচি ক'খানি খেতেই হবে, মাথা খাও। তোমার সেই বোতলটায় কি আছে—তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব নাকি?"

মানিনী বলিলেন—"আহা কর কি, মেরো না। ও বেচারা বৃষ্টি থাম্‌তেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েচে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ, হরি মধুসূদন!"

* * * *

লম্বকর্ণ বাড়ীতেই রহিয়া গেল, এবং দিন দিন শশি-কলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তার আধ হাত দাড়ি গজাইল। রায় বাহাদুর আর বড় একটা খোঁজ খবর করেন না, তিনি এখন ইলেকশন লইয়া ব্যস্ত। মানিনী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোণা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তার জন্য সাবান ও ফিনাইল ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাকে বিদ্রূপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়,—নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে—"ব-ব-ব"—অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও, আমি ও সব গ্রাহ্য করি না।

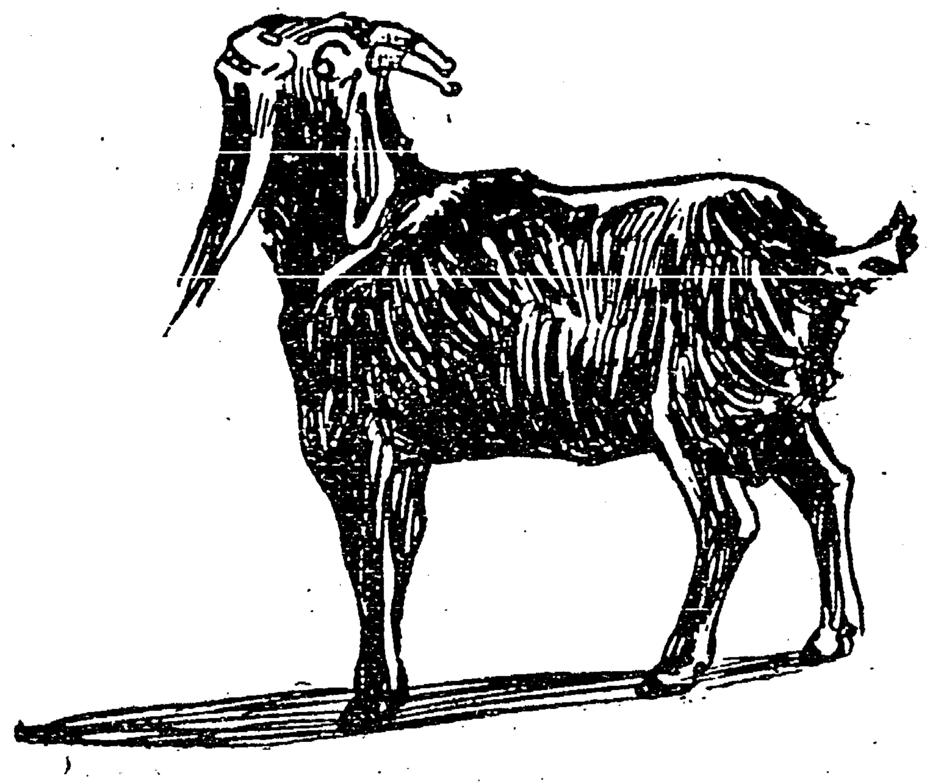

শারদ লক্ষ্মী

বন্দে আলী মিয়া

পরীর সাদা মেঘ ভেলাতে অথই ঘন গগনে
নাম্‌লে যদি, ঘর্‌কে এস আজকে শুভ লগনে।
বেণুর বনে বাজ্‌চে দূরে তোমার আশা-বাঁশরী;
তমাল তালে ঢেউ লেগেচে আঁচল তব না সরি'।
থম্‌কে চলা— কাঁপন আনে মুকুট ঝলে বাতাসে,
কাশের বনে চামর দোলে আসন চির পাতা সে।
শিউলি ঝরে অঝোর ধারে হাসির চাপা মাধুরী;
কনকচাঁপা খোঁপায় পাড়া কবির প্রিয়া আদুরী।
উতল বায়ে মাতাল নদী লাসের লীলা গমকে
সুদূর হতে ডাক্‌তে গিয়ে পরশ লাগি চমকে।
ভোরের রাঙা তরুণ আলো হান্‌চে কি সে বেদনা,
পরবাসীর জমাট করা ভোলায় দুখ চেতনা।
সবুজ তব আল্‌তা-রেখা উদাস-চলা চরণে,
শিমূলতলে যাচ্চে মুছে উড়্‌চে শাড়ী পরনে।
কাঁদ্‌চে কে রে প্রিয়ের লাগি রুদ্ধ ঘরে একাকী;
সেই ব্যথাতে জাগ্‌চে মনে স্মৃতির-ধোয়া লেখা কি?
পথিক কে সে বাস্‌তো ভালো সোহাগ-ভীতু-নয়নে,
দুইটি চোখে একটি দিঠি কাঁপ্‌তো মায়া-র...।

বৃটীশ-সাম্রাজ্য-প্রদর্শনী

ইংলণ্ডের ওয়েম্‌লি (Wembley) সহরে বৃটীশ-সাম্রাজ্য-প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। সাম্রাজ্যের সমস্ত স্থান হইতে নানাবিধ দ্রব্য, শিল্পসম্ভার এই প্রদর্শনীতে আনীত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের জনমণ্ডলী এই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এই সকল পরিদর্শন করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানা দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছে; অনেক শিল্পী প্রদর্শনী-স্থলে তাঁহাদের শিল্প-নৈপুণ্য হাতে-কলমে দেখাইতেছেন। এই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ভারতীয় যে সমস্ত দ্রব্য প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার অল্প কয়েকখানির আলোক-চিত্র নিম্নে দিলাম; ইহা হইতেই পাঠক-পাঠিকাগণ এই প্রদর্শনী যে কেমন সুন্দর হইয়াছে, কত দ্রব্যজাত যে এখানে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

পাতিয়ালার পশু-চর্ম্ম-বিন্যাস

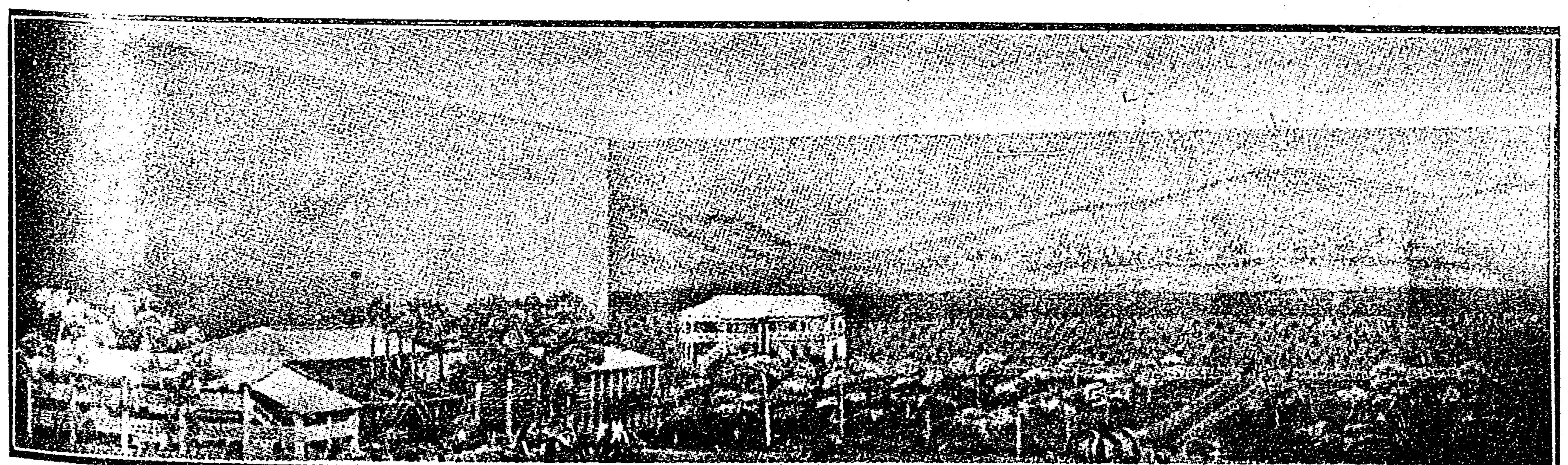

চা-বাগানের দৃশ্য

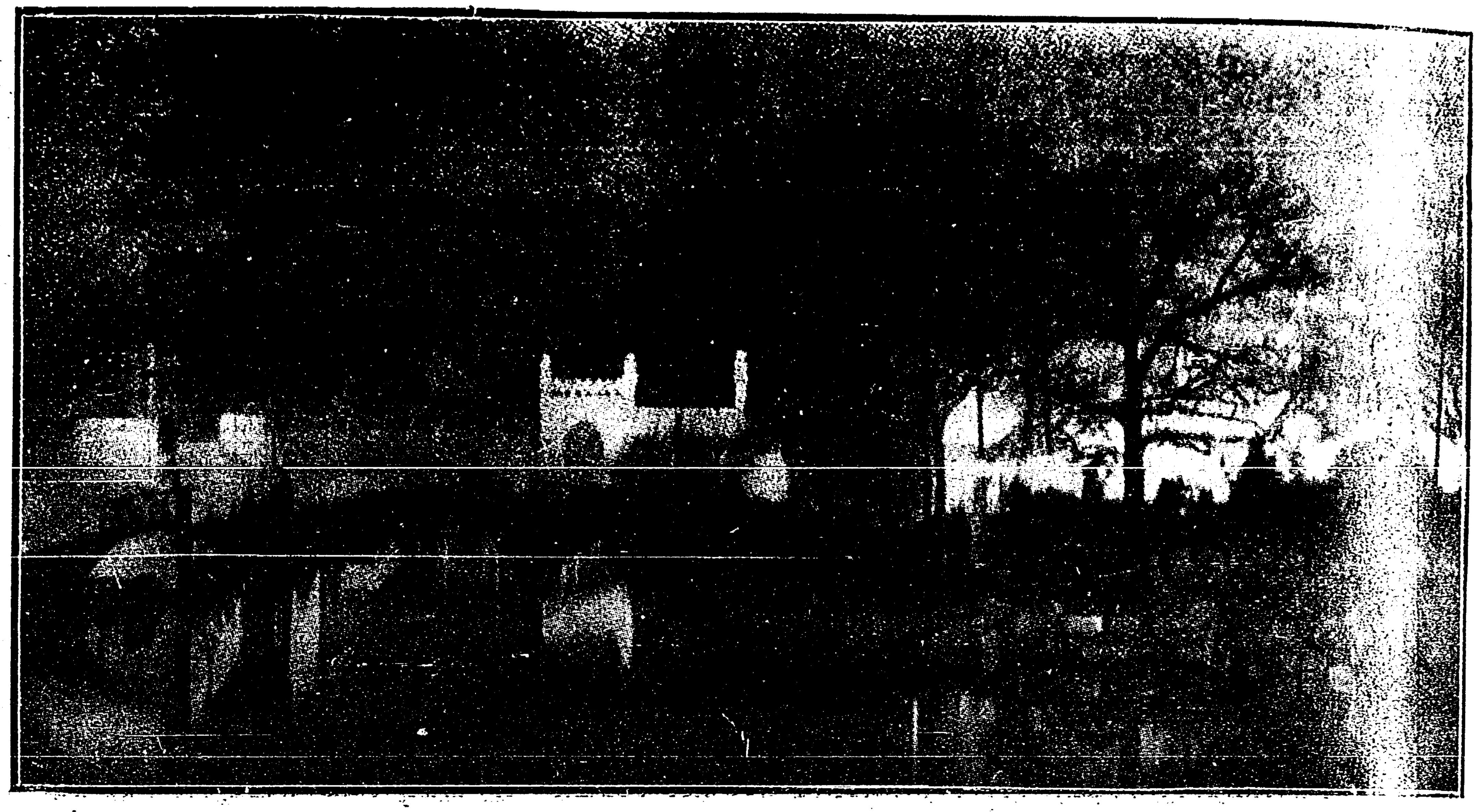

হ্রদ হইতে রাত্রিকালের দৃশ্য—ওয়েম্‌লি

প্রদর্শনীতে মাদ্রাজ বিভাগের দৃশ্য

মহীশূরের কাঠের উপর কারকার্য্য

নীলের কারখানা—বিহার ও উড়িষ্যা

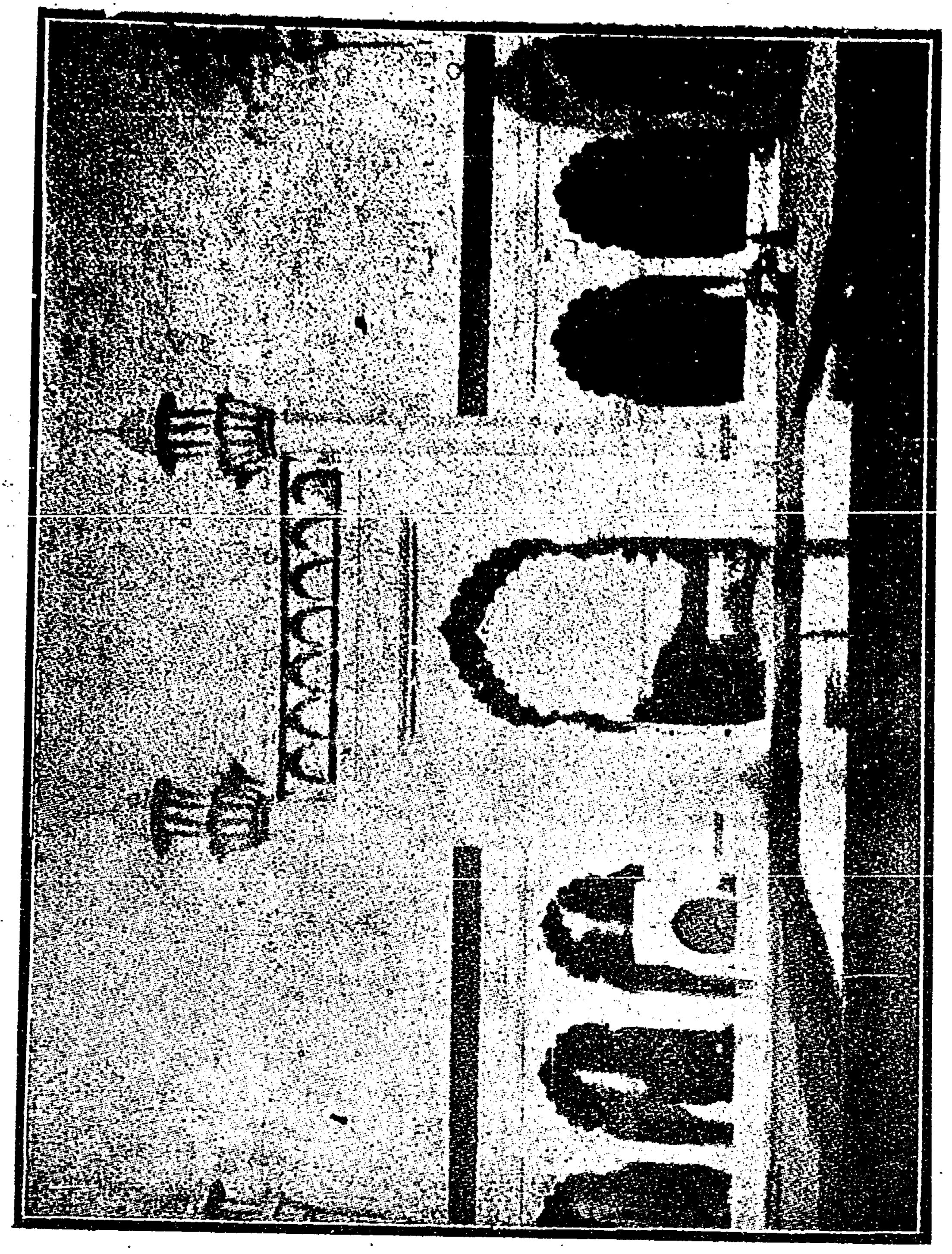

ভারতীয় প্রদর্শনীর প্রবেশ-পথের দৃশ্য

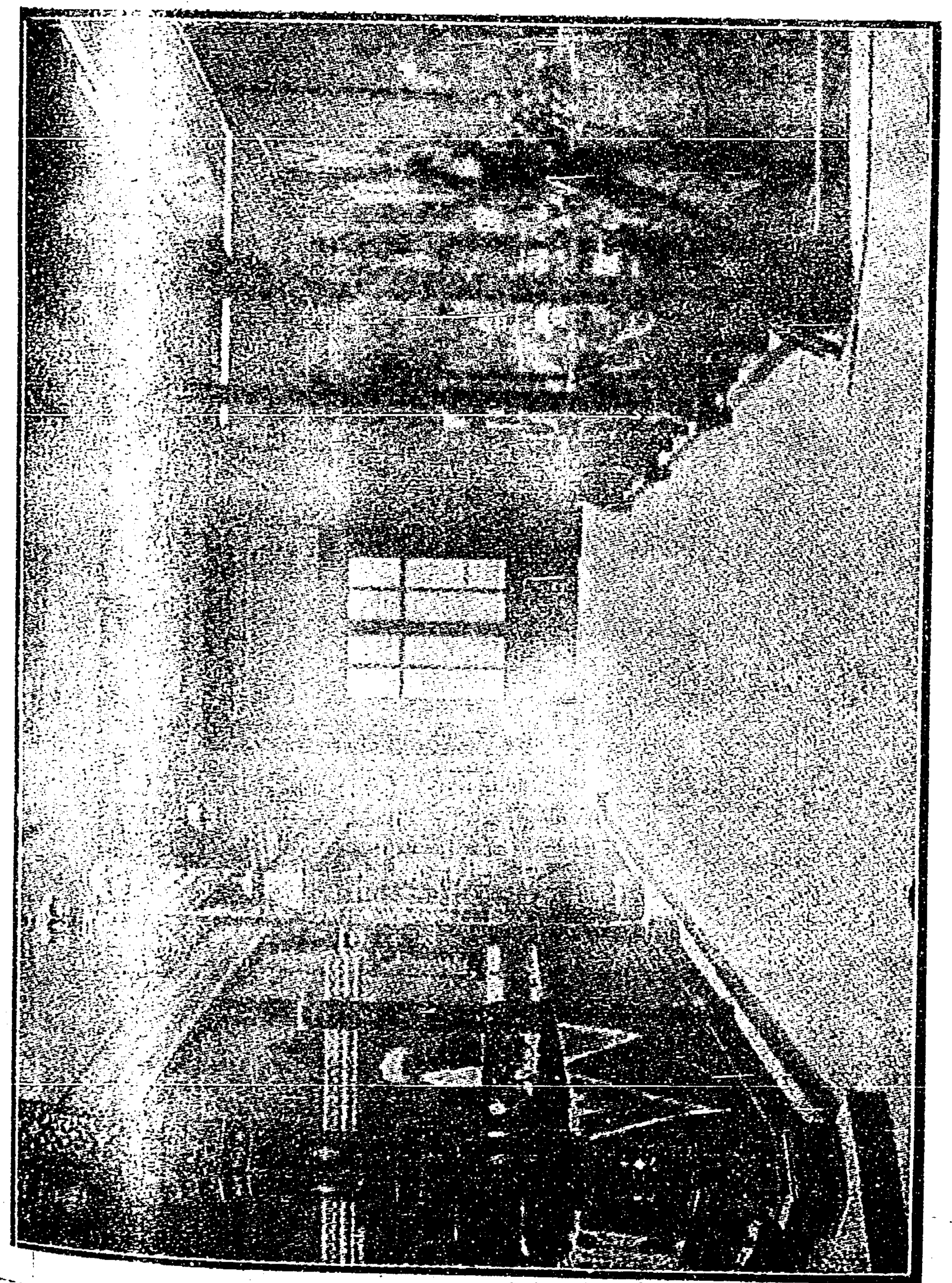

পঞ্জাবের চালার সরঞ্জাম ও হাতীদাঁতের কাজ

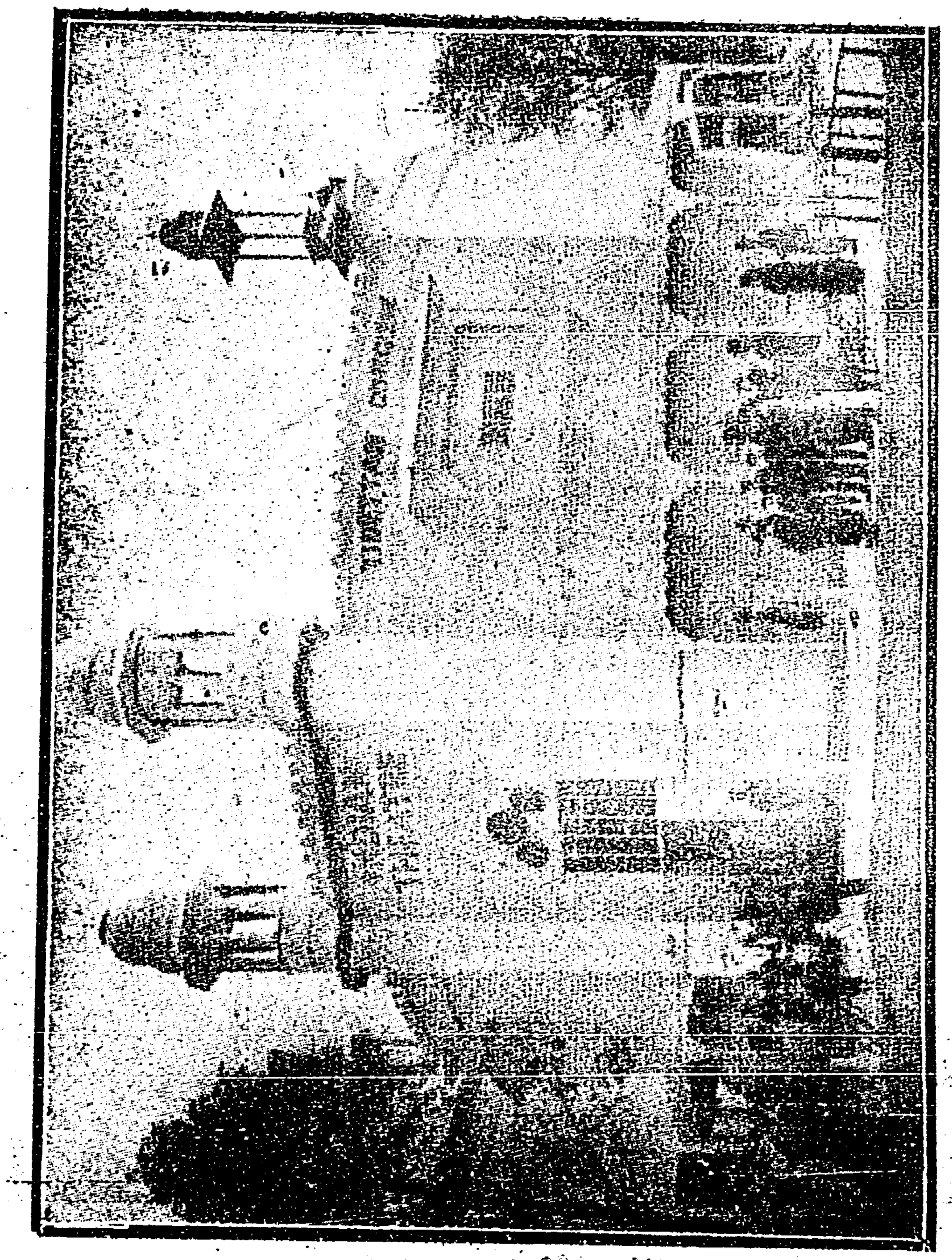

ভারতীয় প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের বহির্দৃশ্য

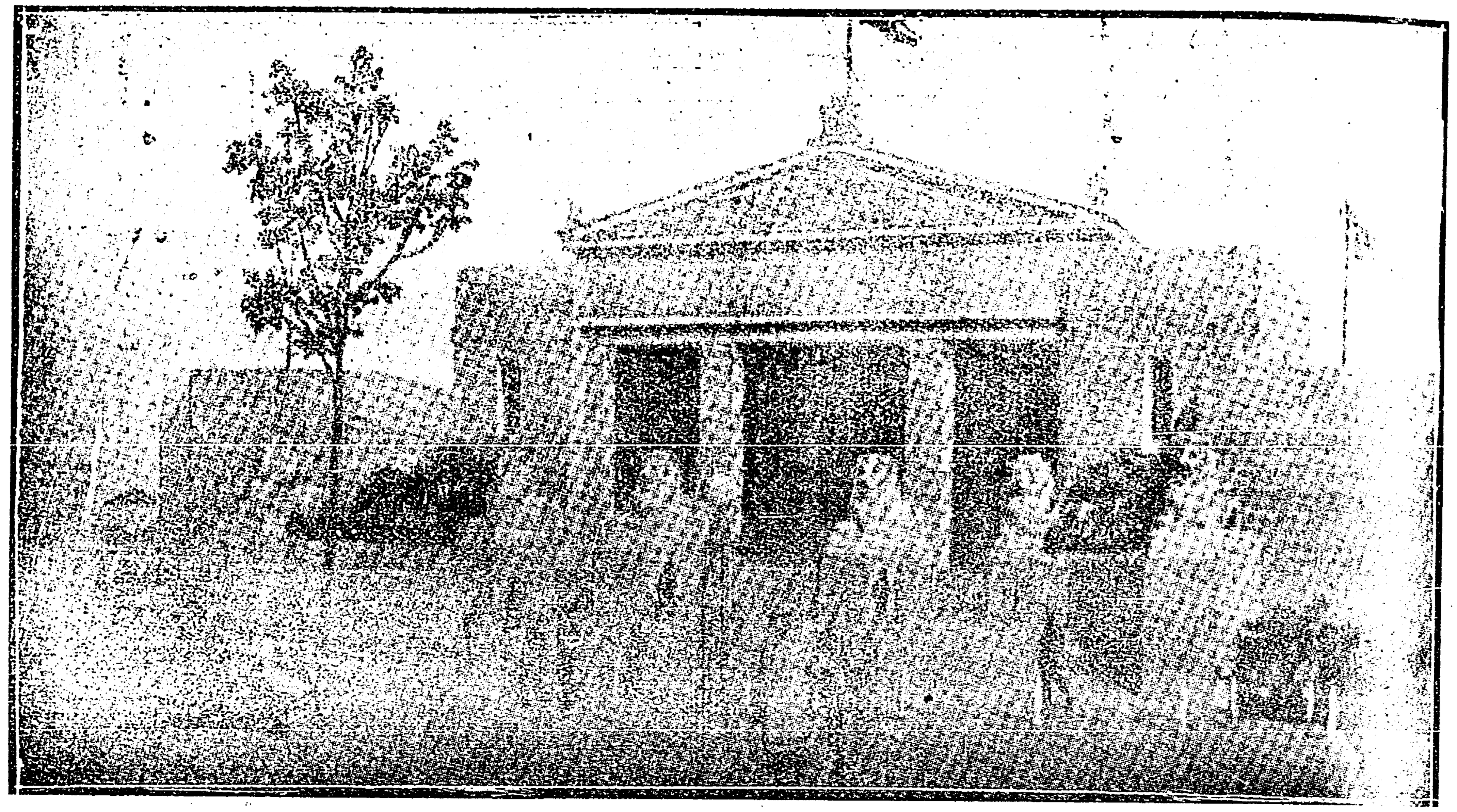

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আফিস

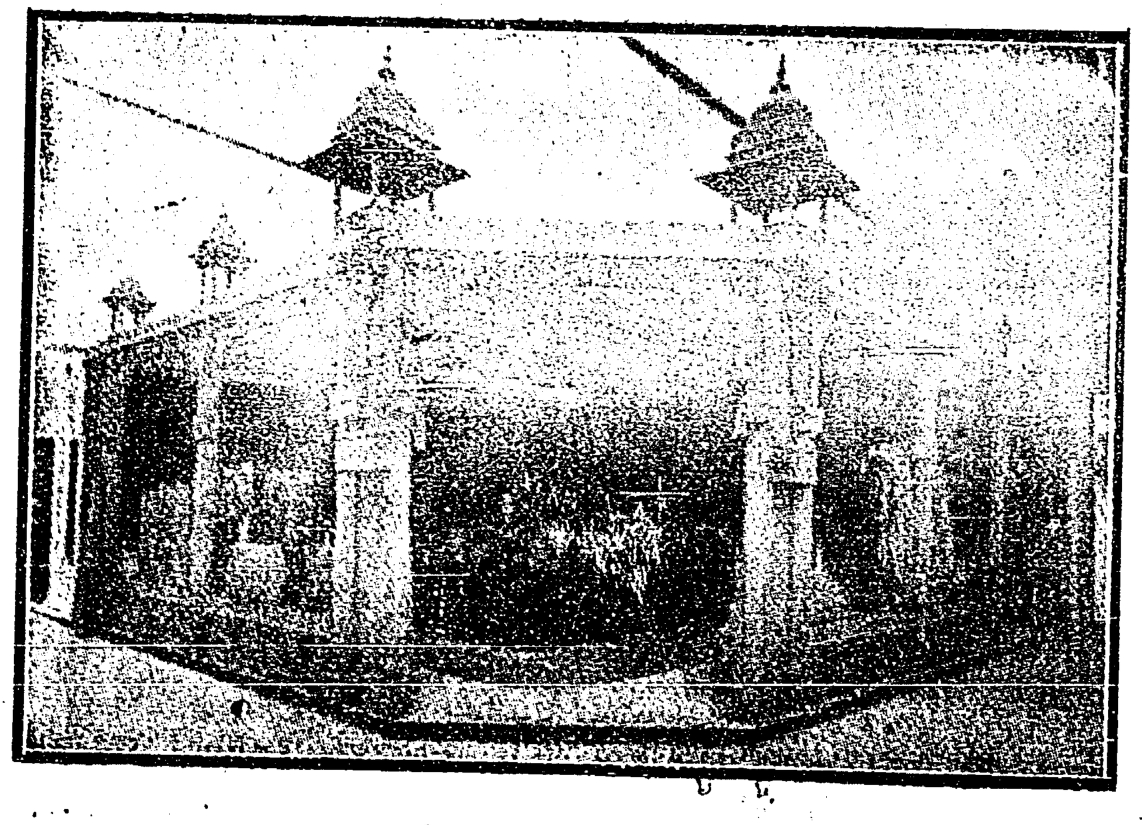

বিকানীর প্রদর্শনীর বহির্দৃশ্য

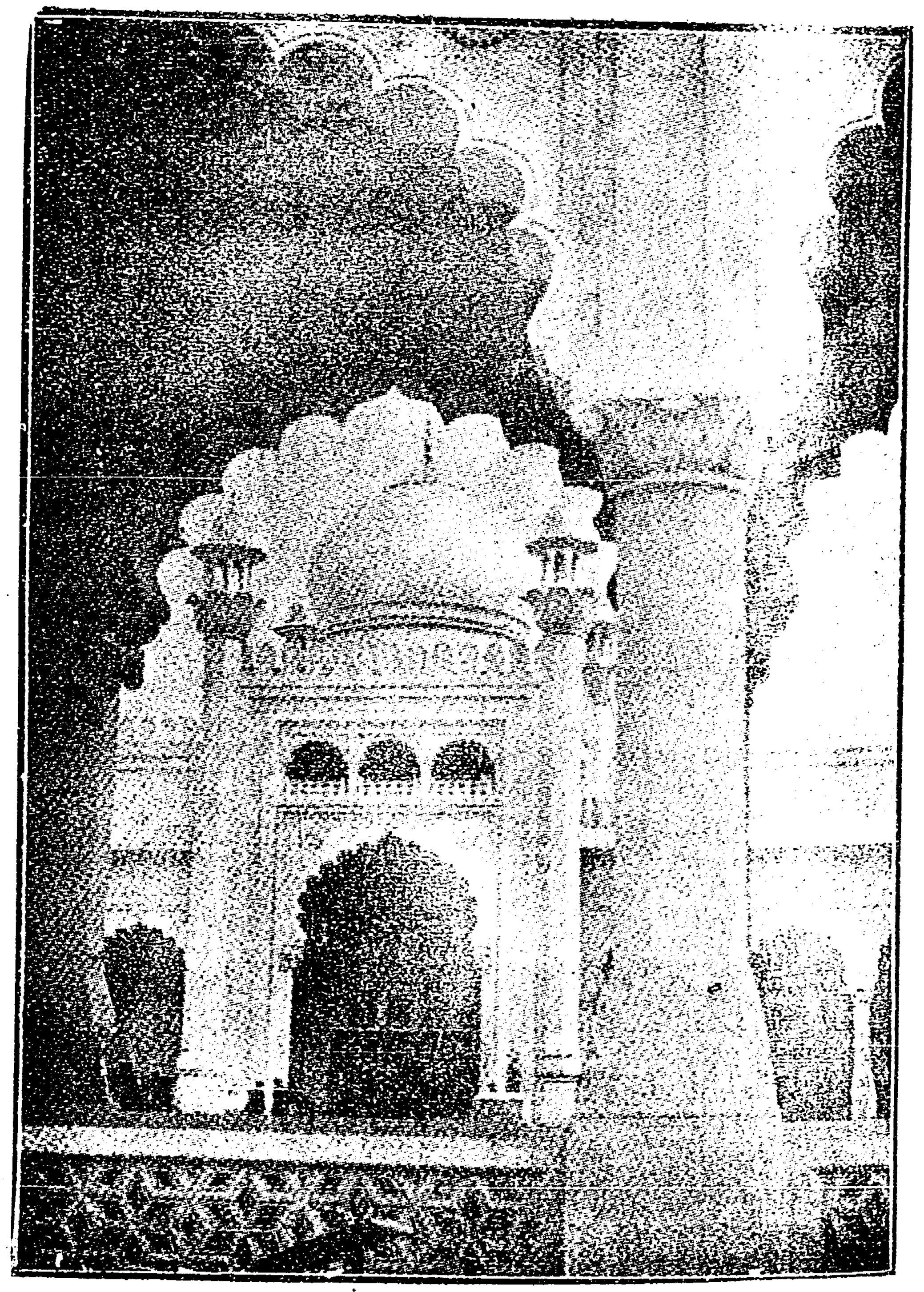

ভারতীয় প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশ-দ্বার

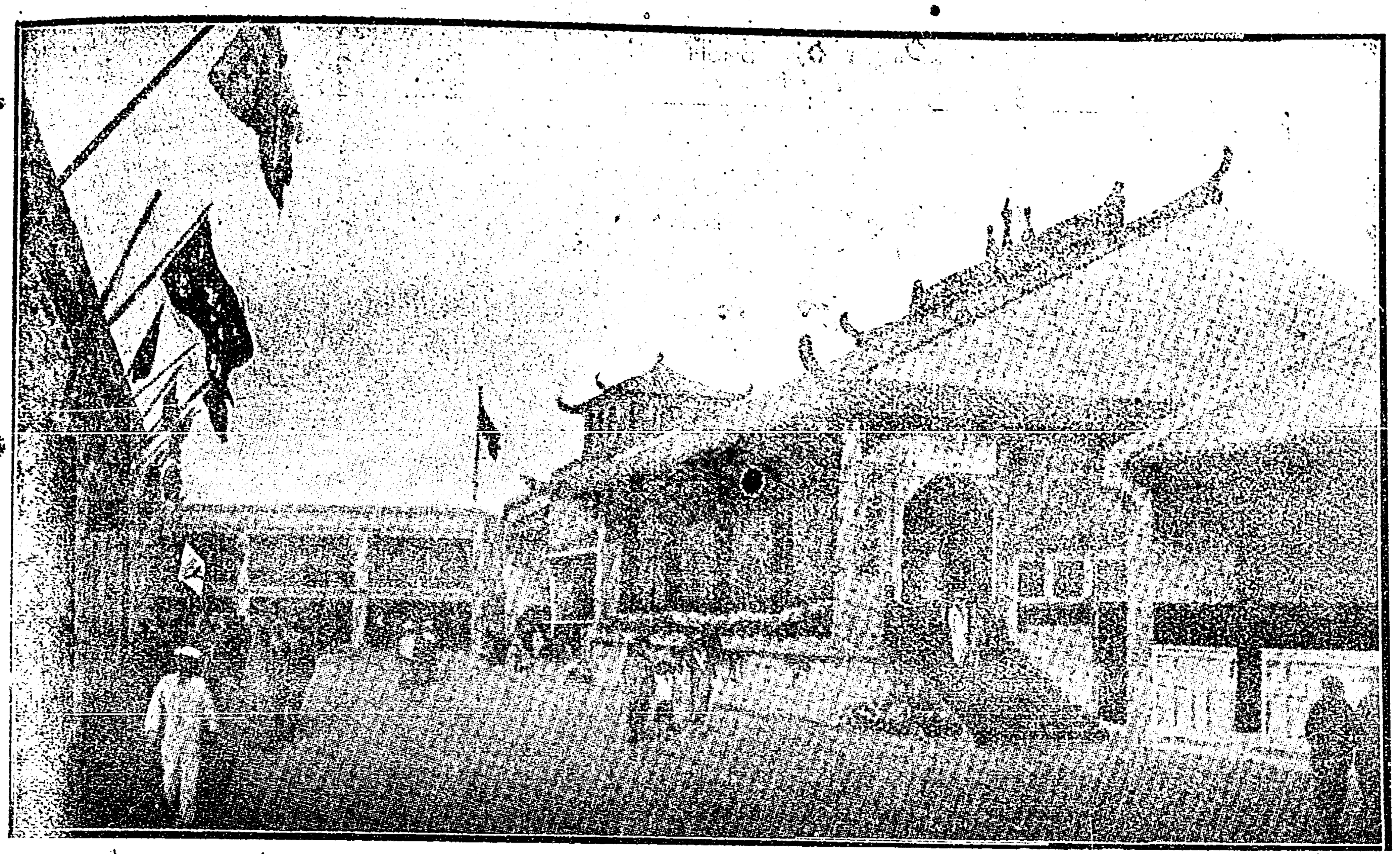

হংকংয়ের প্রদর্শনী

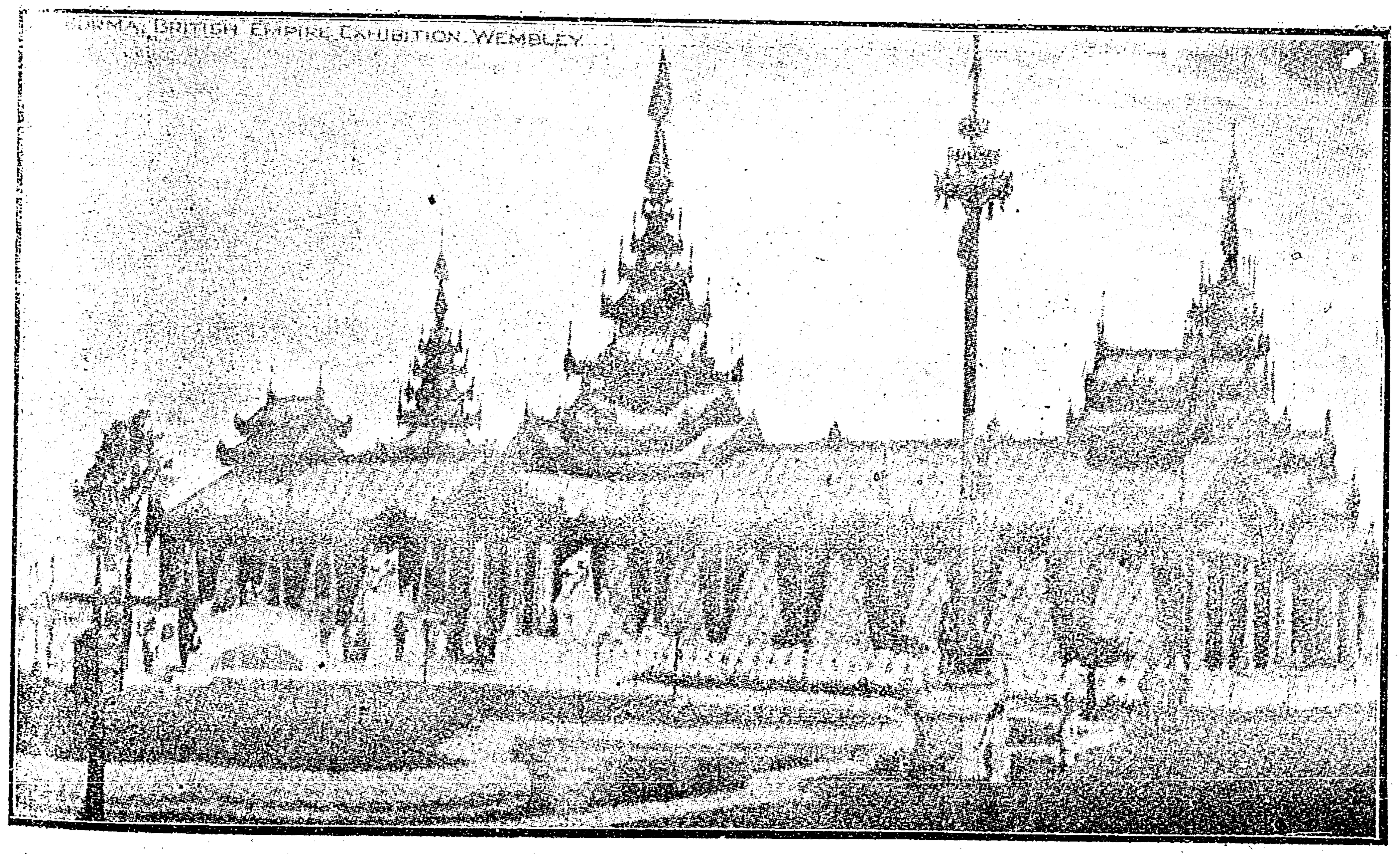

ব্রহ্মদেশের প্রদর্শনী

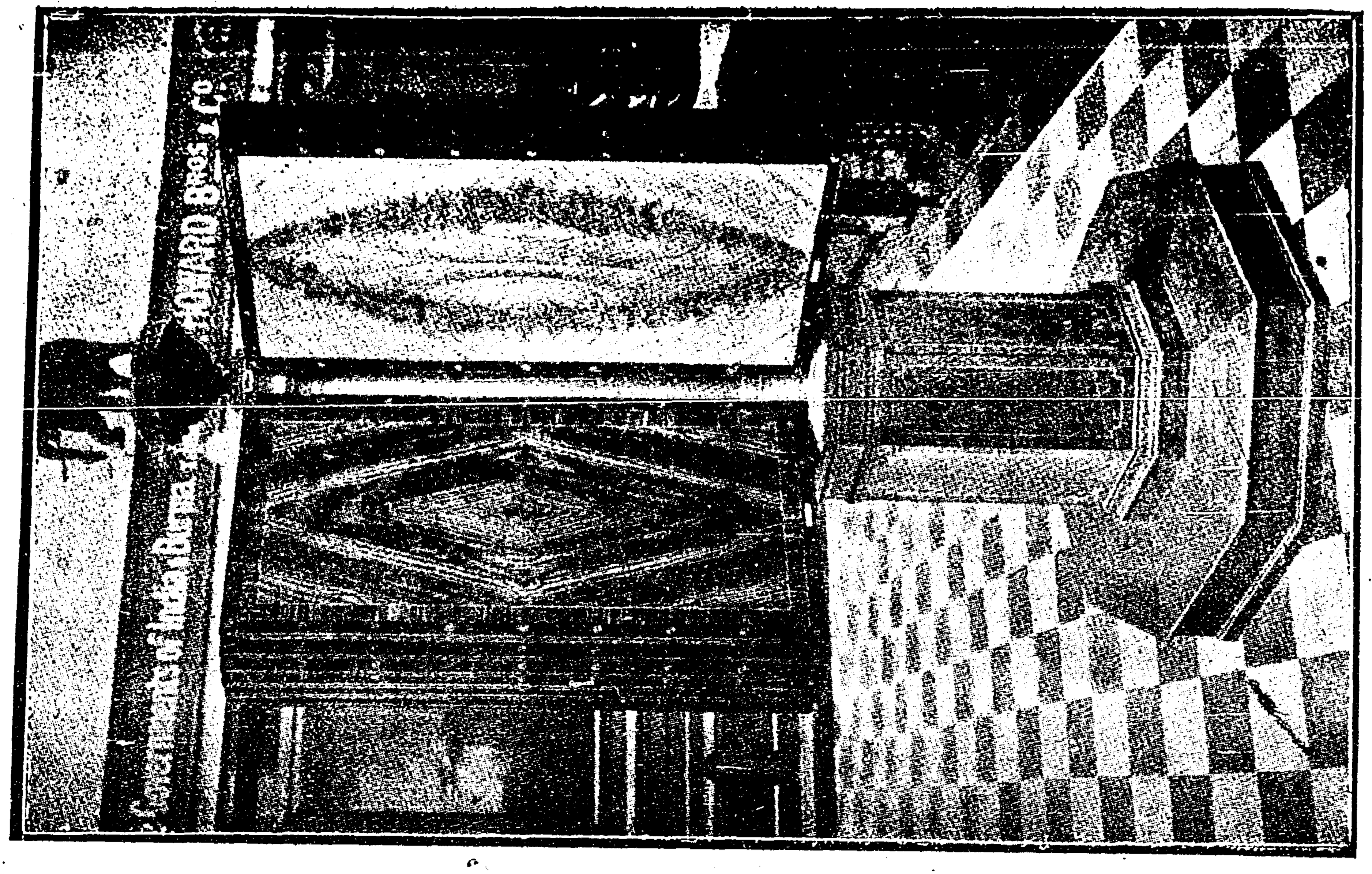

ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বার

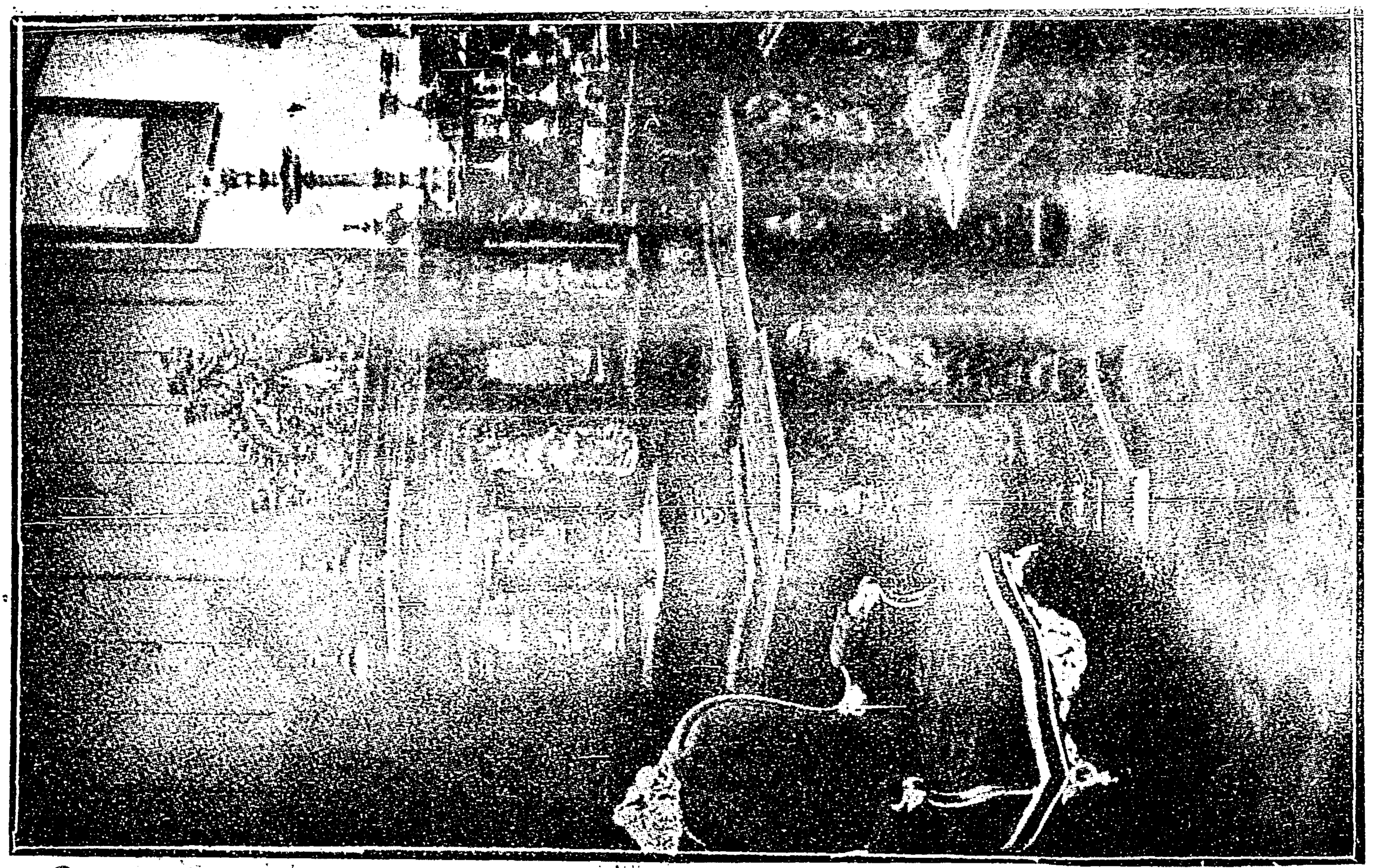

ত্রিবাঙ্কুরের কাঠের উপরি কারুকার্য্য

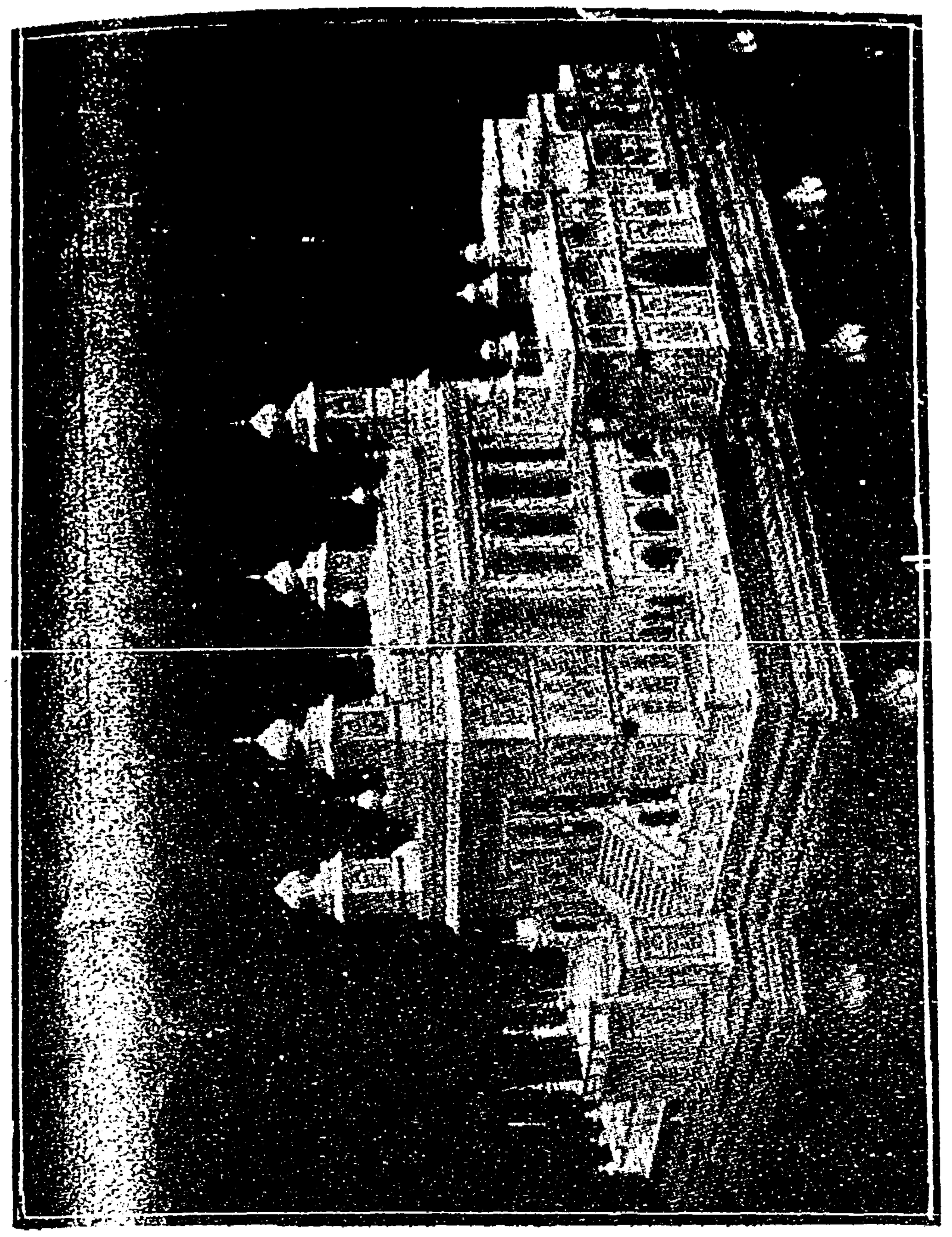

বাঙ্গালাদেশের শোলার কারুকার্য্য

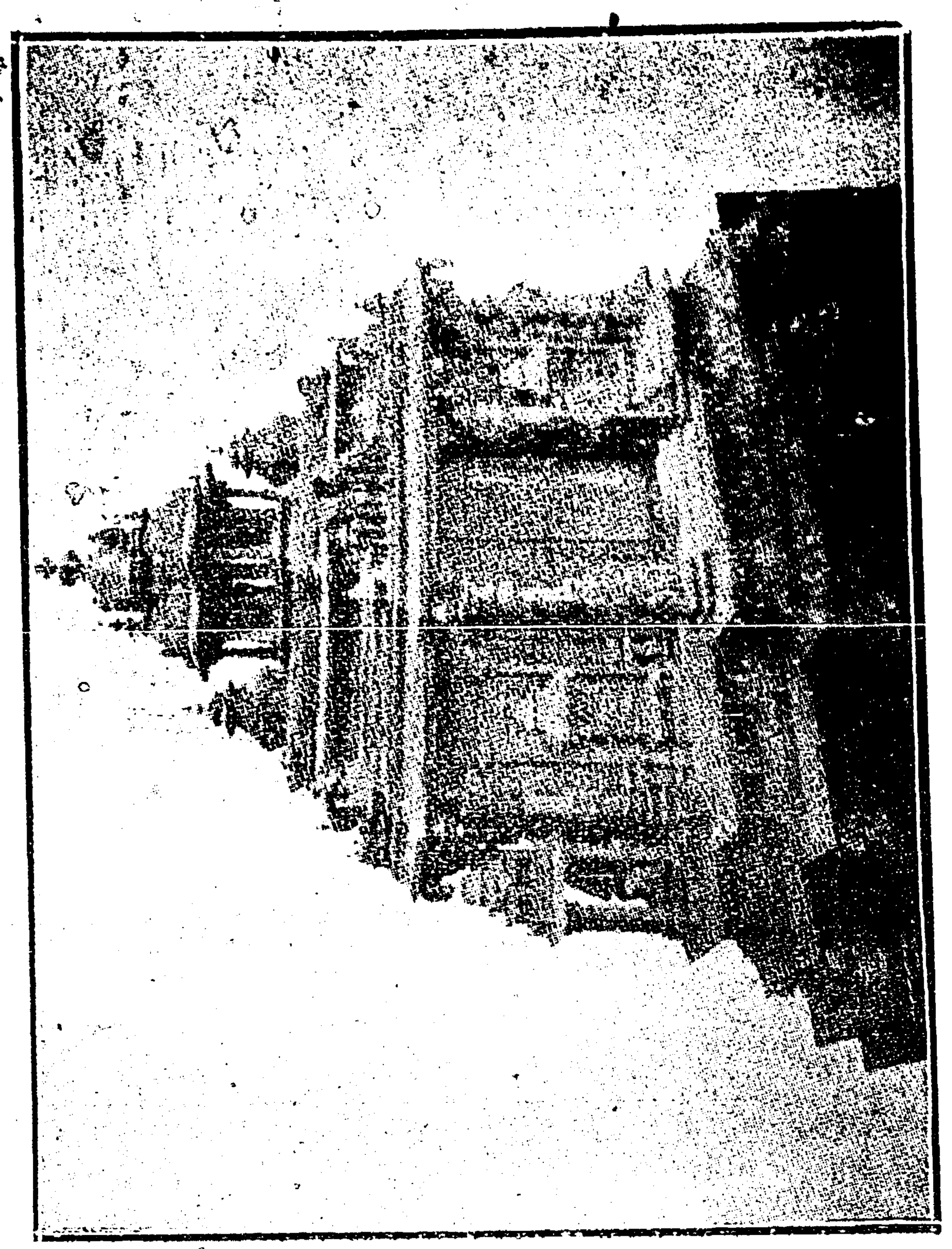

মহীশূরের চন্দনকাঠের কারুকার্য্য

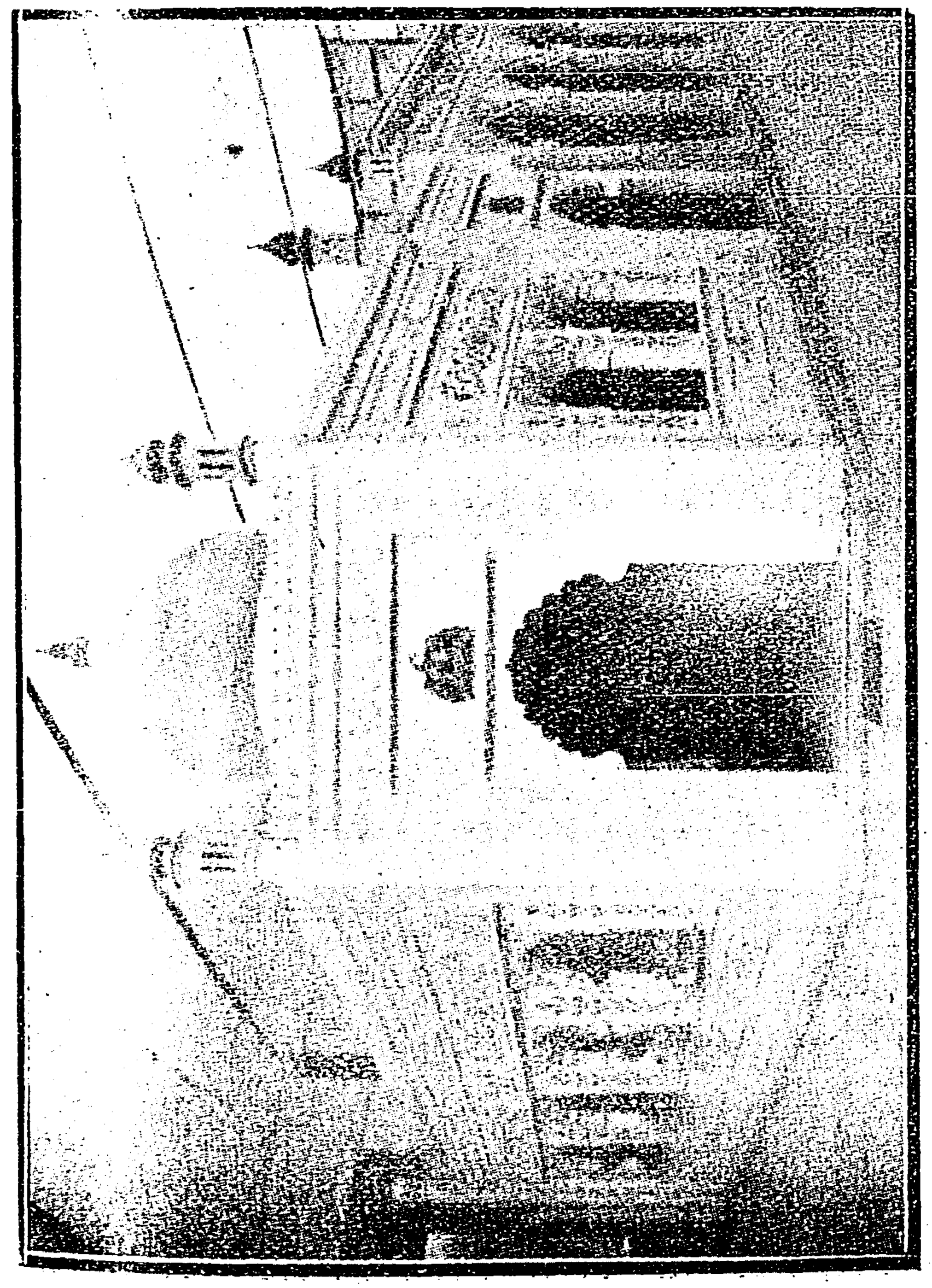

বরোদা প্রদর্শনীর বহির্দৃশ্য

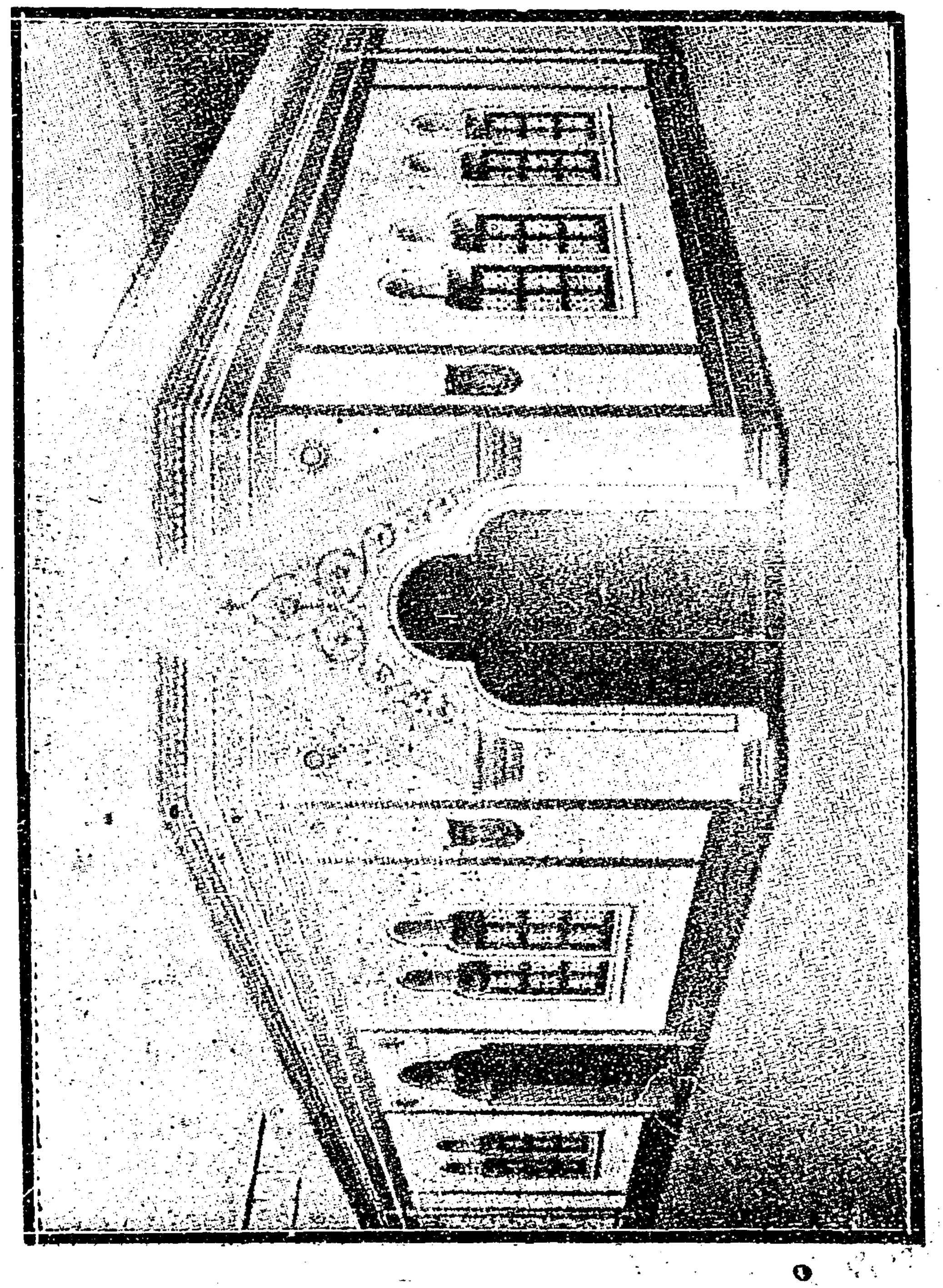

কাশ্মীর-প্রদর্শনীর বহির্দৃশ্য

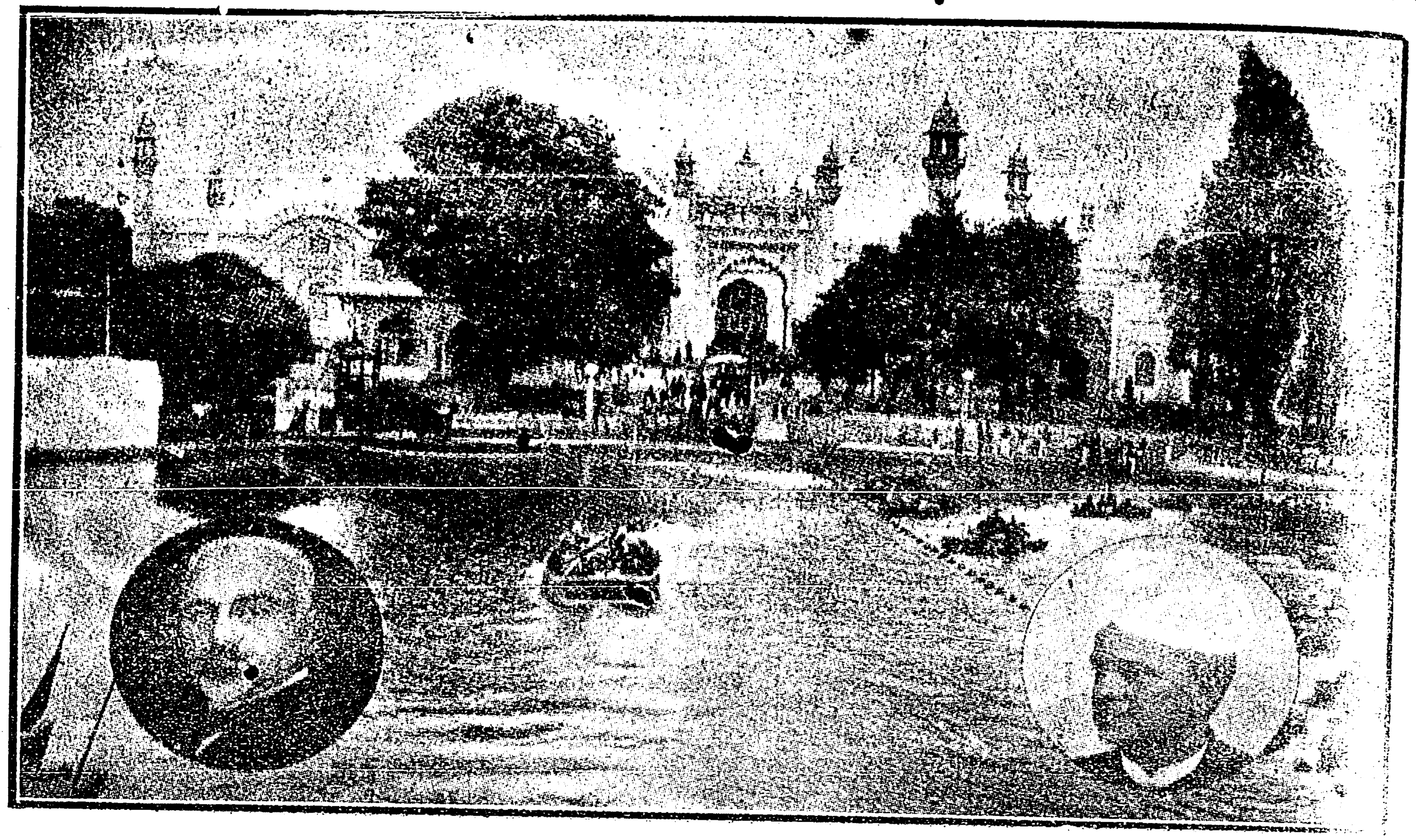

সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে ভারতীয় শাখার এই দৃশ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট [বামভাগে—সার দাদিজ দালাল (হাই কমিশনার) দক্ষিণ ভাগে—দেওয়ান বাহাদুর টি, বিজয়রাঘবাচার্য্য (ভারতীয় বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ)]

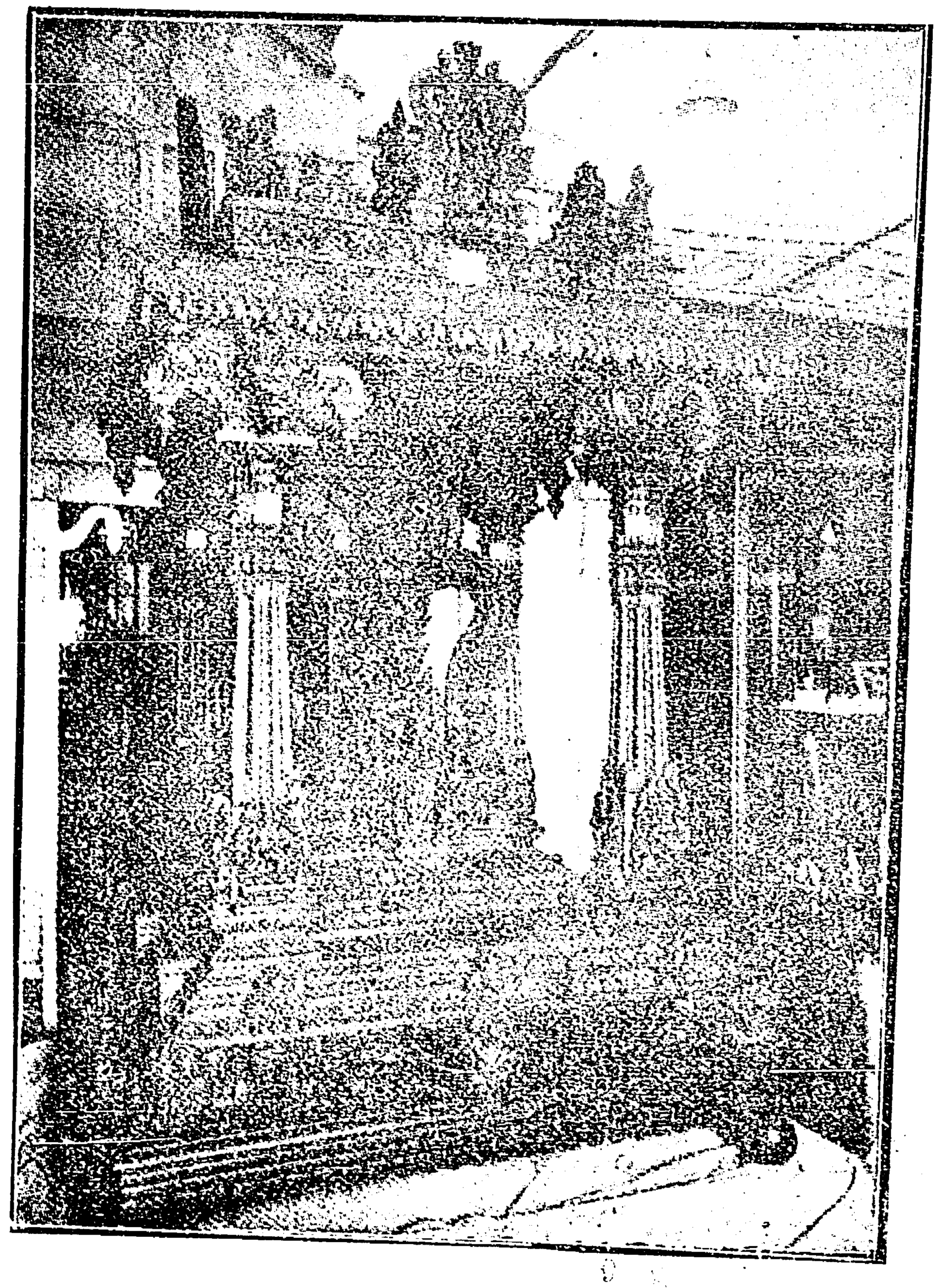

মান্দ্রাজের কারুকার্য্য

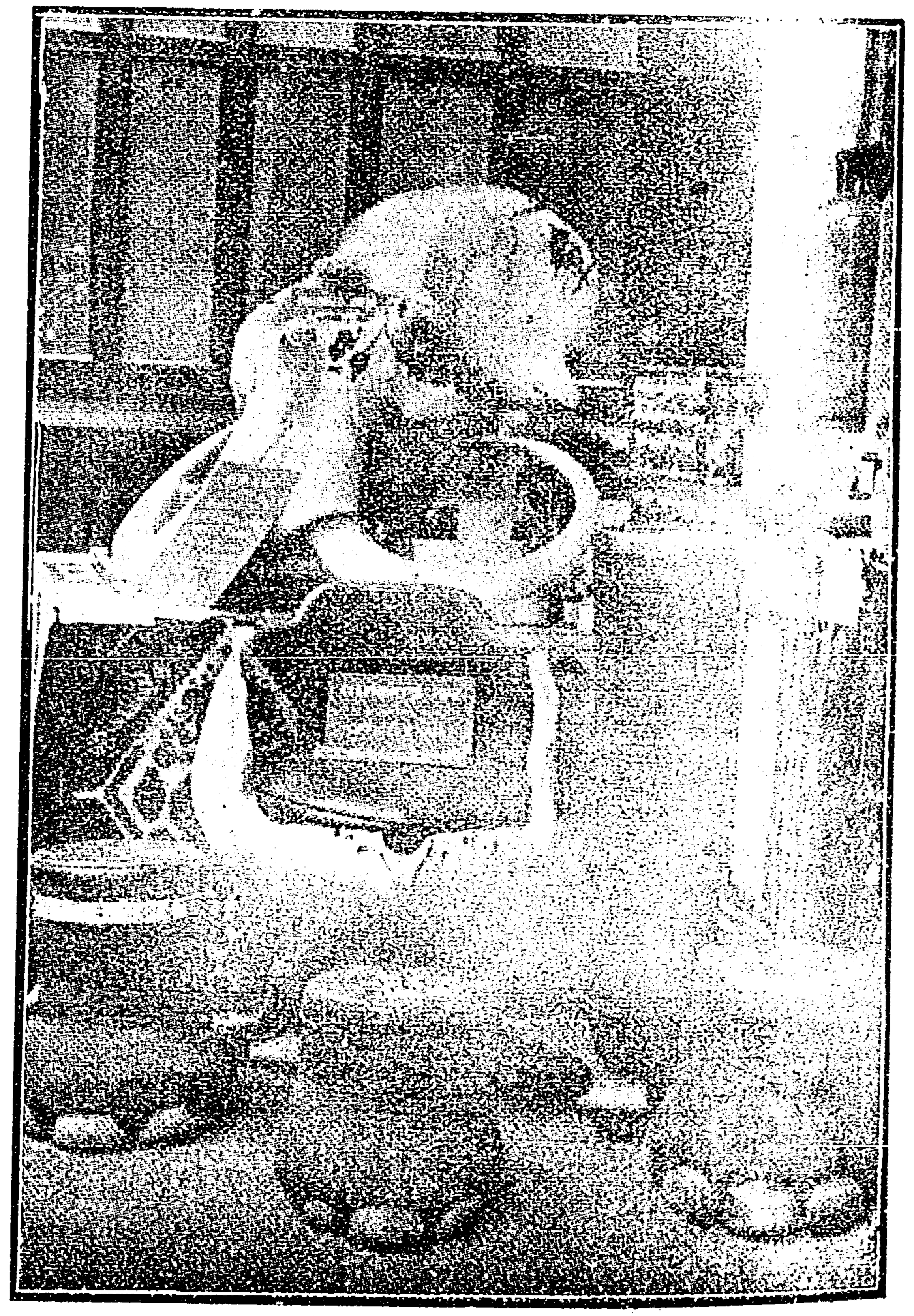

মহীশূরের শিকার-লব্ধ হস্তীদণ্ড, চর্ম্ম, পদ ইত্যাদি

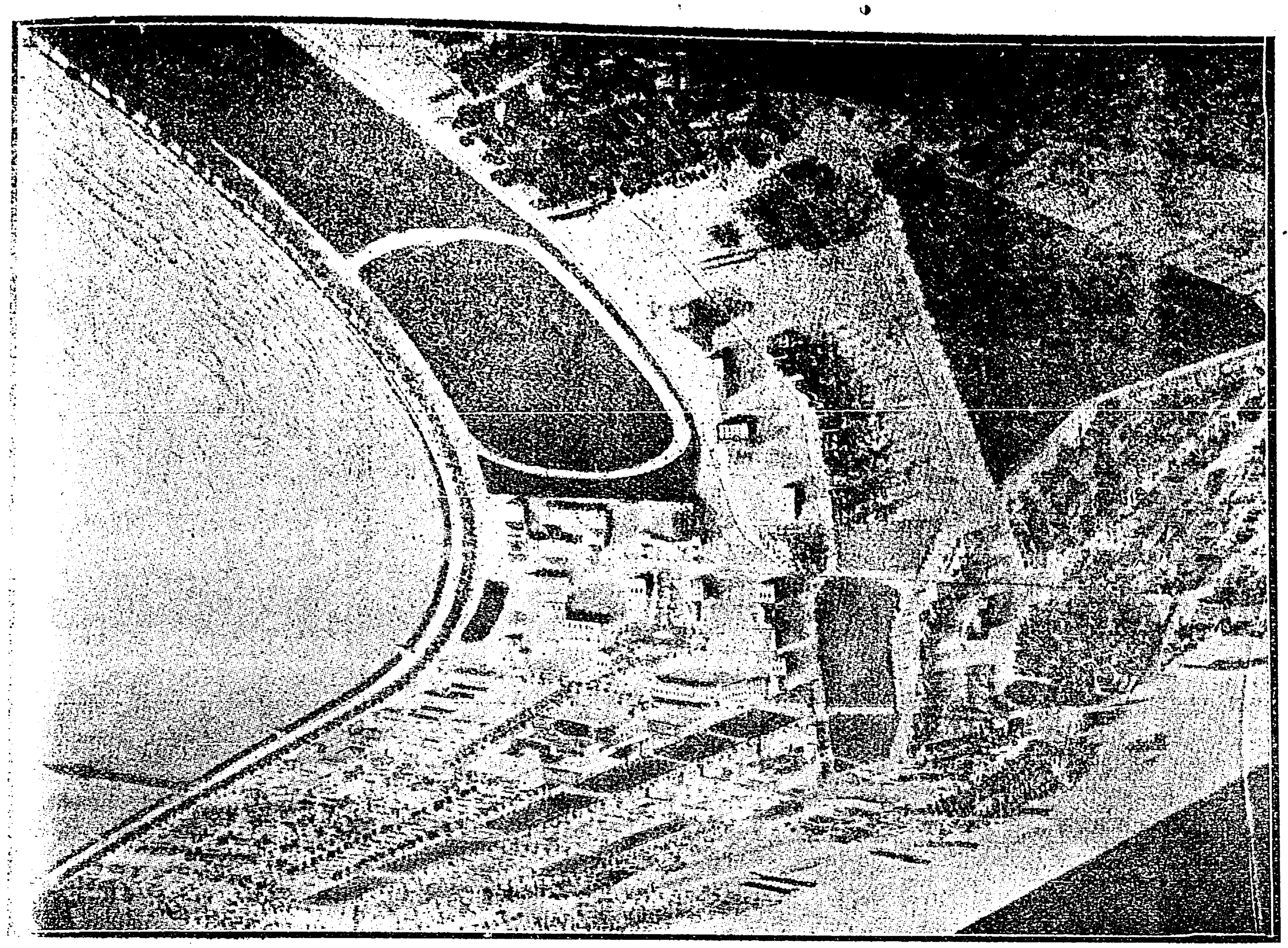

বোম্বাইয়ের সমুদ্র-তীর

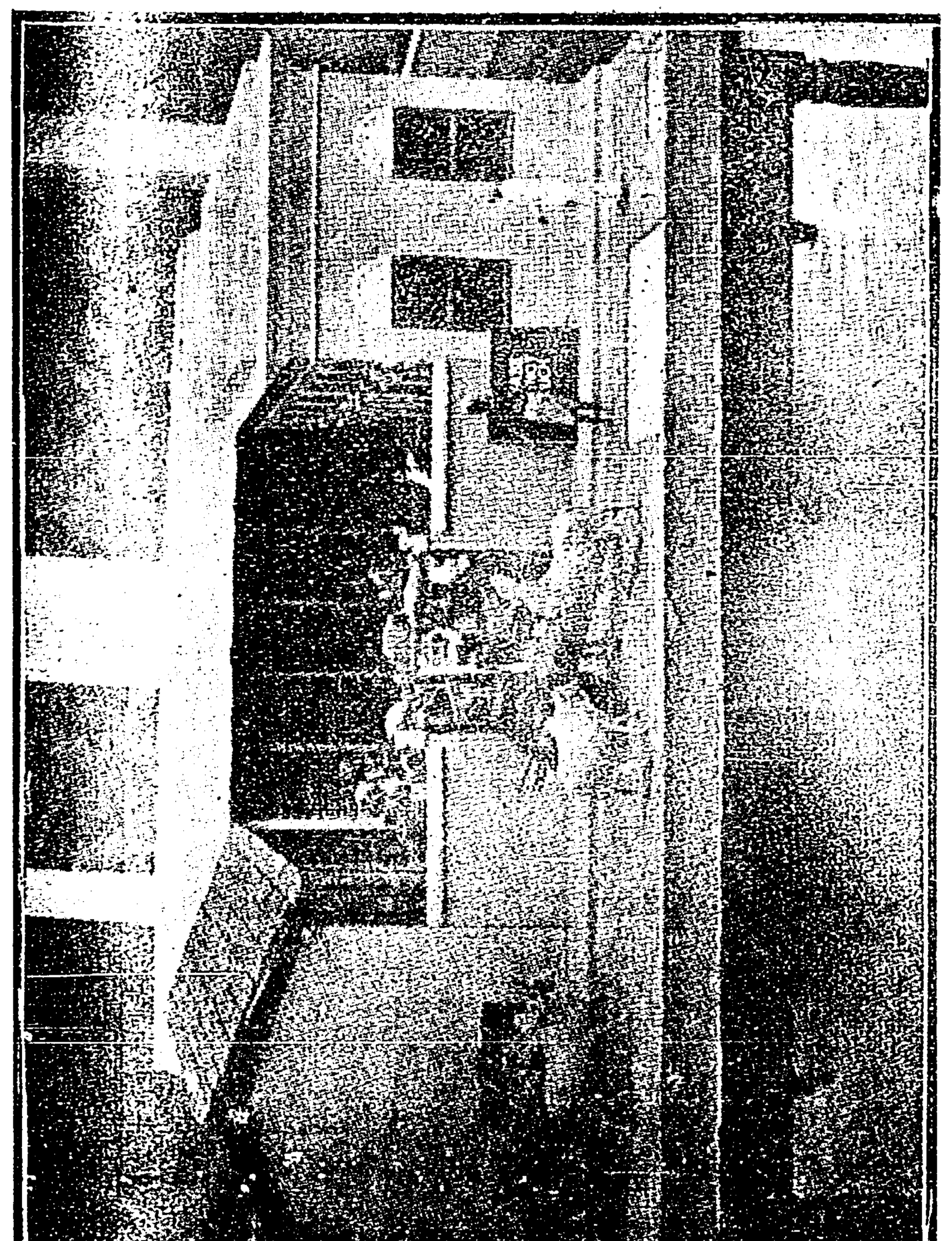

ঢাকা-কারখানার দৃশ্য—বিহার ও উড়িষ্যা

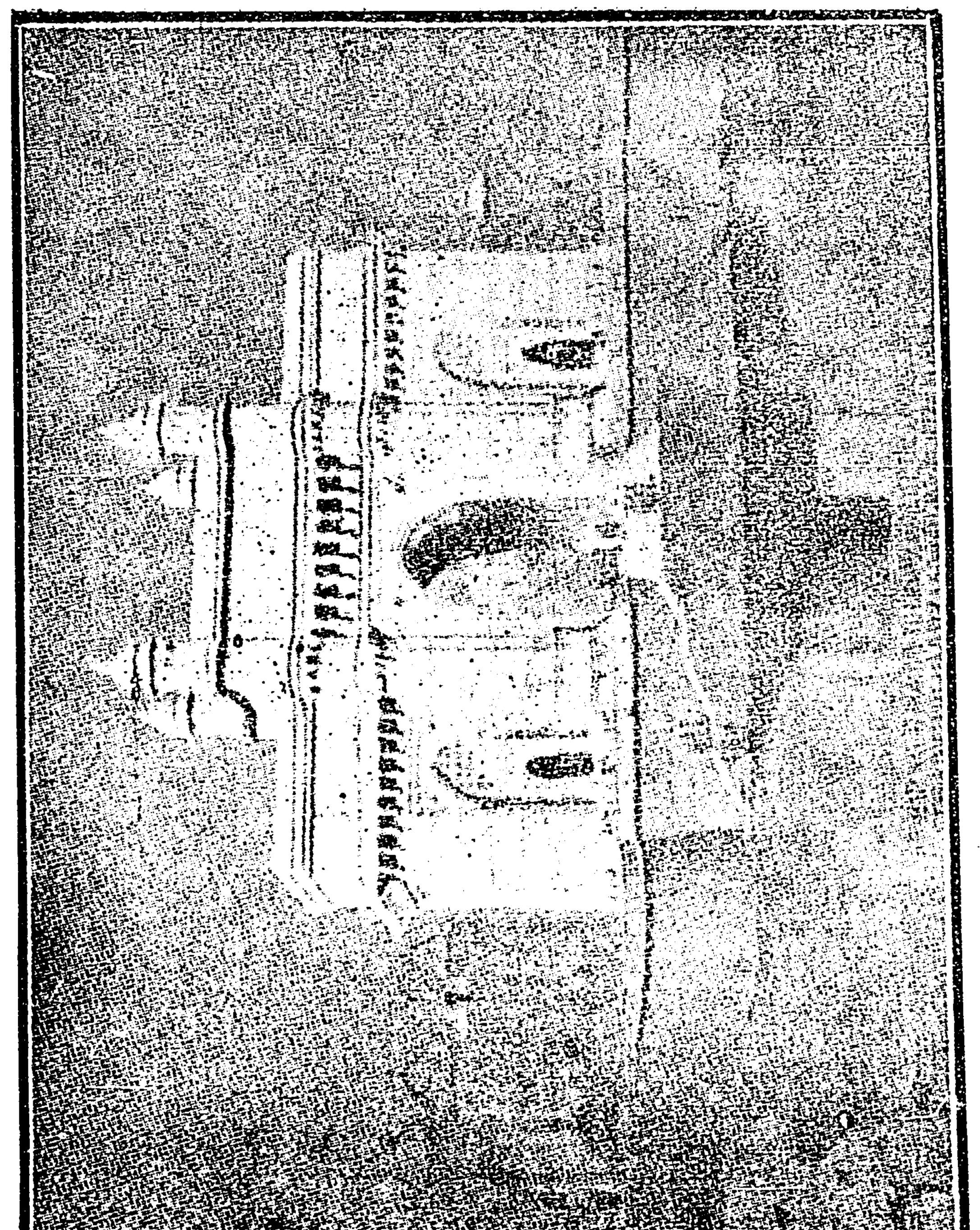

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী বোম্বাই নগরে যে তোরণ-সম্মুখে প্রথম এদেশের ভূমিতে পদার্পণ করেন, সেই তোরণের দৃশ্য

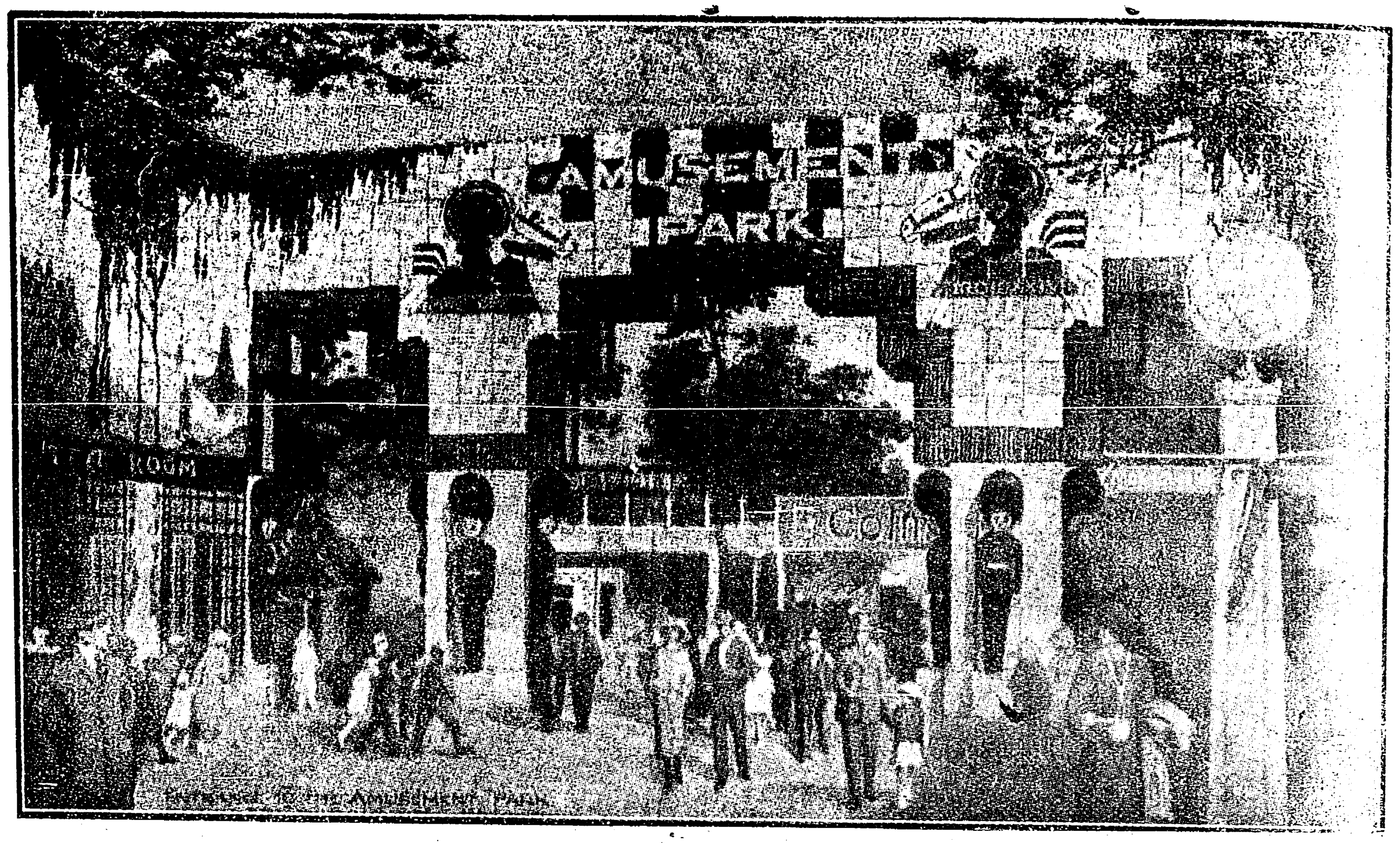

আমোদ-প্রমোদ বিভাগের প্রবেশ-দ্বার

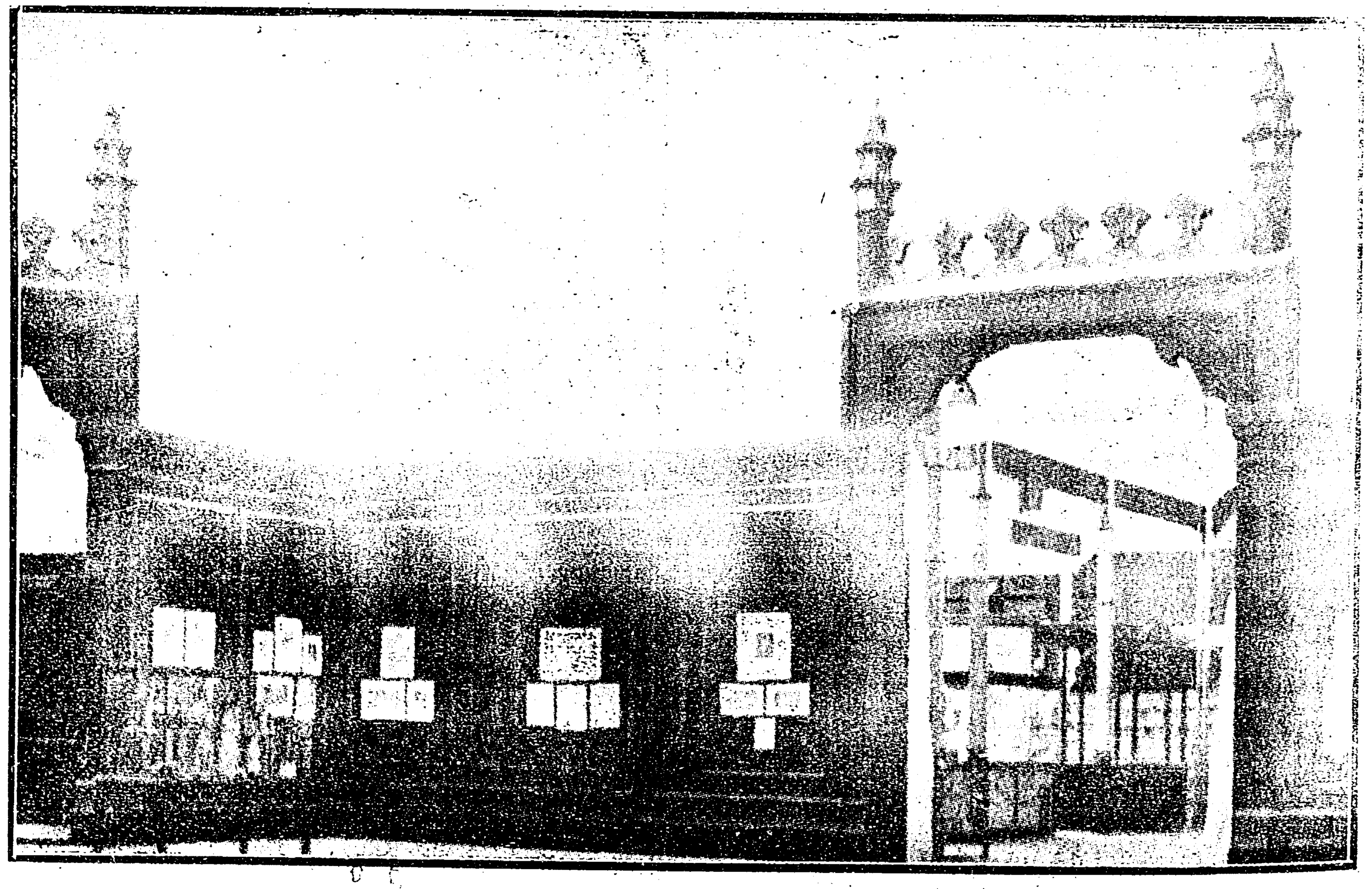

প্রদর্শনীতে বোম্বাইয়ের শিল্প-সদন

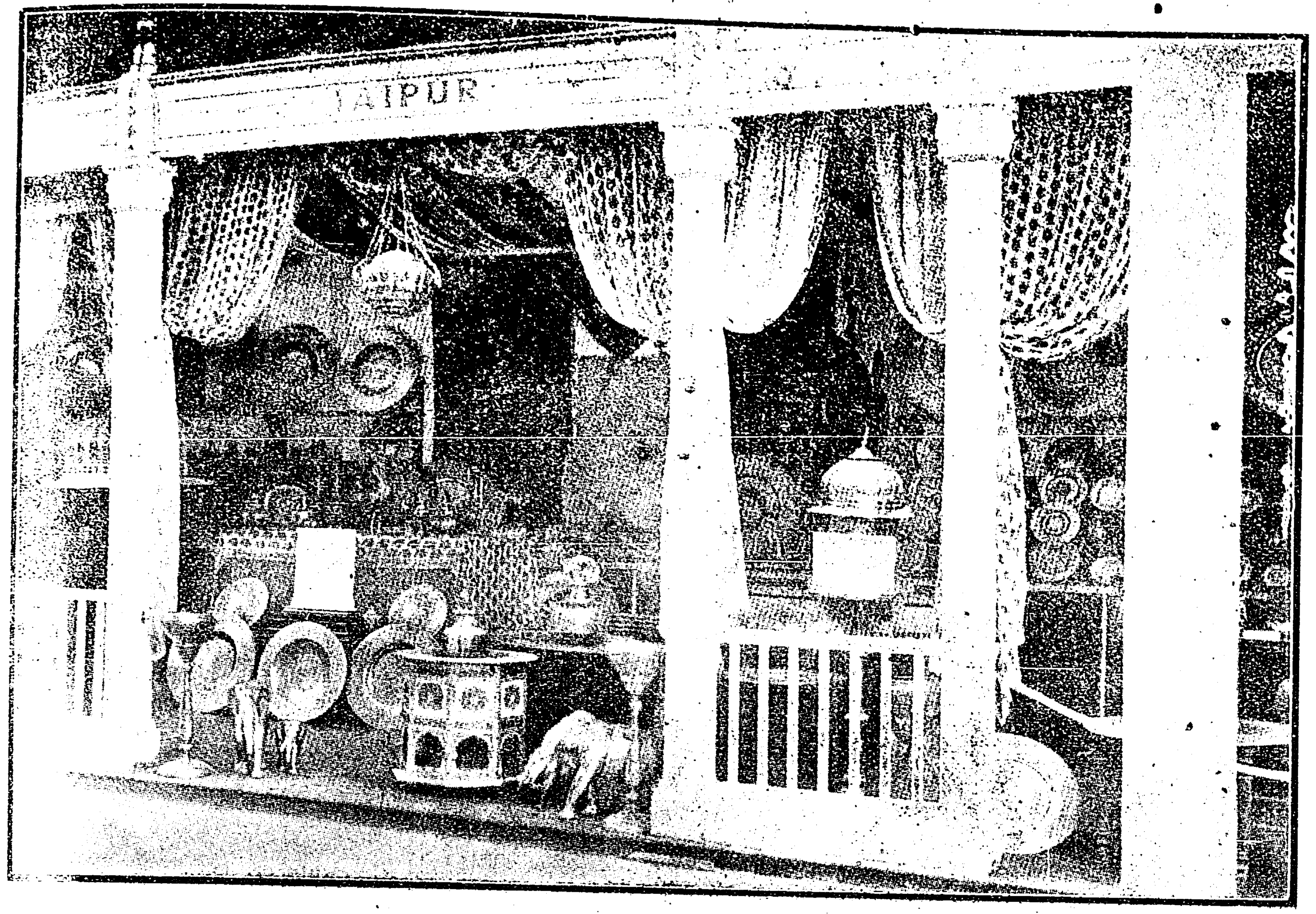

জয়পুরের কাঁসার কারুকার্য্য

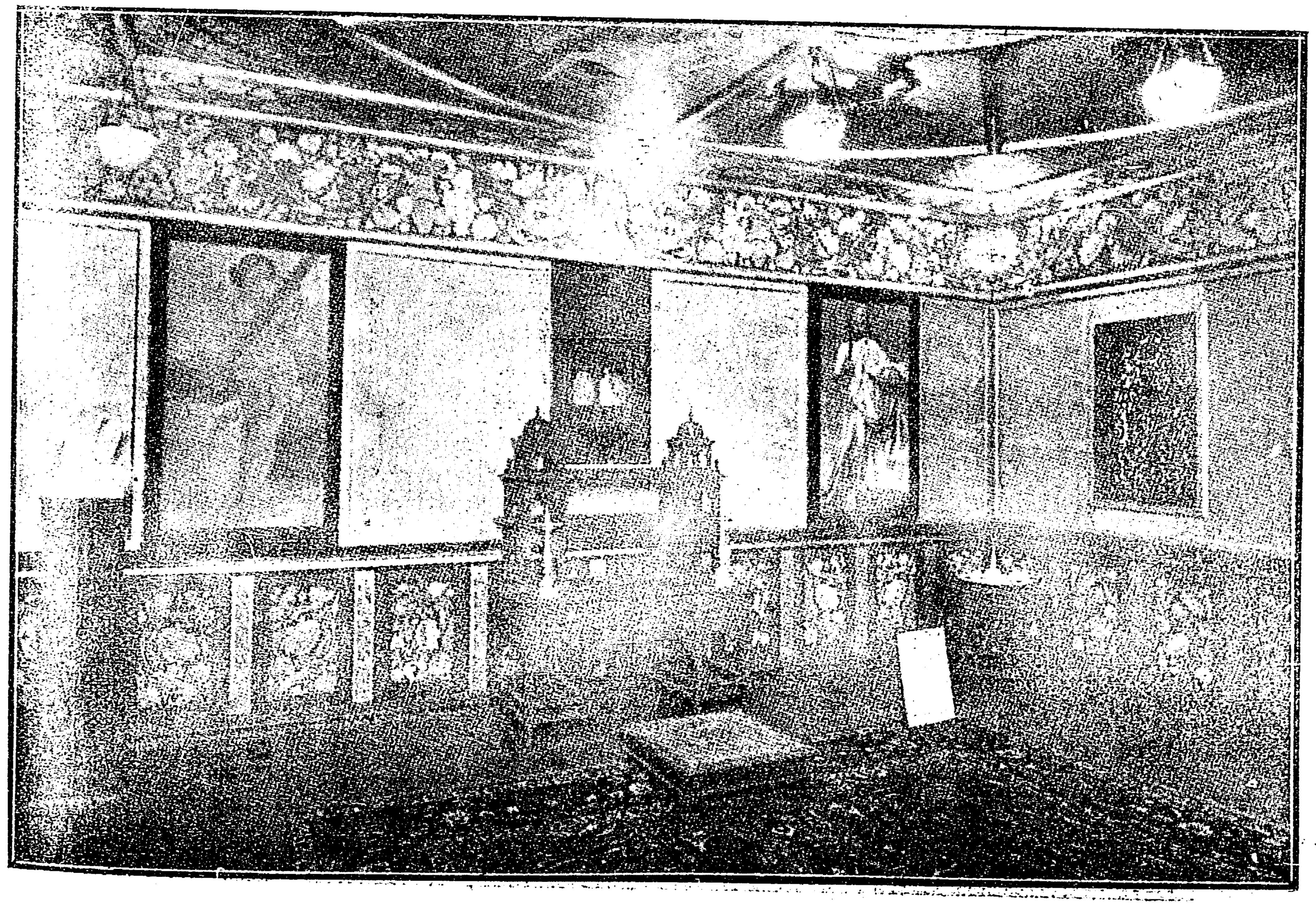

বোম্বাই শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারা সজ্জিত কক্ষ

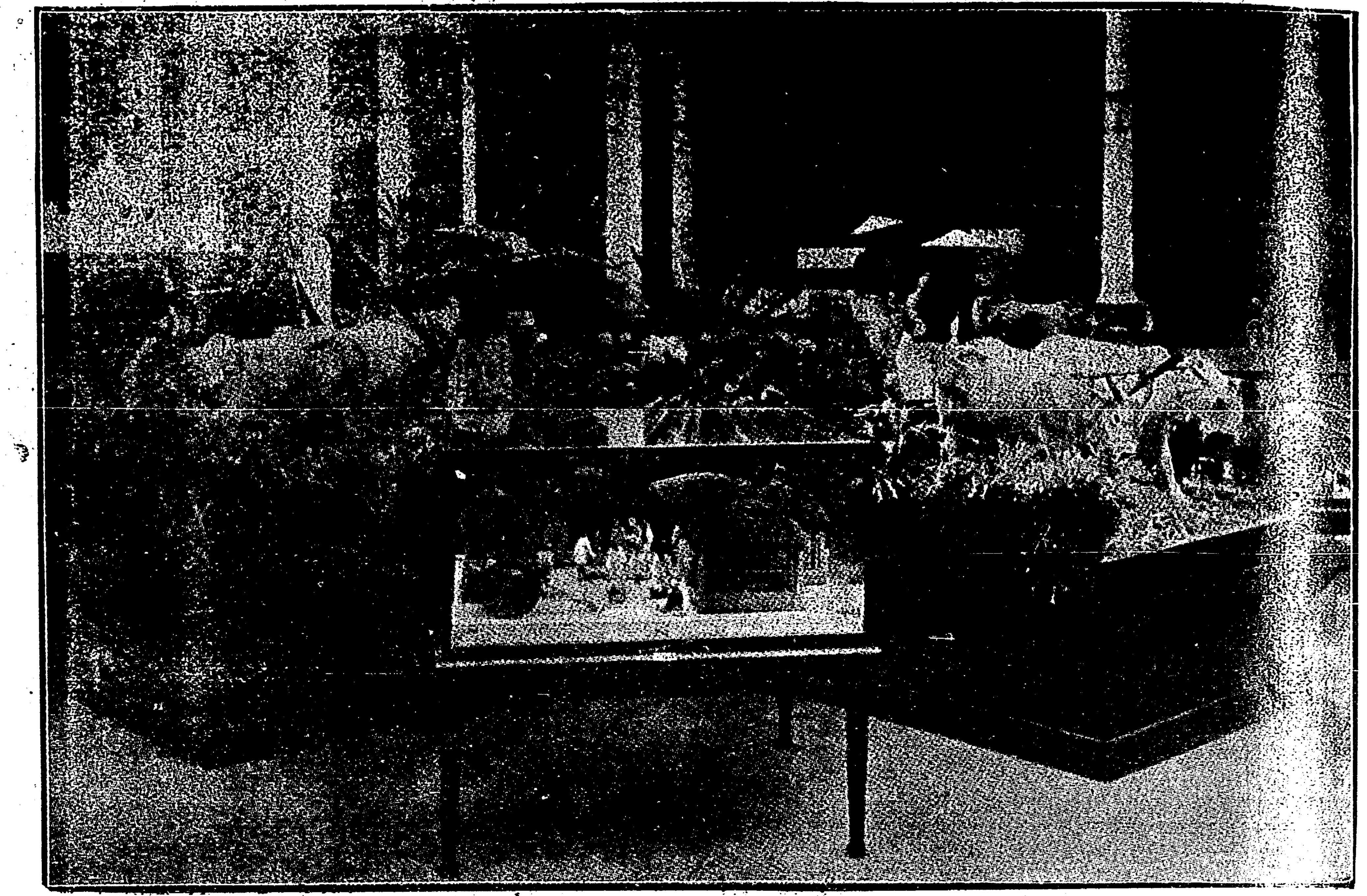

বাঙ্গালার পল্লী-দৃশ্য এবং দূরে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের দৃশ্য

প্রদর্শনীতে কলিকাতার 'ইকনমিক জুয়েলারী ষ্টল' (পশ্চাতে স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী উপবিষ্ট)

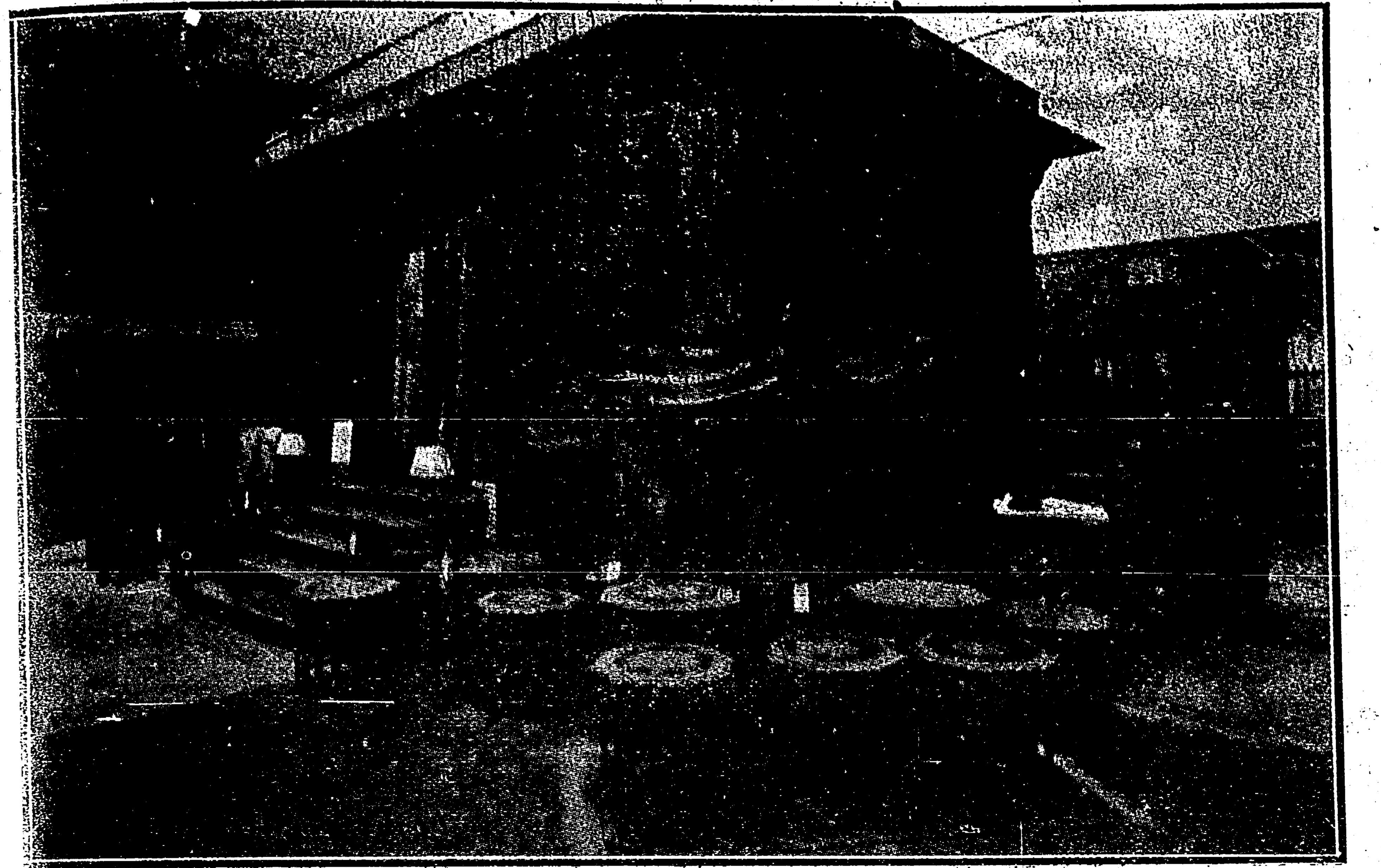

লাহোর আর্ট স্কুলের নির্ম্মিত মণ্ডপ

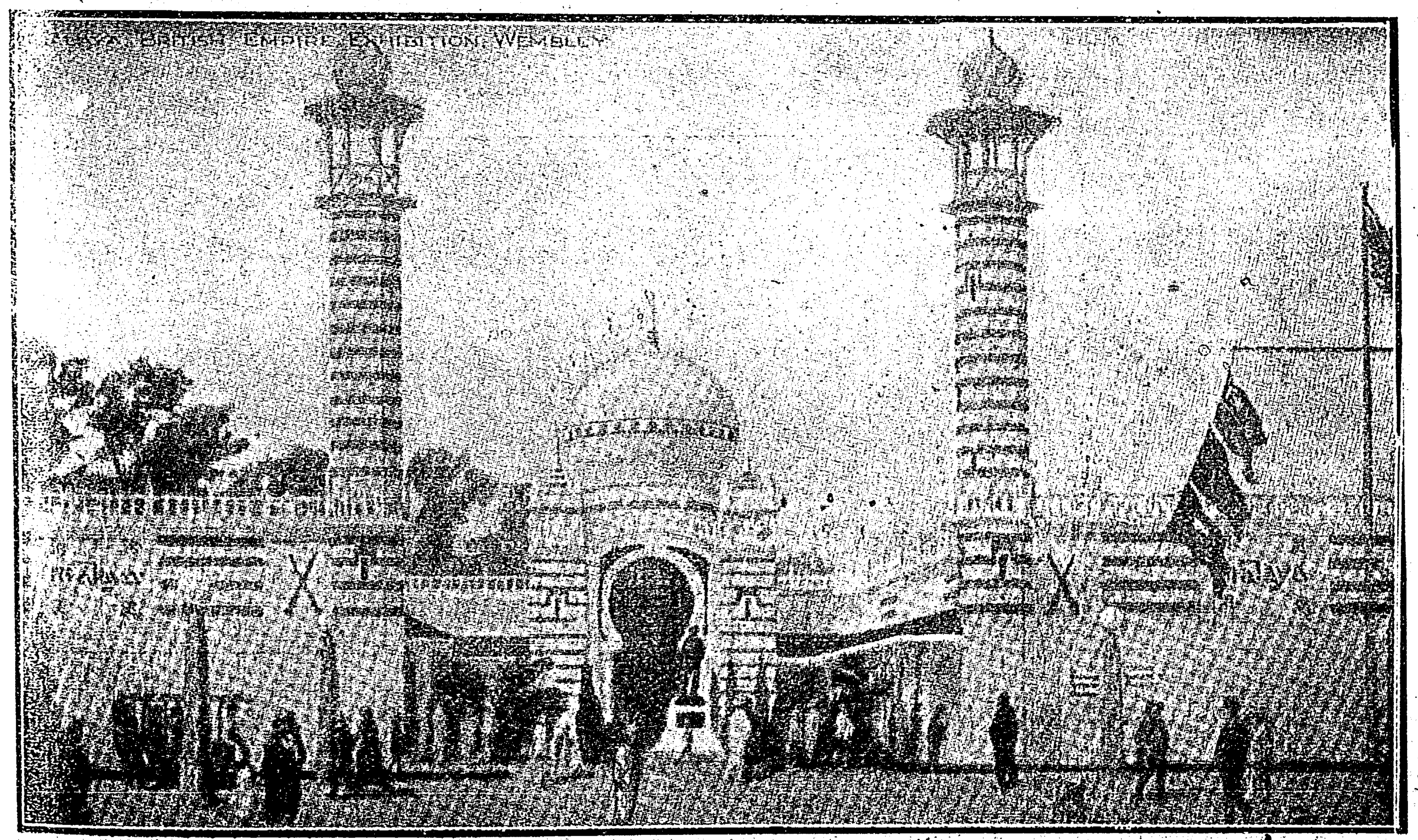

প্রদর্শনীতে মালয়া উপদ্বীপের অঙ্গন

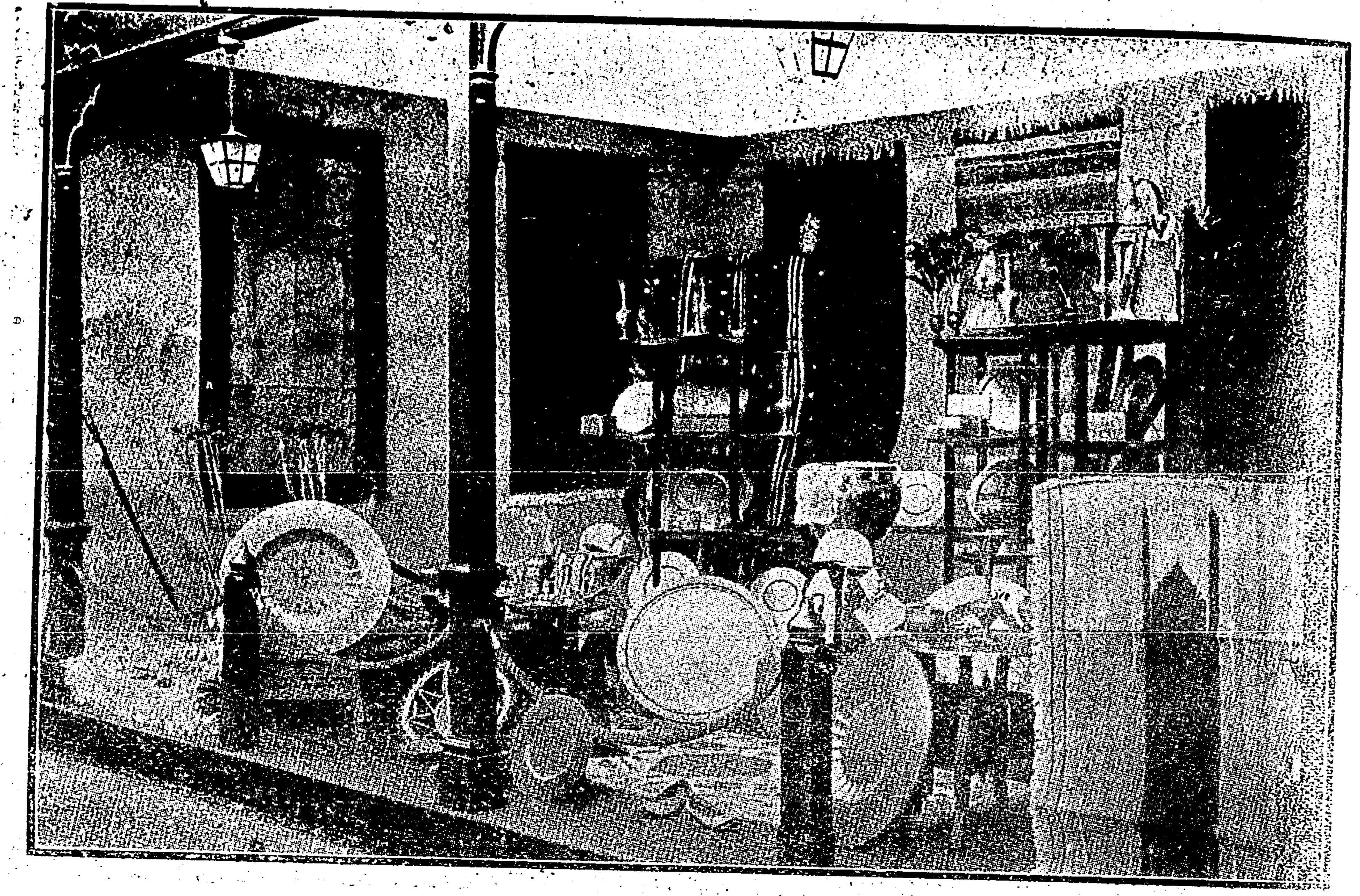

ভারতের যুক্ত-প্রদেশের দ্রব্য-সম্ভার

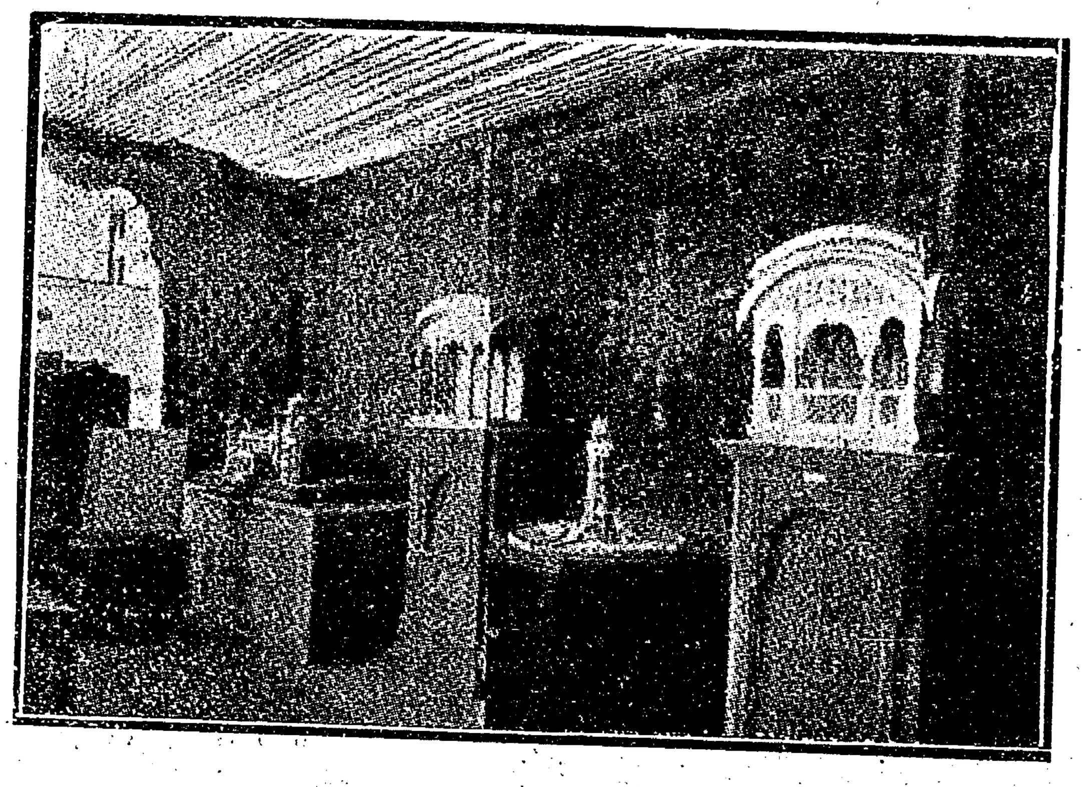

বিকানীরের কাঠের কাজ

গোলদীঘি *

অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম-এ

ইদানীং একাধিক মাসিক পত্রে মানস-সরোবরের মনোরম বিবরণ পাঠ করিয়াছি। ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা আবহমান কাল এতাদৃশ দুর্গম তীর্থ দর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয়, ও প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য নয়নগোচর করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন। আধুনিক কালে ভূপর্য্যটনকারী প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনপ্রয়াসী অধ্যবসায়শীল পাশ্চাত্যগণও এই পথের পথিক হইয়াছেন। বিদেশী স্বেন্ হেডিন্ (Sven Hedin) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মানস-সরোবরে অভিযান করিয়া তাহার কৌতূহল-জনক বৃত্তান্তে ইংরেজীনবিশ সম্প্রদায়ের বিস্ময় ও আনন্দ উদ্রেক করিয়াছেন। আজকালকার কৃতবিদ্য উৎসাহী বাঙ্গালী ২।৪ জন তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া মানস-সরোবর দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণ সংসারী জীবের পক্ষে এই সুদূরবর্ত্তী ও দুর্গম স্থানে পৌঁছান দুঃসাধ্য। সুতরাং আমাদের নিকট 'জলধরসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ' সাহিত্যদর্পণের এই কবি-সময়ই অবলম্বন। কবিবাক্যের শব্দ ও অর্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় বটে, 'যাইতে মানস-সরে, কার না মানস সরে?' কিন্তু ভাবুকের মানস যত শীঘ্র ও সহজে 'সরে,' চরণ তত শীঘ্র ও সহজে নড়ে না; এরূপ অর্থ-সামর্থ্য ও সুযোগ-সুবিধা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে; আর পদব্রজে উচ্চাবচ ও পদে পদে বিপদ্‌বহুল পার্ব্বত্যপথে শত শত ক্রোশ পরিভ্রমণের উপযুক্ত উৎসাহ-উদ্যম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা সৌখীন ভ্রমণকারী-দিগের বড় একটা থাকে না। সুতরাং এই শ্রেণীর কেহ কেহ দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানীর প্রসাদে উড়িষ্যাপ্রদেশে চিল্কাহ্রদ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। এই অক্ষম লেখকের ভাগ্যে অত দূর যাওয়াও ঘটে নাই। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্য্যন্ত, অথবা 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করিয়া শিশুর চলন যেমন মাতৃসন্নিধান পর্য্যন্ত, তেমনি আমারও সীমাগুড়া গোলদীঘি পর্য্যন্ত। তথাপি যখন উত্তরপাড়া-ভ্রমণ, বরাহনগর-ভ্রমণ, ভ্রমণ-কাহিনীর স্থান অধিকার করিতেছে, তখন গোলদীঘি-ভ্রমণই বা কেন সাহিত্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবী না করিবে? অসহিষ্ণু পাঠক হয় তো বলিয়া বসিবেন, একেবারে মানস-সরোবর হইতে গোলদীঘি? * কিন্তু তিনি কি জানেন না, "It is one step from the sublime to the ridiculous?"

যে সকল কলিকাতাবাসী স্বাস্থ্যের জন্য নিত্য-ভ্রমণের পক্ষপাতী, বা নিতান্ত পক্ষে দু'দণ্ড বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের পক্ষপাতী, তাঁহারা গোলদীঘি, লালদীঘি, হেদুয়া,

* গোলদীঘি মানস-সরোবরের মত মহৎ বস্তু না হইলেও ইহার সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অনেক জিনিশ আছে। শুনা যায়, সংস্কৃত কলেজের ইষ্টকালয় অধ্যাপকগণের বাসের জন্য ও তৎসংলগ্ন এই জলাশয় তাঁহাদের স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ম্লেচ্ছের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকায় স্নান করিতে সম্মত হন নাই। যাক্ সে প্রত্নতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক কাহিনী। ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে এই নামটা কতকটা সোণার পাথরবাটীর মত; কেননা দীঘি বলিতে আমরা খুব লম্বা (দীর্ঘ) চারিকোণা জলাশয়ই বুঝি; তাহা আবার গোলাকৃতি হয় কিরূপে? যাহা হউক, নামে মালুম হয়, (এবং আমাদেরও যেন স্মরণ হয়) ইহা এককালে গোলাকার ছিল, ক্রমে চতুষ্কোণ হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহা প্রাকৃতিক ক্রম-বিবর্ত্তনে নহে, কৃত্রিম উপায়ে। জ্যামিতির quadrature of Curvilinear area অর্থাৎ Squaring a circle এর সুন্দর দৃষ্টান্ত! ভূমণ্ডলের জলভাগ ক্রমে কমিয়া স্থলভাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, বিশ্লেষজ্ঞগণ নাকি এইরূপ বলেন। ইহা অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটি-তেছে। গোলদীঘিতে ভ্রমণের স্থানের পরিসর-বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম উপায়ে জলভাগ কমাইয়া স্থলভাগ বাড়ান হইতেছে, ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি। যাক্, সময় ও সামর্থ্যের অভাবে এই সকল গবেষণা শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে পারিলাম না। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন মৌলিক গবেষকদিগের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইবে। এই সেকেলে অক্ষম লেখক শুধু দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিলেন।

* দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আরোগ্যলাভের প্রথম অবস্থায় লিখিত।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার্, বীডন্ স্কোয়ার্—ইহারই একটা না একটা জায়গায় প্রাতে বা সন্ধ্যায় বা দুই বেলাই চক্রাকারে ভ্রমণ করেন, অর্থাৎ কয়েকটা পাক দেন, অথবা পাঁচজনে মিলিয়া বেঞ্চে বসিয়া সদালাপ করেন। (হালে আরও অনেকগুলি ছোট বড় পার্ক্ ও স্কোয়ার্ হইয়াছে, সেগুলির কথা আর ধরিলাম না।) ইড্‌ন্‌গার্ড‌ন্ বা গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত যাইতে খুব উৎসাহী বা সৌখীন লোক ভিন্ন কাহারও ঝোঁক হয় না। ইড্‌ন্ গার্ড্‌নের নিকটে আউট্‌রাম ঘাটের জেটিও নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ বায়ুসেবনের পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এখানে অতি অল্প লোককেই যাইতে দেখি। এমন কি অনেকে ইহার খবরও রাখেন না। যাঁহারা শেষোক্ত তিনটি স্থানে যান তাঁহারা প্রায়ই ট্রামে গিয়া পথ হাঁটার শ্রমটা বাঁচান। যাঁহাদের পয়সা ততটা সস্তা নহে অথবা এরূপ ব্যাপারে পয়সা খরচ করিতে ইচ্ছা নাই, তাঁহারা হাঁটিয়াই অতদূর পাড়ী দিতে পারেন বটে, কিন্তু অতদূর হাঁটিতেই ষ্টীম্ ফুরাইয়া যায়, তাহার পরে স্ফূর্ত্তির সহিত মাঠের বা বাগানের ভিতর বেড়ান অনেকেরই অসাধ্য হয়। তবে অবশ্য বসিয়া বসিয়া হাওয়া খাওয়া চলে। ফল কথা, পথ হাঁটার বা খরচের ভয়েই অনেকে অতদূর যাইতে চাহেন না। অবশ্য, যাঁহাদিগের ঘরের গাড়ী বা মোটরকার আছে, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র।

যাহার যেখানে যাইবার সুবিধা বা সখ, সে সেখানেই যায়। লালদীঘিতে অন্যান্য স্থানের তুলনায় বাঙ্গালী কম, —সাহেবপাড়া বলিয়াও বটে, বাঙ্গালীপাড়া হইতে দূর বলিয়াও বটে। গোলদীঘি ও হেদুয়া বিশেষ করিয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের বিহারভূমি। ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার্ ও বীড্‌ন্ স্কোয়ারের আয়তন অধিকতর প্রশস্ত বটে, কিন্তু জলাশয় থাকার জন্য বায়ু স্নিগ্ধ বলিয়া গোলদীঘি ও হেদুয়া অধিকতর লোকপ্রিয়। গঙ্গার ঘাট, গড়ের মাঠ ও ইড্‌ন্‌গার্ড্‌ন্ ছাড়া এমন স্নিগ্ধ বায়ু কলিকাতার অন্য কোনও সাধারণ বিচরণ-স্থানে নাই।

গোলদীঘির প্রসঙ্গে একটু গোলমালের কথা আছে। অনেকের মুখে শব্দটি ব্যস্তবৃত্তি হইতে দেখি। যেমন শাস্ত্রে তিন রামের কথা শুনি—পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও বলরাম, তেমনি মির্জ্জাপুর পার্ক্, কলেজ্ স্কোয়ার্, এমন কি ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার্‌কেও গোলদীঘি বলিতে শুনিয়াছি। (শেষেরটিকে গোলপুকুর বলিতেও শুনিয়াছি;) ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের দীঘি বা পুকুর (অর্থাৎ জলাধার) ফল্গুর ন্যায় 'অন্তঃশিলা' ছিল; এক্ষণে উহা শূন্যগর্ভ; মির্জ্জাপুর পার্কে এক সময় একটা দীঘি ছিল বটে (আমরা দেখিয়াছি), কিন্তু তাহা পল্লীগ্রামের 'ডোবা'রও অধম হইয়া পড়িয়াছিল; বহুদিন যাবৎ তাহা ভরাট হইয়াছে; তথাপি তালগাছ-শূন্য তালপুকুরের মত ইহা আজও গোলদীঘি নামে বিড়ম্বিত এবং ইহার দক্ষিণ দিকের গলি মির্জ্জাপুর ট্যাঙ্ক্ লেন্ নামে অভিহিত। অনেকে প্রভেদের জন্য বড় গোলদীঘি ও ছোট গোলদীঘি, অথবা পটোল-ডাঙ্গার গোলদীঘি ও চাঁপাতলার গোলদীঘি বলে। মির্জ্জাপুর পার্ক্-সম্বন্ধে একটা রহস্য বড় মন্দ নহে। মিউনিসি-প্যালিটির প্রদত্ত ইংরেজী নাম মির্জ্জাপুর পার্ক্ বা স্কোয়ার্ হইলেও বাঙ্গালায় কেহ ইহাকে মির্জ্জাপুরের গোলদীঘি বলে না। কর্ত্তৃপক্ষও লোকমত মান্য করিয়া (তাঁহাদের সেরেস্তায় পার্ক্‌টি মির্জ্জাপুরের নামে অভিহিত হইলেও) মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের দিকে তাহার গেট্ রাখেন নাই, আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীটের দিকে রাখিয়াছেন; তাহাও খিড়কি বা 'নাচ্-দরজা'। আর সদর গেট্ রহিয়াছে অখিল মিস্ত্রীর গলিতে। এ জন্য আমরা অখিল মিস্ত্রীর গলির অধিবাসীরা দুই হাত তুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আর একটু নেক-নজর করিয়া যদি এখনকার কর্পোরেশনের কর্ত্তারা 'অখিল পার্ক' * নামকরণ করিয়া দেন, তবে তো সোণায় সোহাগা হয়; আমরা তারস্বরে স্বরাজ পার্টির জয় ঘোষণা করি।

যাক্, নামকরণ লইয়া আর বেশী বকাবকি করিব না। কেননা যে বিদেশী মহাকবির রচনার পাঠনা করাইয়া দিন-গুজরান হয়, তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"What's in a name'? 'নামে কিবা আসে যায়?' এই 'ছোট গোলদীঘি' লেখকের অতি নিকটে বটে, কিন্তু এখানে বৈকালিক বায়ুসেবন, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল

* এই পার্ক মহাত্মা গান্ধির চরণরজঃপূত। সুতরাং ইহা শুধু স্বদেশভক্তের পুণ্যভূমি কেন, সর্ব্বজাতির তীর্থ। সে ভাবে ধরিলে অখিলপার্ক নামের চরম সার্থকতা হইবে।

থাকিলে, অগত্যার পক্ষে ভিন্ন পোষায় না। দুর্ব্বল দেহে আবার ইহা আরও বিপজ্জনক। কেননা এখানে ফুটবল খেলার দাপটে মাথা বাঁচাইয়া চলা কঠিন; বেঞ্চে স্থাণুবৎ অচল হইয়া বসিয়া থাকিলেও নিস্তার নাই। অথচ কোন্ সাহসে যে মা-বাপ ছোট ছোট শিশুদিগকে ঝী-চাকরের জিম্মা করিয়া এই রণক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেন, তাহা বুঝি না। বোধ হয় ভবিষ্যতে যাহাতে শিশুগণ রণে আগুয়ান হইয়া বাঙ্গালীর 'ভীরু' অপবাদ অপনোদন করিতে পারে, ইহারই জন্য তাঁহারা প্রথম হইতেই শিশুদিগকে ভয়ভাঙ্গা ও ঘাসহা করিতে চাহেন। 'উদারঃ কল্পঃ।' বাঁশকে এইরূপ কাঁচায় নোয়ানই তো সুবুদ্ধির কায। তাহা ছাড়া, এখানকার জমি সেঁতসেঁতে, হয়তো দীঘি ভরাট করার জের আজও মেটে নাই। সে অংশেও শিশুদিগকে এখানে নগ্নপদে দৌড়াদৌড়ি করিতে দেওয়া বা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দেওয়া সঙ্গত নহে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে। যাক্, শিশুমঙ্গল-সমিতির পক্ষ হইতে আমাকে শালিসী মানে নাই, আমার এত কথায় কায কি? প্রৌঢ় লোকের সুবিধা-অসুবিধার কথাই বলিয়া যাই। এখানে কয়েক বৎসর হইতে আর একটি মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে—নিরুপদ্রব অসহযোগ-আন্দোলনের শুভ মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত আন্দোলন ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপারগুলির নানারূপ প্রচেষ্টার রঙ্গভূমি এই মির্জ্জাপুর পার্ক। কলেজ বয়কট্ করার ধর্ম্মঘট তো এই মহাপীঠেই ঘটিয়াছিল। তদবধি সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, খদ্দরমেলা একটা না একটা অনুষ্ঠান এখানে লাগিয়াই আছে। যেন সেকালের হিন্দুগৃহের বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ। ফলতঃ শান্তিতে ভ্রমণ বা বায়ুসেবন প্রায়শই অসম্ভব। স্বাস্থ্যরক্ষা তো দূরের কথা, 'প্রাণে বাঁচা ভার। সুতরাং আর দুই পা গিয়া পটোলডাঙ্গার গোলদীঘিতে ভ্রমণই সুবিবেচনার কার্য্য।

কিন্তু সেখানেও বিপদ্ বড় কম নহে। এমন কি, সময়ে সময়ে তাহা ছোট গোলদীঘিকেও ছাপাইয়া উঠে। দিন কতক তো গলাবাজি বনাম লাঠিবাজির জ্বালায় কাণ পাতিতে তথা মাথা পাতিতে পাওয়া যাইত না। সুতরাং সুবুদ্ধির মত গৃহকোণে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, ভ্রমণের সাধ বাসগৃহের দ্বিতলসংলগ্ন সরু বারাণ্ডায় টহল দিয়াই নিবৃত্ত করিতে হইত। তাহার পর, এখানেও সভাসমিতির অভাব নাই, সে সময়ে ভিড়ও বেজায় হয়। তখন গোল-দীঘি গোলকধাঁধায় পরিণত হয়। ডাঙ্গায় ফুটবল খেলা না থাকিলেও জলে ওয়াটার-পোলো (Water Polo) আছে অর্থাৎ ডাঙ্গায় বাঘ না থাকিলেও জলে কুমীর আছে; তবে এ কুমীর জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া তাড়া করে না, এই যা' বাঁচোয়া। সন্তরণ-প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য ভিড়ও মন্দ হয় না; আর যেদিন প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয়, সেদিন তো প্রবেশ অসম্ভব, বিনা টিকিটে নিষেধও বটে। ইহা ছাড়া কথকতা, গান প্রভৃতি পেশাদারী ব্যাপার আছে, বালকবালিকাদিগের মুখপ্রিয় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিশপত্র অল্পবিস্তর বিক্রয়ের চেষ্টাও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, বিশেষতঃ স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগে খদ্দরে নব অনুরাগের দিনে খদ্দরের ধূতী সাড়ী চাদর, অথবা দেশাত্মবোধের উদ্দীপক পুস্তকাদি লইয়া উৎসাহী যুবক-দিগকে বসিতে দেখিয়াছি। তবে এ সকলে ভ্রমণের বা বায়ুসেবনের কোনও বিঘ্ন হয় না, বরং বৈচিত্র্য সংসাধিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তিরও উদ্রেক হয়। চড়কের দিন বৈকাল হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে হরেকরকম বিক্রেয় বস্তুর মেলা বসে, সে সময়ে ভিড় ঠেলা দুরূহ। যাহা হউক, ইহা বৎসরে এক দিন, তাহাও আবার বৎসরের শেষ দিন, সুতরাং বিঘ্নের খতিয়ানের মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে।

মোটের উপর এই পটোলডাঙ্গার গোলদীঘিই আমাদের মত নিরীহ নির্জীব-প্রকৃতি দূরগমনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক প্রৌঢ় বা অকালবৃদ্ধের বায়ুসেবনের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোলদীঘি ও হেদুয়া ছাত্র-সম্প্রদায়ের প্রিয় বিহারভূমি। এ কথা গোলদীঘি-সম্বন্ধে বিশেষভাবে খাটে। শুধু আজকাল নহে, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের প্রথম আমল হইতেই এখানে ছাত্রগণ অধিষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। অশেষশ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিতে দেখা যায়, এই স্থানে বসিয়া ইংরেজি-নবিশ ছাত্রের দল লোককে দেখাইয়া দেখাইয়া মদ্যপান করিয়া ও তাহার অনুপান গোমাংসের শিককাবাব খাইয়া কুসংস্কারবর্জ্জন ও 'সৎসাহসের' 'example set' করিতেন। সে উচ্ছৃঙ্খলতার দিন আর নাই। পরবর্ত্তী

কালের ছাত্রদিগের গোলদীঘিতে বসিয়া পান-ভোজনের দৌড় বিড়ি-বাড়সাই ও চীনের বাদামভাজা সাড়ে বত্রিশ ভাজার উর্দ্ধে আর উঠে না। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ছাত্রাবস্থায়ও এই গোলদীঘি বা কলেজ্ স্কোয়ার্ আমাদের বড় প্রিয় ছিল। বাস্তবিক আমাদের পূর্ব্বের ছাত্রাবস্থা ও এখনকার শিক্ষকের অবস্থা—ইহার মধ্যে যোগসূত্র এই গোলদীঘি বা কলেজ্ স্কোয়ার্। এখনকার ছাত্রদিগের ন্যায় আমরাও এক কালে এইখানে সন্ধ্যায় বিচরণ করিয়া কত গল্প করিয়াছি, কত আলোচনা করিয়াছি, কত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি। (তবে সে সবই পড়াশুনার কথা, এখনকার মত উগ্র রাষ্ট্র-নীতি বা উদার সমাজনীতি নহে।) চন্দ্রালোকে সবুজ ঘাসের কোমল আস্তরণের উপর শয়ান অবস্থায় হেম-চন্দ্রের—

'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে',
'জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে',
'আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষুঃ মেলি'
'ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,'
(ভারতসঙ্গীত ও ভারতবিলাপ),

নবীনচন্দ্রের 'এই কি পলাশীক্ষেত্র ?'

'কোথা যাও ফিরে চাও, সহস্রকিরণ',
'দাঁড়া রে দাঁড়া রে ফিরে',

ও তখনকার দিনে উদীয়মান রবিকবির 'অয়ি সন্ধ্যে, অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী কেশ এলাইয়া,' 'জ্যোতির্ম্ময় তীর হ'তে আঁধার সাগরে ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,' ইত্যাদি কবিতা যুগল বন্ধুতে আবৃত্তি করিয়াছি অথবা সুহৃজ্জনের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতসুধা পান করিয়াছি, আজ সে সব কথা মনে হইলে একটা বেদনা-মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করি, এ যেন সেই বৈষ্ণব-কবি-বর্ণিত 'বিষামৃত'। আজ সেই সব সহাধ্যায়ী বা সমকালিক ব্যক্তিদিগের অধিকাংশ পরলোকে, যাঁহারা টিকিয়া আছেন, তাঁহাদেরও 'পাত্তা' পাওয়া যায় না, কে কোথায় কি ভাবে আছেন তাহার ঠিকানা নাই ; যদি কালে-ভদ্রে দেখা হয়, তাহা হইলে আর সে গালভরা হাসি, সে বুকভরা আগ্রহ, সে প্রাণখোলা রহস্যালাপ, সে সরল ও সরস কথা-বার্ত্তা শুনা যায় না, সে নিবিড় প্রীতি-আলিঙ্গন, প্রেমিক-যুগলের মত সে গলাগলি করিয়া পাদচারণ,—এ সব তো এখন বালসুলভ চাপল্য বলিয়া ধিক্কৃত হইবে। এখন তাহার বদলে দেখি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, ওজনকরা কথাবার্ত্তা, পরস্পরের আর্থিক উন্নতি-সম্বন্ধে তুলনায় সমালোচনা, অথবা সংক্ষেপে 'কাষ্ঠহাসি' ও 'কাষ্ঠনকুতা'। সে সহৃদয়তা, সে সরসতা, সে স্নেহশীলতা, সে সমবেদনা, এখন আর বন্ধুবর্গে জড়াইয়া পড়ে না, তাহা এখন সঙ্কীর্ণ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। হায় রে সে দিন! তথাপি যৌবনের ভালবাসার এমনই মোহ যে, দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শয়িত অবস্থায় যখন এ পারের সকল বন্ধন ছেদনের সম্ভাবনা বলবতী হইয়াছিল, তখন কতবার মনে হইয়াছে, যদি একটিবার সেই সব যৌবনের সুহৃদের দেখা পাই। যাক্, এ সব উচ্ছ্বাসের কথা।

ছাত্রাবস্থার অবসানে শিক্ষকতাব্রত অবলম্বন করিয়া কয়েক বৎসর মফস্বল কলেজে অজ্ঞাতবাসের পর যখন কলিকাতার কলেজে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, তখন ভুক্তভোগী সমব্যবসায়ী কর্ম্মসহচর বন্ধুর আলোচনায় বহুকাল গোলদীঘিমুখো হই নাই—কতকটা অননুভূত সুখের অভাবের তীব্র অনুভূতির আশঙ্কায়, আর কতকটা সঙ্কোচবশতঃ— কেননা ছাত্রেরা অনেক সময় আমাদের শ্রেণীর জীবের পাঠনায় পটুতা বা অপটুতা-বিষয়ে তুলনায় সমালোচনা করে, তাহা তাহাদিগের পক্ষে মুখরোচক হইলেও আমাদের পক্ষে হৃৎকর্ণরসায়ন নহে, বুড়া ঈশপের কথায় 'Sport to them but death to us' (তাহাদের পক্ষে আমোদ-প্রমোদ কিন্তু আমাদের পক্ষে মরণ-সমান)! কিন্তু ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিয়া এখন মনের স্থৈর্য্য হইয়াছে, নিন্দা-স্তুতিতে বিচলিত হইবার বয়স কাটিয়াছে, পরপারের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছি, এখন এ পারের উপল-কঙ্করে আর পদতল ব্যথিত হয় না। নিজের আধিব্যাধির মধ্যেই সমাধিস্থ হইয়া আছি। ছাত্র-সম্প্রদায়ও এখন আর তুচ্ছ পরীক্ষা ও পাঠ্যপুস্তকের কথা, শিক্ষকের পাঠনাপটুতার কথা, লইয়া বৃথা সময় অপব্যয় করে না, তাহারা এখন স্বরাজ, অসহযোগ, অবনত জাতির উন্নয়ন, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা, প্রভৃতি বড় বড় কথার আলোচনা করে, আমরা অবজ্ঞাত, অবহেলিত, বিস্মৃত। ইহাতে যদি কোনও কোনও 'ঝুনো' শিক্ষকের মনের কোণে একটু অভিমান সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে নিরুপায়। হয় তো তখনকার নিন্দাতেও তাঁহারা বেদনার মধ্যেও একটু সুখ পাইতেন— ছাত্রবর্গের আলোচনার কেন্দ্রী পুরুষ বলিয়া!

যাক্ এ সব ব্যক্তিগত ব্যবসায়গত কথা লইয়া আর পাতা ভরাইব না। গোলদীঘিতে অপরাহ্ণে ও রজনীর প্রথম যামে দলে দলে যুবক ছাত্র বিরাজ করে, তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় বৃদ্ধ 'হংসমধ্যে বকো যথা'—গণনার মধ্যেই আসেন না। জগতে বৃদ্ধের তুলনায় যুবার সংখ্যা অনেক অধিক; অতএব ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু প্রাতে ঠিক এই অনুপাতটি রক্ষিত হয় না। তখন ছাত্রগণ 'দেয় মন নিজ নিজ পাঠে' ; সুতরাং সন্তরণ-শিক্ষার্থী ভিন্ন অন্য শ্রেণীর যুবক এ সময় বড় একটা দেখা যায় না। যাহাদের জীবনের প্রভাত, প্রভাতে তাহারা বিরলদর্শন, আর যাহাদের জীবন-সায়াহ্ন সায়াহ্নে তাহারা বিরলদর্শন—বিধাতার বিপরীত বিধান বটে! প্রাতে অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক বৃদ্ধকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, নিজেও অকালবার্দ্ধক্যের দাবীতে তাঁহাদিগের দলে ভিড়িয়াছি ; কিন্তু সে কেবল রোগমুক্তির পর প্রথম অবস্থায়। সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হওয়ার পর প্রভাতে উঠিয়া অভ্যাসমত লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। (আবার ব্যক্তিগত কথা আনিয়া ফেলিলাম।) যে কয়েকজন বৃদ্ধ সান্ধ্যভ্রমণে আসেন, তাঁহারা প্রাতের ন্যায় অবাধ ভ্রমণের তেমন সুবিধা পান না, নিয়মরক্ষার জন্য ২।১ পাক দিয়া ভিড়ের ভিতর ঠেলাঠেলির ভয়ে আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন ; আর বেঞ্চে সুখাসীন হইয়া বিশ্রদ্ধালাপ করেন—অনেক স্থলেই নিজ নিজ সাংসারিক শান্তি-অশান্তির কথা, নিজ নিজ শারীরিক স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্যের কথা, অথবা ধর্ম্মকথা। তবে ইঁহাদিগের মধ্যে ২।৪ জন এমন সুস্থ ও সজীব ব্যক্তিও আছেন যাঁহারা এই 'পশ্চিমে বয়সি' আধিব্যাধি শোক-তাপ সহিয়াও যুবকের মত উদ্যমে অথচ প্রবীণের মত বিজ্ঞতার সহিত দেশের ও জাতির মঙ্গলামঙ্গলের, রাষ্ট্রনীতির বা সমাজ-নীতির জটিল সমস্যার, আলোচনা ও সমাধান করেন। এই সকল শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা এখন গোলদীঘি হইতে তথা পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, রাত্রিভোজনের কাল সন্নিহিত হইয়াছে। আর অধিক বিলম্ব করিলে গৃহিণীর নথনাড়া ও পাঠকবর্গের নিকট তাড়া খাইবার আশঙ্কা আছে।

কৃষ্ণের কংসবধ (অভিনব)*

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর গণ্ডগ্রাম। গদাধর গোবিন্দ গোকুলে সেথায় আস্তে আস্তে বাড়িতেছেন। মাতুল কংস এক এক করিয়া তাঁহার অগ্রজ সকলকেই নিহত করিয়াছেন, কারণ তিনি ঠিক জানেন যে, ভগ্নী দৈবকীর গর্ভজাত ভাগিনেয়-হস্তেই তাঁহার নিধন নিশ্চিত। তাই দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তিনি শিলায় আছড়াইয়া তাহাদের ভবলীলা শেষ করিতেন। কিন্তু অষ্টম গর্ভের পুত্র চতুর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ রাতারাতি অন্যত্র পলায়ন করিলেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার স্থান অধিকার করিল অপরের এক কন্যা। কংস এই ব্যাপার দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন এবং তাহার সংহার-মানসে সজোরে তাহাকে শিলায় নিক্ষেপ করিলেন। লীলাময়ের লীলায় সে তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আকাশমার্গে অদৃশ্য হইল। কংসকে হতবুদ্ধি দেখিয়া সে গমনকালে বলিয়া গেল—

"তোকে মারবে যে
গোকুলে বাড়ছে সে।"

* জেমসেদপুর মিলনী গৃহে সাহিত্য-সভার অধিবেশনে পঠিত।

(২)

গোবিন্দ গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর গণ্ডগ্রামে সেই গোকুলে বাড়িতেছেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে মহানন্দে আদর যত্নে লালন-পালন করিয়া, ক্ষীরটুকু সরটুকু ননীটুকু খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া আদুরে গোপালের মাথাটী প্রায় চর্ব্বণ করিয়া ফেলিতেছেন। শ্রীমান আহ্লাদে আটখানা। কেউ ডাকেন কৃষ্ণ, কেউ বলেন রাখাল, কেউ গোপাল, নন্দদুলাল, আবার কেউ বা যাদু শ্যাম রাসবিহারী বংশীধারী,—যাহার যাহার ইচ্ছা, তাই বলিয়া ডাকেন। যাদু দেখিলেন এ মজা মন্দ নয়। সুতরাং এ বয়সটা এই ভাবেই কাটান যাক। নদীর ধারে ধারে বংশীবাদন; তাতে নানারূপ সঙ্কেত করে একে ওকে তাকে আহ্বান করা, গাছে উঠে পাখীর ছানা ধরা, আর দুপাঁচজন গোপনন্দন ইয়ার বন্ধু জুটীয়ে বেশ আড্ডা জমান,—এই ছিল তাঁর কাজ। আর কাজ কি?—গোয়ালার ঘরে যা হয় তাই—

"গোঠে মাঠে ধাই, ধবলী চরাই"—

সঙ্গে আবার দুপাঁচ জন ইয়ার বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিবার জন্য গোপিনীদের হাঁড়ি হইতে চুপি চুপি এটুকু সেটুকু হাতাইয়া আনিয়া সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া খাওয়া।

বয়স কমে না, বাড়িয়াই চলে; নন্দ ঘোষের ছেলেরও তাই; ভরাগাঙ্গে বান ডাকিয়া দুকুল ছাপিয়ে উথ লে ওঠার মত গোবিন্দেরও যৌবনের জোয়ার-গাঙ্গে বান ডাকিয়া প্রেমের তরঙ্গে তাহা ছাপাইয়া উঠিল,—কুঞ্জে কুঞ্জে বিরহের অভিনয় চলিল।

থাকিয়া থাকিয়া শ্যামের 'রাধা নামে সাধা বাঁশী' যেমন বাজিয়া উঠিত, গোপিনীগণ অমনি কুলমান লজ্জা ভয় ত্যজিয়া, সংসারের কায ফেলিয়া, নিত্য কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, ত্বরিত চরণে, স্রস্তবসনে, আকুল মনে, উদাস প্রাণে সেই রাধারমণ বংশীবদনের সঙ্গে, মহারাসে মিলিবার জন্য, লীলানন্দরসে মজিবার জন্য, বনপথে ছুটিয়া চলিত, কণ্টক কঙ্কর কুশাঙ্কুর কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই। সাধে কি তাঁহাদেরই ভাবে উদ্বোধিত কবি গায়িয়াছেন—

ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাবনা,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী বল কি করি,
মরিলো মরি! আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে!

গোপিনীরা কেহ ঘরের পাট করিতেছেন, কেহ রান্না চড়াইতেছেন, কেহ দুধ জ্বাল দিতেছেন, কেহ কাপড় কাচিতেছেন, কেহ কুটনা কুটিতেছেন—কেহ বাটনা বাঁটিতেছেন, কেহ আহারে বসিয়াছেন, কেহ পতিসেবা করিতেছেন—এমন সময়ে শ্যামের বাঁশী বাজিল।—কোথায়!—কেহ ভাবিলনা, শুনিলনা, ভাবিল শুধু—

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে।"

"বনমাঝে কি মনমাঝে" তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু অমনি হাতের কায ফেলিয়া সব উধাও হইয়া ছুটিল। এইরূপ মহারাসে মহানন্দে মত্ত শ্যামের আনন্দের মাঝখানে হঠাৎ হতভাগা অক্রূর আসিয়া সংবাদ দিল,—গোবিন্দের না গেলেই নয়; কংসের অত্যাচারে সকলেই জর্জ্জরিত, অচিরাৎ তাহাকে দমন করিতে না পারিলে বিপদের সীমা নাই। গোবিন্দ কি আর স্থির থাকিতে পারেন; তিনি বুঝিলেন যে বৈর-নির্য্যাতনের সময় আসিয়াছে।

গোপনন্দনগণের মিনতি, গোপাঙ্গনাগণের সহস্র অনুনয় বিনয়, অজস্র অশ্রুপাত, কিছুই গোবিন্দকে বিচলিত করিতে পারিল না।

(৩)

গোবিন্দ কংস-যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিহনে গোবিন্দপুরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গীরা সব হা-হুতাশ করিতেছে। কেহ বা উচ্ছ্বাস সহকারে আবেগ ভরে গায়িতেছেন—

—"কোথায় কৃষ্ণ জীবনকৃষ্ণ, একবার দেখা দে রে ভাই।" বিরহকাতরা সঙ্গিনী গোপিনীরা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আধ-বিলাপন, আধ-ক্রন্দন স্বরে উচ্চারণ করিতেছেন—

"রাধা প্রেমের রাধারমণ, দেখা দাওহে।" গোবিন্দ-পুরের চারিদিকে শুধু হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রব। বিরহিনীগণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। অবস্থা সঙ্গীন—শেষে বুঝি কৃষ্ণকে নারীহত্যার পাপে ডুবিতে হয়। কিন্তু গোবিন্দ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! রথ তখন বায়ুবেগে কংসের উদ্দেশে চলিয়াছে। তিনি তাঁহার পরম ভক্ত নারদকে স্মরণ করিলেন।

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।—দ্বিজেন্দ্রলাল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেনচন্দ্র দস্তিদার Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নারদ ত্রিকালজ্ঞ। তিনি প্রভুর মনোভাব বুঝিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ্ঞা, সকলকেই কি লইয়া আসিব ?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "হাঁ, যাহারা আসিতে চায় সকলকেই আনিবে। তাহারা আমার বিরহে বড়ই কাতর ! আহা, আসিয়া একবার আমার বীরত্ব দর্শন করুক। তাহাতে তাহারা কতই যে সুখী হইবে। আহা !"

কৃষ্ণের নয়ন-কোণে জল আসিয়া হাজির। নারদ বলিলেন "প্রভু, থাক্ থাক্, আর কাঁদিয়া কাজ নাই। আমি এখনই যাইতেছি। তবে কি না পথে নারী লইয়া চলা।" শ্রীকৃষ্ণ সজোরে ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—"কাজ নাই তোর মূর্খ এসব বিচারে। এখন আমি চাই যে 'দেখিব বিরহ বিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি।'" নারদ মনে মনে হাসিলেন—প্রভু, তোমার বিরহ !

(৪)

গোবিন্দপুরের শ্যামবাজার অঞ্চলে শ্যামপুকুরের সন্নিকটে নন্দঘোষের গোয়াল, এ কথা নারদ মুনির জানাই ছিল। একেবারে আসিয়া নন্দঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নারদ বলিলেন, "ঘোষজা, ভাবনা নাই। গোবিন্দ ভাল আছেন। তোমরা যে যে ইচ্ছা কর, আমার সহিত আসিতে পার। তাঁহার আদেশমত আমি তোমাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে আসিয়াছি। তোমরা স্বচক্ষে সেই দুরাচার কংসের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইবে।" যত বিরহিণী গোপাঙ্গনা এই কথা শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা পুনরায় গোবিন্দের সহিত মিলিত হইবেন।

নন্দঘোষ চটিয়াই লাল ;—"বেটাকে এতকাল মানুষ করিলাম, কিন্তু কোন কাযেই লাগিল না। আমার এই বুড়োবয়সে যদি গরু বাছুর গুলোকে না দেখিল, তবে আর আমার উপকার কি ? এতদিন বেড়ালো নদীর ধারে ধারে বাঁশী বাজিয়ে আর পাড়ার মেয়ে-মহলে নেচে গেয়ে ! আর এখন গেল কি না যুদ্ধু করতে ! ও গয়লার ছেলে. বেটা ভারী বীরপুরুষ ! ভাল করে গরুর ল্যাজ মোড়া দিতে শিখলে না—আবার গেল কি না কংস রাজার সঙ্গে লড়তে। পিঁপড়ের পাখা মরবার জন্যেই ওঠে। এই তোমরাই তো পাঁচজন জুটে ছোঁড়াটাকে নষ্ট করলে। যাও, যাদের নিতে এসেছ তাদেরই নিয়ে যাও। আমি ও-সব পাগলামীর মধ্যে নেই। গরুগুলো না খেয়ে মরুক আর কি ?"

নারদের তো আক্কেল গুড়ুম। বিশ্বাস কি ! গোয়ালার তো ব্যাপার—দু'ঘা না বসিয়েই দেয় !

যথাকালে গোবিন্দের দুচারজন ইয়ার বন্ধু ও বিরহিনীর দল লইয়া নারদ কৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের তখন 'পলকে প্রলয়'। কেবল হা কৃষ্ণ ! যো কৃষ্ণ !!

খেয়ায় নদী পার হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেই দুপুর রৌদ্রে তাঁহারা শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ তথায় সকলকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বলিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেই তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, কৃষ্ণের নিকট পৌছিতে কয়েকদিন লাগিবে, তখন তাঁহাদের বিরহ-তপ্ত আকুল হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন ফুটিয়া বাহির হইল ;—"হা বরাত ! হা বরাত !" রবে চারিদিক প্রকম্পিত হইল। আর তাহার প্রতিধ্বনি তাহার সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিল "হাবরা হাবরা।" সেই মুহূর্ত্তে নারদ সকলকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন ও এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেই স্থানের নামকরণ করিলেন **হাবরা**। বর্ত্তমান **হাবড়া** তাহারই উচ্চারণ-ভেদ।

সেবার যখন হাবড়ায় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল, হাবড়া নামের কারণ কি। "ভারতবর্ষের" প্রবীণ সম্পাদক জলধর দাদা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বকালে ঐস্থানে জল ও কাদার বেজায় রকম হাবড় বা হাওড় ছিল ; তাহা হইতেই হাবড়া বা হাওড়া হইয়াছে। কিন্তু আমার ঐ অকাট্য যুক্তির পরও কি আপনারা তাহা স্বীকার করিবেন ? তারপর আবার হিন্দু হইয়া ? অসম্ভব ! আমার যুক্তি একেবারে অকাট্য। বিশ্বাস না হয়, প্রমাণ দিতেছি।

শিলালিপি, তাম্রশাসন ইত্যাদির নজির চিরকালই দেখাইয়া দেখাইয়া লোকে তাহাকে পুরাতন করিয়া দিয়াছে ; একটু নূতন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে না পারিলে আর সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাই আমি

শিলালিপি তাম্রশাসনের পরিবর্ত্তে তরুলিপি বা বৃক্ষশাসন অথবা সোজা কথায় তাঁবাটে বা পাথুরে প্রমাণ না দিয়া একেবারে গেছো প্রমাণ প্রয়োগ করিব। আপনারা অবহিত হইয়া স্থির চিত্তে বহাল তবিয়তে খোস মেজাজে তাহা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

গাছে অনেক সময় নানারূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হৃত হইলে সীতা-পত্র-বৃক্ষে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সংবাদ লিখিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। হিমালয়ের দুর্গম স্থানে নাকি কল্পতরু বৃক্ষপত্রে নানা শ্লোক লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়! ওঁকার বৃক্ষপত্রে নাকি ওঁকার সুস্পষ্ট ভাবে মুদ্রিত। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা ইতিহাস আছে এবং এই সবই তরুলিপি বা বৃক্ষশাসন অথবা গেছো প্রমাণ।

এখন আসল কথায় আসা যাক। হাবড়ার প্রকৃত ইতিহাস আপনারা পাইলেন। এখন প্রশ্ন গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর গণ্ডগ্রাম, গদাধর গোবিন্দ গোকুলে সেথায় বাড়িতেছিলেন,—এ কোন্ গোবিন্দপুর? যদি এখনও আপনারা ইহা বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে নূতন করিয়া আপনাদের হাতে-খড়ি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

গোবিন্দপুর বাস্তবিক আমাদের **কলিকাতা**। প্রধানতঃ সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই দুই লইয়া কলিকাতা! গোবিন্দপুর তন্মধ্যে বড় গ্রাম। শ্রীযুত নন্দলাল ঘোষ মহাশয় শ্যামবাজার মহল্লায় শ্যামপুকুরের গোয়ালাপাড়ার খাঁটী বাঙালী গোয়ালা। বাঁশীর সহিত শ্যামের চিরসম্বন্ধ। এই মহল্লা সর্ব্বদা বাঁশীর গানে মুখরিত থাকিত; তাই গোপিনীরা তাহার নাম রাখিয়াছিল **শ্যামবাজার**; আর সেখানে একটা পুকুর ছিল। তাহাতে শ্যামচাঁদ ছিপ লইয়া মাছ ধরিয়া বেড়াইতেন। সেইজন্য লোকে সেটাকে বলিত **শ্যামপুকুর**। কেহ কেহ বলেন, সেই বাপীতটে শ্যামচাঁদ লুক্কায়িত থাকিয়া অনেক সময় স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র লুকাইয়া রাখিতেও ছাড়িতেন না। আর সেই শ্যামবাজারের অদূরে—একটা লম্বা রাস্তায় গোবিন্দ তাঁহার ইয়ার বন্ধুদের লইয়া দৌড়াদৌড়ি, হুটাপুটী, ডাণ্ডাগুলি, ইত্যাদি খেলিতে-খেলিতে চিদমনানন্দে মাতিতেন বলিয়া ক্রমশঃ তাহার নাম হইল **চিৎপুর**। একটু তফাতে একটা নির্জ্জন বাগানও ছিল; সেইখানে কেলিকদম্বমূলে মোহনবেশে মোহন মুরারী কেলি করিতেন। সেইজন্য ক্রমশঃ সে স্থানটা **মোহন বাগান** নামে অভিহিত হইল।

এই গোবিন্দপুরেই যে "নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে" বাড়িতেছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে। কলিকাতা ও সন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থানের বাগানে কৃষ্ণবট নামে একরকম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার সহিত কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই গাছের ইংরাজি নাম Ficus Krishnae। ইহার পাতাগুলি দোনাকৃতি, (দোনা = শালপাতার ছোট ঠোঙা) প্রায় বাটীর ন্যায়। ভিতর দিক খসখসে, বাহিরের দিক পালিশ। যেন কেহ জোর করিয়া উল্টাইয়া মুড়িয়া এইরূপ করিয়াছে। এ এক অদ্ভুত গাছ এবং এই কলিকাতা অঞ্চলে ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোথাও ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার আটা শ্বেতবর্ণ এবং অত্যন্ত গাঢ়। খানিকটা সংগ্রহ করিয়া তাল পাকাইলে বেশ রবারের বল হয়। গুণে রবারের সহিত ইহার কোন পার্থক্য নাই। কিম্বদন্তী এই যে, কংসভয়ে ভীত শ্রীকৃষ্ণ যখন রাখালদের সঙ্গে গোকুলে বাস করিতেছিলেন, গোপিনীরা তখন কৃষ্ণবটের পাতায় করিয়া কতকটা মাখন লইয়া আসিত। সে পাতাগুলি কতকটা বাটীর আকৃতি বলিয়া তাহাতে মাখন আনিবার সুবিধা হইত। কিন্তু তাহার বোঁটার কাছে খানিকটা ফাঁক থাকায় রৌদ্রে মাখন গলিয়া সেখান দিয়া কিছু কিছু পড়িয়া যাইত। মাখন কম আসিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ একদিন চটিয়া কৈফিয়ৎ চাহিলেন, এবং কারণ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান-কল্পে তাহাকে বর্ত্তমান আকার প্রদান করিলেন। এই অদ্ভুত বৃক্ষের জন্মস্থান কোথায়, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে ইহা সঠিক নির্ণীত হইয়াছে যে, কলিকাতা অঞ্চল ভিন্ন আর কোথাও ইহার অস্তিত্ব নাই এবং যদি বা কোথাও থাকে, সেগুলি বিশেষজ্ঞগণের মতে এ অঞ্চল হইতেই তথায় নীত। গোকুল এই কলিকাতার গোবিন্দপুর ভিন্ন আর কোথাও নহে। আপনাদের অবগতির জন্য মৌলিক নজিরটা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

KRISNA-BOT.

"......The question that naturally arises is—why is it called Krishna-Bot? This is called so not because any part of this plant is of black colour, i. e. Krishna. When this plant first came to the notice of the botanists (pretty long ago), a legend that gained currency was to the effect that by the grace of Rama, who did many wonderful things, our ordinary Bot (Ficus Bengalensis) had become transformed into this Ficus Krishnæ. But as hardly any body could pin his faith on the aforesaid, a secondo ne eventually came to take its place. According to this latter legend the plant derives its name from its connection with Krishna in the remote past. When Krishna, for fear of his maternal uncle Kansa was passing his boyhood among the cowherds and Gopis, the latter taking compassion on him, used to bring butter for him in cups made of dried Bot leaves. Naturally most of the butter used to melt away and fall through the hole at the bottom of those cups. One day Krishna, it is said, was very annoyed at this and with a view to put a stop to such loss in future, wrought a miracle by instantly transforming the leaves of Bot (Ficus Bengalensis) into cups. But it is not known why either Rama or Krishna, whoever may be responsible for this transformation, preferred to have the rough outer (instead of the smooth inner) surface of the leaves inside the cups.

"In fact, in comparison with other species of Ficus, this Ficus Krishnae is more closely allied to ordinary Bot (Ficus Bengalensis) than to any other species of Ficus. Owing to this alliance it was at one time suspected that Ficus Krishnæ was perhaps nothing but a modified form of Ficus Bengalensis. But, as a result of closer examination of the different parts, it has now been accepted as an independent species.

"Up to this time this Krishna-Bot has been reported only from some gardens in the neighbourhood of Calcutta and it is not known if it is found anywhere else except those places where cuttings have been sent from these gardens......" Vol. XXXI, No. 1, Jany: 1922, Page 25, of the

"Modern Review"

তাহা হইলে দেখিতেছেন যে, কৃষ্ণবট কলিকাতারই সম্পত্তি; এবং ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে কৃষ্ণ কলিকাতারই লোক।

তাহার পর দেখুন, গোবিন্দপুরের বর্ত্তমান নাম কলিকাতা। অনেক ঐতিহাসিকের মতে কালিঘাট হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি। চোখের সামনে কালিঘাট দেখিতেছেন বলিয়া বলেন,—কালিঘাট হইতে কলিকাতা ও ক্যালকাটা হইয়াছে। স্বাধীন গবেষণার চিন্তাও তাঁহাদের মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে কালোঘাট বা কালোঘাটা হইতেই কল্‌কাতা বা কলিকাটা হইয়াছে। কলিকাতা তাহারই উচ্চারণভেদ। গোবিন্দপুরের যে ঘাটে কালো স্নান করিতেন এবং মাঝে মাঝে বস্ত্রহরণের অভিনয় করিতেন। সেই ঘাটের নাম ছিল কালোঘাটা। ইহাই হইল কলিকাতার ইতিবৃত্ত। ধন্য বাংলা দেশ এবং ধন্য বাঙালী যে, তাঁহারা এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আপন করিতে পারিয়াছিলেন।

এই স্থানেই এই অভিনব ইতিহাসের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত করিলাম।

সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধি

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(১)

বাপ-মায়ে সিদ্ধেশ্বর নাম কেন রাখিয়াছিল, সে কথা বলা কঠিন হইলেও, সে যে অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এ কথা সোণাচূড়া গ্রামের কাহারও অবিদিত ছিল না। শুনা যায়, সে এই গ্রামে বছর দশ বারো পূর্ব্বে মাত্র দশটি টাকা সম্বল লইয়া আসিয়াছিল। সেই টাকায় গ্রামের হাটে কেনা-বেচা করিয়া সে এখন গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজন হইয়া উঠিয়াছে। বাজারে তাহার মত বড় মুদিখানার দোকান আর কাহারও নাই; এবং তাহার দরজায় টাকা ধার লইবার জন্য অন্ততঃ পাঁচ সাতজন প্রত্যহ ধন্না না দেয়, এমন দিন দেখা যায় না। গ্রামে তাহাকে ভক্তি করিবার লোক কেহ ছিল না বটে—কিন্তু ভয় করিত না এমন লোক নিতান্ত বিরল ছিল। কেন না দেনার দায়ে কবে যে কাহার ভিটামাটি জমি-জায়গা নিলামে উঠিয়া তাহার কবলে আসিবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না।

দোকান-ঘরটির পশ্চাতে তাহার একখানা ঘর ছিল শুইবার, আর একখানি ছোট্ট চালা ছিল রান্না করিবার। দোকানের মুহুরী ঘনশ্যামই রান্না করিত; এবং ইহার পরিবর্ত্তে সে দু'টি খাইতে পাইত মাত্র। রান্না হইত একবেলা। বেলা চারটার সময় আহার শেষ করিত বলিয়া, রাত্রে আর সিদ্ধেশ্বরের খাইবার প্রয়োজন হইত না। তবে ঘনশ্যাম নিজের জন্য ভাত রাখিয়া দিত এবং রাত্রে তাহাই আহার করিত।

সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্ব জীবনের কথা কিছু জানা না গেলেও, নানা লোকে নানা কথা বলিতে ছাড়িত না। কেহ বলিত—মহাজনের দেনার দায়ে, তাহার যা কিছু জমি জায়গা ছিল, নিলাম হইয়া যাওয়ায়, সে স্বগ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছে। কেহ বলিত—তাহার স্ত্রী কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়া সে গ্রামে তিষ্ঠিতে পারে নাই; এবং এইজন্য মনের বিরাগে এ পর্য্যন্ত পুনরায় দার-পরিগ্রহ করে নাই। আবার কেহ বা বলিত—কোনও এক ধনী মহাজনের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা ছিল; কিন্তু সে দরিদ্র বলিয়া তাহার সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। এইজন্যই না কি সে প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রাম হইতে যাত্রা করে যে, ধনী না হইতে পারিলে আর সে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।

লোকে যাহাই অনুমান করুক, সে যে স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এবং বিদেশে আসিয়া তাহার ভাগ্য লক্ষ্মীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এ কথার আর কোনও ভুল ছিল না। তাহার টাকার পরিমাণ কত, এই লইয়া গ্রামের অনেকের মধ্যেই তুমুল আলোচনা চলিত। কিন্তু কেহই সঠিক কিছু বলিতে পারিত না। তবে তাহা যে লক্ষ টাকার কম নয়—এ বিষয়ে অবশ্য কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না।

(২)

ভোর পাঁচটা। চারিদিক সবেমাত্র পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় সিদ্ধেশ্বর তাহার শয়নকক্ষ হইতে হাঁক দিল—"ঘনশ্যাম, বলি ও ঘনশ্যাম!"

ঘনশ্যাম দোকান-ঘরে শুইয়া ছিল—মনিবের হাঁক শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—"আজ্ঞে!"

"নবাবের বেটা নবাব! এত বেলাতেও ঘুম ভাঙ্গে না? এদিকে যে রোদে কাট ফাট্‌ছে! দোকান-ঘর কখন খোলা হবে শুনি? বলি, ওরে একবেলা খা, এক বেলা খা—দুবেলা খাওয়া কি গরীবের পোষায়! আলসে হয়ে যেতে হয় যে! তা কি আর আমার কথা শোনা হ'বে! পরের ভাত কি না—দুঃখ দরদ তো আর নাই। কেবল খাও আর ঘুমাও না!"

ভোর হইতে না হইতেই ঘনশ্যামের প্রায়ই এইরূপ বচন শুনিতে শুনিতে অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সে কিছু না বলিয়া দোকান-ঘরের ঝাঁপ খুলিতে লাগিল।

তার পর দোর গোড়ায় জলের ছিটা দিয়া মনিবের নিকট গিয়া কহিল—"আজ কি সকালে বেরোবে কর্ত্তা?"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সিদ্ধেশ্বর বলিয়া উঠিল—"না, বেরোবো না—চুপ করে বসে থাক্‌লেই পেট চল্‌বে। এখন মুখ ধুয়ে কাপড়খানা ছেড়ে কাঠের সিন্দুক থেকে সুদের লিষ্টিখানা বের কর দেখি। আজ কি আর সবাইকে পাব—দুপুর হয়ে গেল যে! রাত থাকতেই সব ব্যাটা টাকা দেবার ভয়ে বাড়ী থেকে পালাবে না!"

ঘনশ্যাম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কাঠের সিন্দুক হইতে সুদের হিসাব বাহির করিয়া দিল। সিদ্ধেশ্বর সেই কাগজখানির এক কোণে দুর্গা নাম লিখিয়া, তাহাই কয়েকবার কপালে স্পর্শ করাইয়া 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কিছু দূর অগ্রসর হইতেই তাহার চোখে পড়িল—রতন চৌধুরী গাড়ু হাতে করিয়া মাঠ হইতে ফিরিতেছে। কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইয়াই সে সচকিত ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, পুনরায় মাঠের দিকেই চলিতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। সে দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"রতন খুড়ো, ও রতন খুড়ো।"

রতন খুড়ো তখন মাঠের রাস্তা ধরিয়া হনহন করিয়া চলিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর তখন প্রায় দৌড়াইয়া রতন চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—"বলি খুড়োর কি পেটের অসুখ?"

বিবর্ণ মুখে রতন কহিল—"না, তা কেন?"

সিদ্ধেশ্বর হাসিয়া বলিল—"তাই তো দেখ্‌তে পাচ্ছি খুড়ো। এই তো মাঠ থেকে ফিরছিলে—আবার চট করে ঘুরেই দৌড়ুতে লাগ্‌লে যে।"

রতন বাঁ হাত একবার পেটে বুলাইয়া কহিল—"পেটটা হঠাৎ কেমন কামড়ে উঠ্‌লো সিদ্ধেশ্বর।"

সিদ্ধেশ্বর অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিল—"এখন আর বোধ হয় নাই, কি বল খুড়ো? কিন্তু সকাল বেলাটা খুব দৌড় খাওয়ালে যা হোক। ভাগ্যিস ছোট বেলায় এ অভ্যাসটা ছিল—নইলে তোমাকে ধরা কি আজ সোজা হোতো।"

রতন মনে মনে সিদ্ধেশ্বরের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বর বলিল—"আজকে তোমার সুদের তিনটে টাকা দেবার কথা ছিল না?"

রতন মুখ কালি করিয়া কহিল—"কিন্তু আজ না হলে কি চলে না সিদ্ধেশ্বর?"

একগাল হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর কহিল—"শোনো খুড়োর কথা! বলি চলবে আবার না কেন—কিন্তু তুমি তো আর অন্য লোক নও যে, বারবার তাগাদা করতে হবে। সেইজন্যে মনে করেছি—আজকের এক তাগাদাতেই শেষ করে যাব।"

রতন মনে মনে ঠিক বুঝিল যে, টাকা কয়টি না লইয়া আজ আর সিদ্ধেশ্বর রেহাই দিবে না। তবু আর একবার কহিল—"কিন্তু আজ তো সব কয়টা টাকা দিতে পারবো না সিদ্ধেশ্বর।"

সিদ্ধেশ্বর কহিল—"সব টাকা আজ তোমার কাছে কে চায় বাপু? আসল টাকা তো আর চাচ্ছি নে—সে তুমি যত দিনে পার দিও। শুধু সুদের তিনটি টাকা।"

গত্যন্তর না দেখিয়া রতন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তবে চল।"

টাকা তিনটি লইয়া সিদ্ধেশ্বর আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূরে ষষ্ঠীচরণ মাঝির কুটীরের নিকটে গিয়া হাঁকিল—"বলি ষষ্ঠী, ও ষষ্ঠীচরণ!"

কিন্তু ভিতর হইতে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। দু' চারিবার হাঁক দিবার পরও কোনও ফল হইল না দেখিয়া, সে ভিতরের উঠানে যাইয়া উপস্থিত হইল। ষষ্ঠীচরণ তখন সত্যই বাড়ীতে ছিল না—নৌকা লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরের হাঁক-ডাক শুনিয়া, একগলা ঘোমটা টানিয়া, দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সিদ্ধেশ্বর রুষ্টস্বরে বলিল—"ষষ্ঠী ঘরে নাই?" ষষ্ঠীর স্ত্রী মাথা ঝাঁকাইয়া জানাইল—না।

সিদ্ধেশ্বর একেবারে ঝাঁকিয়া বলিয়া উঠিল—"না—না! মাথা ঝাঁকালেই আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আর কি! ঘরে তো নাই—কিন্তু চারটে পয়সা সুদের রেখে গিয়েছে তো? কি—তাও রাখে

নাই ? তবেই মুণ্ডপাত করেছে ! কিন্তু ওসব আমি শুনবো না বলে দিচ্ছি। সুদ আদায় না করে আর এক পাও নড়ছি নে।”

ষষ্ঠীচরণের স্ত্রী প্রমাদ গণিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইয়া রহিল। সিদ্ধেশ্বর হুঙ্কার দিয়া হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকিয়া বলিতে লাগিল—“বলি দাঁড়িয়ে থাকলেই চল্‌বে ? দু’ দশ টাকা নয়—মাত্র চারটি পয়সা—ফেলে দিলেই তো হয়। এক দরজায় দাঁড়ালেই তো আমার দিন যাবে না।”

তার পর উঠানের এক প্রান্তে লাউমাচার উপর দুইটি সুদৃশ্য লাউ ঝুলিতেছে দেখিয়া, অনেকটা আশান্বিত হইয়া, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল—“পয়সা যদি না দিতে পার—এই দুইটি লাউ নিয়ে যাচ্ছি আজকের মত। এ দুটির দাম কি আর চার পয়সা হবে ? ঠকাই হলো আমার। যাক্‌, এবারকার মতো সুদটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিচ্ছি, আর এমন যেন গোলমাল না হয়।”

তার পর সে লাউ দুইটি ছিঁড়িয়া মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল—“কম পক্ষে আট পয়সা ! যথা লাভ !”

এইরূপে সমস্ত গ্রামে সুদের টাকা, অথবা তাহা না পাইলে, তাহার পরিবর্ত্তে তরি-তরকারী লইয়া যখন সিদ্ধেশ্বর দোকানে ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারটা। উঠানে তখন পাঁচ ছয়জন টাকা ধার লইবার জন্য হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া বসিয়া ছিল। সিদ্ধেশ্বর সেই সুদের টাকাই পুনরায় তাহাদের মধ্যে যোগাইয়া দিল ; এবং সে টাকায় যাহাদের সঙ্কুলান হইল না, তাহাদের কাল আসিতে বলিয়া দিল। কারণ, আজ দুই বৎসর হইতে সিদ্ধেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে আর সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিবে না।

(৩)

বেলা তখন প্রায় চারটা। সিদ্ধেশ্বর আহার শেষ করিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, এমন সময় হরিমতি বৈষ্ণবী কোথা হইতে আসিয়া তাহার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া কহিল—“গোটাকত টাকা ধার দিতে হয় যে কর্ত্তা !”

সিদ্ধেশ্বর পা টানিয়া লইয়া, একটু সরিয়া বসিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিল—“আমার টাকার কি দাম নাই যে, যাকে-তাকে টাকা ধার দিতে যাব ?”

“দাম থাকবে না কেন—কিন্তু আমাকে টাকা দিলে কি তোমার টাকা অপবিত্র হয়ে যাবে ?” এই বলিয়া হরিমতি একটু ফিক করিয়া হাসিল। এ হাসি সেই হাসিতে পারে, যাহার মুখ কলঙ্কের কালিতে চিরদিনের মত আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু ইহার ভিতরে যে তীব্র মাদকতা বর্ত্তমান থাকে, বিগতযৌবনা হরিমতির এই কদর্য্য হাসিতে তাহার লেশমাত্র অস্তিত্ব ছিল না। এক দিন হয় তো সে এই হাসির ছলনায় অনেক পুরুষকে মজাইয়াছে, কিন্তু এখন এই বয়স্থা বারবিলাসিনীর মুখের হাসিতে পুরুষের মুখে শুধু ব্যঙ্গের হাসিই ফুটিয়া উঠে !

সিদ্ধেশ্বর হুঁকায় সজোরে দুই-তিনটা টান দিয়া বিকৃতমুখে কহিল—“হুঁ, অপবিত্র হয়। এইবার হলো তো।”

হরিমতি আবার একটু হাসিয়া বলিল—“কিন্তু টাকা না দিলে যে আমার একেবারেই উপায় নাই। আমি খাব কি ?”

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সিদ্ধেশ্বর কহিল—“তার আমি কি জানি ?”

“কিন্তু তোমারই তো জান্‌তে হতো”—এই বলিয়া সে এক কপট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে চাহিল।

সিদ্ধেশ্বর একেবারে মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—“ইঃ ! জানতে হতো ! জান্‌তে আমার বয়ে গ্যাছে। আর বকিও না বাপু, ভাল চাও তো তাড়াতাড়ি বিদেয় হও। তোমার টাকার অভাব হবে না—বরং অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখো।”

খোঁচা খাইয়া হরিমতির মত প্রাণও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—“তা হলে আর তোমার মত কঞ্জুষের কাছে আসতাম না। আমার দিনকাল মন্দ পড়েছে বলেই না অপমান হতে এসেছি ! নইলে এ বারো বছরের মধ্যে কতবার তোমার কাছে ক’ টাকা ধার চেয়েছি বল্‌তে পার ?”

“না চাও নি,—কিন্তু চাইলেও যে পেতে না, এ কথাও আজ বলে দিচ্ছি। হাড়ি, ডোম, চামার সবাইকে টাকা ধার দিতে পারি—কিন্তু তোমাকে নয়।”

হরিমতির পিঠে যেন কে চাবুক মারিল। সে বিবর্ণমুখে কহিল—“তা জানতাম না। কিন্তু টাকা তোমার কাছে ভিক্ষে চাই নি, ধার চেয়েছিলাম।” এই বলিয়া সে উঠিল। আর সিদ্ধেশ্বর সেইখানেই বসিয়া হুঁকায় দমের উপর দম দিতে লাগিল। তামাক কখন যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে—গত জীবনের একটি অধ্যায়ের সমস্ত চিত্র একসঙ্গে মনের মাঝে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া,—সেদিকে আর তাহার খেয়াল ছিল না।

সহসা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সে হুঁকা রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—“ঘনশ্যাম !”

ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি দোকান-ঘর হইতে উত্তর করিল “আজ্ঞে !” মুখ খিঁচাইয়া সিদ্ধেশ্বর কহিল—“আজ্ঞে ! বলি চোখের মাথা কি খেয়েছ ? যত সব ‘ইয়ে’ বাড়ীর ভেতর হুট করে ঢুকে পড়ে—দেখ্‌তে পাও না !”

তাহার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ঘনশ্যাম দোকান-ঘর হইতে বাহির হইয়া মনিবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

“সংয়ের মত দাঁড়িয়ে থাকলেই চল্‌বে ?”

কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া ঘনশ্যাম মাথা চুলকাইতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বর কহিল—“কোন্ আক্কেলে তুই হরি বোষ্টমীকে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দিলি ? এটা ভদ্রলোকের বাড়ী তো !”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই—ভবিষ্যতে—।”

সিদ্ধেশ্বর যে ভদ্রলোক, এ কথা স্বীকার করিয়া লইলে সে খুসী হইয়া উঠিত। ঘনশ্যামের কথায় এইবার তাহার ক্রোধের অনেকটা উপশম হইল। সে কহিল—“হ্যাঁ, ভবিষ্যতে আর যেন সে বাড়ীতে ঢুকতে না পারে। ওর সাথে আমার কিসের সম্পর্ক যে, ওকে আমি টাকা ধার দিতে যাব বল দেখি।”

ঘনশ্যাম একগাল হাসিয়া বলিল—“আরে রাম বল—ওর সাথে আবার আমাদের কিসের সম্পর্ক !”

সিদ্ধেশ্বর উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—“না—কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু কি আক্কেল ওর বল দেখি ঘনশ্যাম ! একেবারে হুট করে দাওয়ায় উঠে, আমার গা ঘেঁসে বসলো রে। কলিকাল—ঘোর কলিকাল ! নইলে ভদ্রলোকের একটু মানসম্ভ্রমও কি রাখ্‌তে নাই ! আরে, সৎপথে থাক্‌লে, তোরই কি এ দশা হ’তো। আজ তোকে না হয় হতচ্ছেদ্দা করছি—কিন্তু ভদ্র ভাবে চল্‌লে তো তা হ’তো না। আজ যাকে দুটো টাকা ধার দিতে গেলেও গা ঘিনঘিন করে ওঠে—তারই হাতে হয় তো সব সঁপে দিয়ে—।” মনের আবেগে কি কথা বলিয়া ফেলিতেছিল—খেয়াল হইতেই সে থামিয়া গিয়া, ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়া উঠিল—“ফের যদি ওকে আবার এ বাড়ীতে দেখ্‌তে পাই, তাহলে ঘনশ্যাম তোর চাকরির দফা রফা—এই কথা আজ বলে দিলাম। হ্যাঁ।”

এই বলিয়া সে তামাক ও অগ্নিহীন কলিকা সংযুক্ত হুঁকাটি সজোরে টানিতে লাগিল। অতঃপর ঘনশ্যাম মনিবের ভাবভঙ্গী দেখিয়া কোনও কথা না বলিয়া কলিকাটি লইয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

(৪)

ইহারই দিন তিন-চার পরে সিদ্ধেশ্বর প্রাতঃকালে সুদের টাকা আদায় করিতে বাহির হইয়াছে—এমন সময় ‘গ্রামের গেজেট’ পাঁচু ঠাকুর্দ্দা একগাল হাসিয়া কহিল—“সিদ্ধেশ্বর ভায়া যে—নমস্কার !” সিদ্ধেশ্বর নমস্কার বলিয়াই সরিয়া পড়িতেছিল—কেন না, ইহার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, আজ সুদ আদায়ের দফা রফা হইয়া যাইবে। কিন্তু পাঁচু ঠাকুরদাও ছাড়িবার পত্র নয়। সে কহিল—“সে খবরটা শুনেছ হে ?”

অপ্রসন্নমুখে সিদ্ধেশ্বর কহিল—“কিসের খবর পাঁচু ঠাকুরদা ?” ঠাকুরদা যেন অবাক হইয়া বলিল—“এত বড় ভীষণ কাণ্ড, আর তুমিই শোন নি ! ভয়ঙ্কর ব্যাপার হে, ভয়ঙ্কর ব্যাপার। হরিমতি বোষ্টমী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। এইমাত্র সেখানে উঁকি মেরে দেখে এলাম—পুলিশের লোক হৈ চৈ করছে, আর হরিমতির ছোট্ট মেয়েটা বসে বসে কাঁদছে।”

সিদ্ধেশ্বরের বুকের ভিতরটা যেন একবার মোচড় খাইয়া গেল ; কিন্তু তবু হাসিয়াই কহিল—“মাগিটা হঠাৎ গলায় দড়ি দিতে গেল কেন ঠাকুরদা ?”

ঠাকুরদা মাথা ঝাঁকাইয়া বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া কহিল—“পেটের দায়ে ভাই, পেটের দায়ে। ঐটি যদি না চল্লো তবে আর প্রাণপাখী রেখে ফল কি বলো। এই পেটের জন্যই তো সব।”

“তা তো বটেই।”—এইটুকু বলিয়াই সিদ্ধেশ্বর নীরব

হইয়া রহিল—কারণ এই সময় হরিমতির টাকা ধার করিতে আসিবার কথা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

পাঁচু ঠাকুরদা বলিতে লাগিল—"অথচ এই হরিমতির কত প্রতিপত্তিই না দেখেছি। ও তো কোন্ এক ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে এই গ্রামে আসে। তার পর যখন সেই ছোঁড়া ওকে ফেলে রেখে চম্পট দিলে, তখন বুঝলে হে ভায়া, গ্রামের লোক তো ওকে পেয়ে বসলো। আরে ভাই, পুরুষের ধন আর রমণীর যৌবন থাকলে তো আর খাতিরের অভাব হয় না। কিন্তু সবই তো, ঐ যে কথায় বলে, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে! যে লোকের ঘরে স্বয়ং জমিদারের পায়ের ধূলো পড়তো, তাকে কি না পাইক-প্যায়দাও পুছলো না হে! শেষটায় না খেতে পেয়ে মারা গেল!"

সিদ্ধেশ্বর গম্ভীরভাবে কহিল—"হুঁ।"

"কিন্তু ও যদি আরও বছর দুই কোনও রকমে চালিয়ে নিতে পারতো, তা হলে আর এ রকমটা হতো না। মেয়েটাও যুগ্যি হয়ে উঠ্ছিল। বছর দুই পরে সেই ঠাট বজায় করে তুলতো। হলে হবে কি—সবই কপাল, কপাল!"

সিদ্ধেশ্বর আর সেখানে অপেক্ষা করিল না—সে 'চল্লুম দাদা' বলিয়া আর কোনও উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার টাকা আদায়ের তীব্র সঙ্কল্পের তখন আর কিছুমাত্র অস্তিত্ব ছিল না। দুইজন খাতক তাহারই চোখের সম্মুখ দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল—কিন্তু সে এম্নি উন্মনা হইয়া রহিয়াছিল যে, তাহা সিদ্ধেশ্বরের নয়নগোচর হইল না। তাহার মনের মাঝে কেবল এই কথা জাগিতেছিল—হরিমতি অনাহারে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে,—তাহার মৃতদেহ আটকের জন্য পুলিশ আসিয়াছে, আর তাহার সদ্যমাতৃহীনা কন্যাটি আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে সে যে কখন হরিমতির বাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সম্মুখে জনতা দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিল; এবং কেহ তাহাকে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, সে ফিরিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

এত সত্বর মনিবকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া ঘনশ্যাম বিস্মিত হইয়া কহিল—"এত সকালেই ফিরলে যে কর্ত্তা?"

কর্ত্তা ঘোর অপ্রসন্ন ভাবে শুধু কহিল—"হুঁ।"

ঘনশ্যাম আবার সাহস করিয়া প্রশ্ন করিল—"সব টাকা আদায় হলো?"

সিদ্ধেশ্বর মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"আদায় হ'লো না ছাই! সব ব্যাটা পাজির ধাড়ি—কারুরই দেখা মিললো না। সবাই মজা দেখ্তে হরিমতির বাড়ী ধন্না দিয়েছে যে!"

ঘনশ্যাম অবাক হইয়া কহিল—"হরিমতির বাড়ী?"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ন্যাকা কি না—কিছুই জানেন না। মাগি যে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে রে হতভাগা! আর সব ব্যাটা নিমকহারাম তাই দেখ্তে ছুটেছে! অথচ সে যে না খেতে পেয়ে মারা গেল—এ কথাটা কেউ ভেবে দেখ্লে না।"

সে কথা ভাবিয়া দেখিবার যে গ্রামের লোকের কিছুমাত্র প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহা ঘনশ্যামের বোধগম্য হইল না; কিন্তু ইহার কোনও উত্তর না দিয়া, সে মনিবের জন্য তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

হুঁকায় দুই টান দিয়া আবার সিদ্ধেশ্বর বলিতে লাগিল—"আর পুলিশের লোক যেন শকুনের জাত! আরে বাপু, ও মনের দুঃখে মরেছে না হয় গলায় দড়ি দিয়েই—তাতে তোদের কি বল্ তো? কিছু টাকা নেবার মতলব আর কি!"

ঘনশ্যাম কহিল—"ওরা তো তাই চায় কর্ত্তা।"

সিদ্ধেশ্বর একেবারে মারমুখী হইয়া বলিয়া উঠিল—"ইস্—তাই চায়। আমি কেন দিতে যাব রে হারামজাদা? হরিমতি মরেছে—তাতে আমার কি রে শূয়ার? তারা চায়! চাইলেই হ'লো? ওর দেহ নিয়ে ওরা যা ইচ্ছে করুকগে—আমার তা'তে দরকার কি?"

ঘনশ্যাম মনিবের আবোল তাবোল কথার কোনও মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শুধু মাথা চুলকাইতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, আবার তাড়া দিয়া কহিল—"দোকান-ঘরটা খুলে রেখে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্লেই চল্বে? গল্প পেলে ব্যাটার আর কোনও দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না।"

ঘনশ্যাম আর সেখানে থাকা সুবিধার নয় বুঝিয়া দোকান-ঘরে চলিয়া গেল, আর সিদ্ধেশ্বর হুঁকায় দমের উপর দম দিতে লাগিল। তামাকের ধোঁয়া যেমন কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল—তাহার মনের

মধ্যেও তেম্নি চিন্তার কুণ্ডলী পাক খাইয়া ফিরিতেছিল। কবে সে হরিমতিকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন্ দিন সে আর একজনের সহিত কুলত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে কবে সে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—তাহার চিন্তার ধারা শুধু এই সমস্ত ঘটনার স্মৃতির মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে এই সময় অর্থচিন্তা ভুলিল, খাতকগণের নাম বিস্মৃত হইল—শুধু সেই কুলত্যাগিনী হরিমতির বাল্যের মুখখানাই তাহার মানসপটে বারংবার ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

(৫)

ঘণ্টাখানেক পরে সিদ্ধেশ্বর ডাকিল—"ঘনশ্যাম!" ঘনশ্যাম হাতের কাজ ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসিল।

"আর একটু তামাক দে।" ঘনশ্যাম কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিলে, সিদ্ধেশ্বর কহিল—"এখন বোধ হয় হরিমতির দেহটা সদরে চালান দিয়েছে—না রে?"

ঘনশ্যাম কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে কহিল—"তা হতে পারে কর্ত্তা।"

সিদ্ধেশ্বর কোমলকণ্ঠে বলিল—"আহা! ওর সৎকারটাও হলো না রে। ইহকালে যা করেছে, তা তো করেছেই—কিন্তু পরকালেও যে একটুখানি শান্তি পাবে, তারও উপায় রইলো না। জাত বোষ্টমের মেয়ে—মনের ভুলে না হয় অন্যায়ই করে ফেলেছে,—কিন্তু তার কি আর সে পাপের ক্ষমা নাই?"

ঘনশ্যাম অবাক হইয়া তাহার মনিবের দিকে চাহিল। তাহার মুখ হইতে যে কোনও দিনের তরেও এমন স্নিগ্ধ সহানুভূতির কথা বাহির হইতে পারে, এ কথা সে কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। যাহাকে সেদিন একটি পয়সা দিয়াও সে সাহায্য করে নাই, এমন কি, উহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছে বলিয়া ঘনশ্যামের প্রতি অজস্র কটু কথা বর্ষিত হইয়াছে—তাহারই আত্মহত্যায় এই নিষ্ঠুর লোকের হৃদয়ে কেন যে আঘাত লাগিল, এ কথা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে কোনও উত্তর না করিয়া হুঁকার উপর কলিকা দিয়া মনিবের হাতে তুলিয়া দিল।

সিদ্ধেশ্বর স্নিগ্ধস্বরে বলিল—"একবার চট করে দেখে আয় না বাবা, সত্যিই ওর দেহটা চালান দিয়েছে কি না। আর হ্যাঁ, শুধু হাতে গেলেই তো ব্যাটারা ছাড়বে না ঘনশ্যাম, তাই বলি কি—গুটি পঞ্চাশেক টাকা না হয় সিন্দুক খুলে নিয়ে যা। যদি ওরা থাকে কিছু টাকা দিয়ে হরিমতির দেহটা খালাস করে নিবি। টাকা পেলে নিশ্চয়ই ওরা সরে পড়বে—কি বলিস্ রে ঘনশ্যাম। হ্যাঁ, আর এক কথা—তারপর দেহটারও যাতে ভালরকম সৎকার হয় তার ব্যবস্থাটাও ঐ সঙ্গে করে আসিস ঘনশ্যাম।"

ঘনশ্যাম অপ্রসন্ন মুখে কহিল—"কিন্তু তার দেহ সৎকার করতে যাবে কে কর্ত্তা?"

"রাগ করিস নি বাবা। মনে কর, তুই তার ছেলে—তার পরকালের কাজটা না হয় তুইই কর্লি। সে যে জাত বোষ্টমের মেয়ে রে ঘনশ্যাম। মনের ভুলে অন্যায় করে ফেলেচে বলেই কি আমরা তাকে ভাগাড়ে ফেলে দিতে পারি। জনকতক বোষ্টম দিয়ে তার দেহটা সৎকার করাবি। তারা স্বীকার করবে না ভাবছিস্—হবে বৈ কি রে পাগ্লা। তাদেরও কিছু কিছু করে দিয়ে দিবি। টাকার অসাধ্য কিছু নেই রে, তাই তো এমনি করে সিন্দুক আগ্লে নিয়ে বসে আছি। আর দেরী করিস্ নে ঘনশ্যাম—চটপট যা।"

হতবুদ্ধি ঘনশ্যাম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইল। মনিবের সে বরাবর উগ্রমূর্ত্তিই দেখিয়া আসিয়াছে। আজ যদিচ এক চরিত্রহীনা রমণীর মৃতদেহকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার কঠিন হৃদয়ও সরস হইয়া উঠিয়াছে, তবুও তাহার হৃদয়ে যে কোমল ভাবেরও স্থান আছে, ইহা দেখিয়া সত্যই ঘনশ্যাম প্রীত হইল; এবং মনিব তাহাকে যে কাজের ভার দিয়া বসিল, তাহা লোকের চক্ষে জঘন্য হইলেও সে মনিবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিল না।

ঘনশ্যাম টাকা লইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই সিদ্ধেশ্বর কহিল—"আর দেখ, ফিরবার সময় ঐ মেয়েটাকেও না হয় এখানেই নিয়ে আসিস। একা একা মাতৃহীনা মেয়ে কি থাকতে পারবে রে ঘনশ্যাম! লোকে মন্দ বলবে? তা বলুক। লোকের কথাকে তো আমি ভারী ডরাই। আমি কি কারও দোরে পাত পাত্তে যাব রে, যে, লোকের কথা আমাকে শুন্তে হবে! আর ঐ ছোট্ট

মেয়েটার দিকে না তাকালেই বা চল্‌বে, কি করে শুনি? এখন থেকে সৎশিক্ষা দিয়ে যদি ওকে গড়তে পারা যায়, তা' হলে ওর মায়ের মত নাও হতে পারে তো। না রে, তুই কিচ্ছু ভাবিস্‌নি, ওকে সঙ্গে করেই আনিস্।"

প্রায় সন্ধ্যাকালে ঘনশ্যাম যখন হরিমতির কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে পৌছিল, তখনও সিদ্ধেশ্বর সেই একই জায়গায় একই ভাবে বসিয়া ছিল। তাহাদের আসিতে দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরের মুখ এইবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, কহিল,—"সব কাজ চুকে-বুকে গেলরে ঘনশ্যাম? কোনও গোলমাল হয়নি তো?"

ঘনশ্যাম জানাইল, সমস্তই সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর হৃষ্ট হইয়া কহিল—"তা আমি আগেই জানি রে। রূপচাঁদের মাহাত্ম্য তো দেখ্‌লি? সাধে কি আর এরই জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলি রে।"

তার পর হরিমতির কন্যার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—"আহা, দুঃখে কষ্টে মায়ের আমার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। তা' আর কি করবি মা—এখন এই গরীব ছেলের বাড়ীতেই তো তোকে থাকতে হবে। এত দিন এই ঘনশ্যামটার হাতে ছিলাম—এইবার তুইও এলি। দুজন মিলে এই বুড়োকে একটু একটু দেখিস্ আর কি!"

পরের দিন গ্রামের লোক রটনা করিতে লাগিল—সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধিলাভ করিতে আর দেরী নাই,—সে শীঘ্রই তান্ত্রিক মতে কিশোরী সাধন আরম্ভ করিবে।

সিদ্ধেশ্বরের কানেও সে কথা উঠিল; কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। সে হরিমতির কন্যার মাথাকে সস্নেহ পরশ বুলাইয়া বলিতে লাগিল—"শেষটায় তুইও তো তোর মায়ের মত আবার নিমকহারামি করবি নে মা?"

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৯]

প্রমথর সহিত কথার পর অমলা ক্ষণকাল বুদ্ধিহতর মত চুপ করিয়া একলা বসিয়া রহিল। সে যে এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছে এবং অতঃপর কি করিবে, তাহা ভাল করিয়া ধারণা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার লোপ পাইবার উপক্রম করিল! কয়েক ঘণ্টা পরেই যে মহা সমস্যার সময় আসিবে, তাহার কথা মনে মনে ভাবিবার সাহসও তাহার রহিল না। সে নিজেই জীবন ও মৃত্যুকে একই সময়ে আহ্বান করিয়াছে,—অদৃষ্টে কি আছে, কাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, কে জানে!

কিন্তু স্বল্পাবশিষ্ট সময়টুকু যতই ক্ষয় পাইতে লাগিল, ততই অমলা তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা অনুভব করিতে লাগিল। আসন্ন সম্ভাবনার সমাধান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না। রাত্রে ছায়া দর্শন করিয়া ভীত হইয়া মানুষে যেমন কখন কখন ভ্রম নিরাকরণের জন্য ছুটিয়া গিয়া তাহা স্পর্শ করিয়া দেখে, তেমনি অমলার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তখনি কোন রূপে রাত্রি বারটার অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তাহার ভয়াবহ ভবিষ্যতের অদৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হয়! কিছুক্ষণ পরে যখন সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই হইবে, তখন ক্ষণকালের জন্য তীরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া কি ফল! মানুষের মনে ভয়াবহের প্রতি যে দুরতিক্রমনীয় আকর্ষণ আছে, অমলা মনের মধ্যে সেই প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল। এই অধৈর্য্যতার মধ্য হইতে সে মনের মধ্যে একটা শক্তিও লাভ করিল।

সুরেশ বাহিরের ঘরে মাষ্টারের নিকট পড়া করিতেছিল। সে উপরে আসিলে অস্বাভাবিক আগ্রহের সহিত অমলা তাহাকে ক্ষণকাল আদর করিল। তাহার পর যে সব জিনিস বহু দিন হইতে সুরেশের লোভ এবং প্রশংসা উদ্রিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, অথচ পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, অমলা দুই হস্তে সে সব জিনিস সুরেশকে দান করিতে লাগিল।

এ দানের অমিততা সুরেশকে পীড়ন করিল।

সে সবিস্ময়ে বলিল, "এ সব দিয়ে দিচ্ছ কেন দিদি? তোমার আর দরকার নেই?"

"আমি যে এখন বড় হয়েছি ভাই! এ সবে আমার আর দরকার নেই। কিন্তু খবরদার, আজ যেন মাকে বাবাকে এসব দেখাস নে।"

"কেন?"

কোনও কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া অমলা কহিল, "আজ দেখাতে নেই।"

"কাল সকালে দেখাতে আছে?"

"তা আছে।" বলিয়া অমলা তাহার উদ্বেল অশ্রু চাপিবার জন্য তাড়াতাড়ি জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

হরমোহনের সহিত অমলা কিছুক্ষণ কথা কহিল। কিন্তু প্রভাবতীর নিকট গিয়া বসিতেই, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ এবং চক্ষু সজল হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

প্রভাবতী ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এসেই চলে যাচ্ছিস্ যে অমলা? কোনও কথা ছিল?"

কোনও প্রকারে একটি মাত্র 'না' বলিয়া অমলা প্রস্থান করিল। মনে মনে বলিল, 'মা, তোমার পাপিষ্ঠা মেয়েকে ক্ষমা কোরো! হয় ত' আর এ জীবনেই তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয়ে উঠ্‌বে না! আজ তোমার সঙ্গে কথা কইতে গেলে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারব না!'

সকলে শয়ন করিলে, অমলা নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার পিতা মাতাকে দুইখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিল। কোথায় যাইতেছে, কাহার সহিত যাইতেছে, কিছুই লিখিল না,—শুধু লিখিল, কেন যাইতেছে। 'এ জীবন অসহ্য হয়েছে—তাই এ জীবন ত্যাগ করে যাচ্ছি।' তাহার পর ক্ষমা প্রার্থনা এবং প্রণাম। লিখিল, 'আমি যে আপনাদের মনের মত হয়ে থাকতে পারলাম না, তার জন্যে আমিই অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

পত্র লেখা শেষ হইলে, পত্র দুইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া তদুপরি চাবীর রিং স্থাপন করিয়া অমলা দেখিল, ঘড়ীতে সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে।

আর আধ-ঘণ্টা!

অমলার দেহের মধ্য দিয়া একটা তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল, এবং তাহার পরেই একটা গভীর অবসন্নতায় সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া আসিল! মনে হইল, যে শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তথায় রক্ত জমিয়া বরফ হইয়া আসিতেছে! সমস্ত শরীরটা ভার বোধ হইতে লাগিল এবং শীত শীত করিতে লাগিল।

দেহ পাছে বিকল হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় অমলা উঠিয়া পাদচারণা করিতে গেল; কিন্তু মনে হইল, দুই পায়ে কেহ যেন পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে। অতি কষ্টে পা টানিয়া টানিয়া সে কোনমতে তাহার গতিশক্তি বাঁচাইয়া রাখিল।

তৎপরে অমলা যখন বারাণ্ডায় আসিয়া ঘড়ী দেখিল, তখন বারটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি। আর দেরী করা চলে না! দেহের এই নিরবলম্ব অবস্থায়, উপর হইতে নামিয়া পথে বাহির হইতে কত সময় লাগিবে, কে জানে!

ঘর হইতে বাহির হইতে গিয়া অমলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। কি যে তাহার দেখিবার ছিল, এবং কি যে সে দেখিল, তাহা সে নিজেই বুঝিল না! ঘর-ভরা সামগ্রী উদাস অবগাঢ় ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অমলার ঘর হইতে সিঁড়ীর পথে যাইতে মধ্যে হরমোহনের ঘর পড়ে। তথায় একবার দাঁড়াইয়া, অমলা দ্বারে মস্তক ঠেকাইয়া তাহার নিদ্রিত পিতামাতাকে প্রণাম করিল। তাহার পর নিগড়বদ্ধ বন্দীর মত সিঁড়ীর হাতল জড়াইয়া জড়াইয়া নীচে নামিয়া গেল। বাকি রহিল, সদর দরজার অর্গল খুলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়া! অর্গলে হাত দিয়া অমলার মাথাটা ঘুরিয়া গেল,—মনে হইল, চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে! স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সে তাহার তন্দ্রাহত শক্তিতে ক্ষণকালের জন্য জাগ্রত রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কোন প্রকারে দেহটাকে দ্বারের অপর দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেই হইবে! তাহার পর অদৃষ্টে স্বর্গ অথবা নরক যাহাই থাকুক না কেন! কিন্তু দ্বারের এদিকে আর নয়,—আর নয়!

[২০]

রাজপথ তখন জনশূন্য, নিস্তব্ধ। পথের দুই ধারে গ্যাসের বাতি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং উপরে নক্ষত্র-খচিত স্তব্ধ আকাশ আসন্ন-অভিনয়-দৃশ্যের উপর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিয়াছে!

উপরে বড় ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিতে লাগিল। খট্ করিয়া দ্বারের শব্দ হইল, এবং পরমুহূর্ত্তেই অমলা ফুটপাথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। দরজাটা খোলাই থাকিয়া গেল, ভেজাইয়া দিবার কথা পর্য্যন্ত তাহার মনে রহিল না!

অদূরে একটা বৃহৎ মোটরকার উদ্যত হইয়া ছিল; অমলাকে দেখিবামাত্র সবেগে ছুটিয়া আসিয়া অমলার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অস্বাভাবিক তীক্ষ্নস্বরে অমলা চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে?—কে তুমি?"

"আমি বিজয়নাথ!"

"আমাকে ধর! তুলে নাও!"

মুহূর্ত্তের মধ্যে বিজয়নাথ নামিয়া আসিয়া, বাহু-বন্ধনে অমলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, মোটরকারে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া লইল।

পথের অপর দিকে একটা সেকেণ্ডক্লাস বন্ধ গাড়ী হইতে প্রমথ লাফাইয়া পড়িয়া মোটরের নিকট ছুটিয়া আসিল।

"অমলা! অমলা! আমি এখানে!"

কিন্তু তখন মোটর চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রমথকে দেখিয়া, মুখ বাহির করিয়া বিজয়নাথ উচ্চ স্বরে বলিল, "বন্ধু, সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা কোরো; কথা আছে!"

তাহার পর ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, অমলা অচৈতন্য, সংজ্ঞাহীন হইয়া আনত মস্তকে সীটের পার্শ্বে হেলিয়া রহিয়াছে। দুই হস্তে তাড়াতাড়ি তাহার মস্তক তুলিয়া লইয়া, নিজ বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া, কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বিজয়নাথ বলিল, "অমলা! অমলা! কি করছ?—শক্ত হও!"

সম্ভবতঃ অমলা বিজয়নাথের ডাক শুনিতে পাইল। তাহা ছাড়া, তাহার মুখে চক্ষে নিশীথের শীতল বায়ুও সবেগে লাগিতেছিল,—সে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিল।

বিজয়নাথ তেমনি বক্ষের উপর অমলার মস্তক ধরিয়া রাখিয়া, তাহার মুখের উপর গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শান্ত হও! আর ভয় কি?"

কোনও কথা না বলিয়া, অমলা স্তব্ধ হইয়া বিজয়নাথের বক্ষের উপর পড়িয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে মোটর একটা বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার গাড়ী-বারাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। যতটা মনে পড়িল,—অমলা দেখিল, এ তাহার বউবাজারের শ্বশুরালয় নহে।

গাড়ী-বারাণ্ডার সম্মুখে সিঁড়ীর উপর দাঁড়াইয়া একজন পুরুষ মানুষ এবং একজন স্ত্রীলোক অপেক্ষা করিতেছিল।

বিজয়নাথ গাড়ীর ভিতর হইতে বলিল, "দিদি, তুমি এসে ধরে নিয়ে যাও।"

এ কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না; কারণ, বিনোদিনী আপনিই নামিয়া আসিতেছিল। গাড়ীর দ্বার খুলিয়া, অমলাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া, বিনোদিনী স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "এস, ভাই, এস! বুঝতে পারছ না? তোমার দিদির বাড়ী। এসেছিলে ত দুবার।"

অমলা বুঝিতে পারিয়া, নত হইয়া, দুই হস্তে বিনোদিনীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

বিনোদিনীর স্বামী ব্রজবিলাস সিঁড়ীর উপর দাঁড়াইয়া প্রফুল্লমুখে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিল। অমলা নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই, তাহার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া ব্রজবিলাস বলিল, "সাবাশ! সাবাশ! তোমার মত তেজী আরও দু'চারটি মেয়ে বাংলাদেশে থাকলে, এই বিজয়ের মত সম্বন্ধীরা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তোমার চিঠি পড়ে আমি যে আজ কত খুসী হয়েছি, তা বলতে পারি নে! আমি তোমাকে সসম্মানে আমার বাড়ীতে আহ্বান করছি! আজ সন্ধ্যা থেকে আমি নিজের হাতে তোমার ঘর সাজিয়েছি। এস!"

ব্রজবিলাসের কথা শুনিয়া অমলার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; বিজয়নাথের চক্ষুও সজল হইয়া আসিল।

সমাপ্ত

মহাভিনিষ্ক্রমণ! (প্রতি বৎসর সেখানকার বৌদ্ধ মন্দিরের সর্ব্বপ্রাচীন মূর্ত্তিটিকে শ্রী ভগবান সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণের দিন মহাসমারোহে মিছিল ক'রে ঘুরিয়ে আনা হয়। বিগ্রহের নৌকাভ্রমণ সেই সমারোহের একটি প্রধান অঙ্গ।)

একেবারে ভারতের সঙ্গে সংলগ্ন অথচ সম্পূর্ণ স্বাধীন রয়েছে এখনও এই একমাত্র শ্যামভূমি!

শ্যামদেশে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব কতক পরিমাণে প্রবেশ ক'রলেও প্রাচ্যের প্রাচীনত্বকে সে একেবারে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারেনি। সেই একজন রাজারই সিংহাসন, রাজদণ্ড ও রাজছত্র তলে সমস্ত দেশ শাসিত হ'চ্ছে। রাজাই সে দেশের সর্ব্বে-সর্ব্বা!

শ্যামবাসীদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন লোক চাষবাস করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্যবসা বাণিজ্য সবই প্রায় চীনে বণিকদের হস্তগত। মজুর মিস্ত্রী; কারিকরের মধ্যেও কতক কতক চীনে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাছাড়া সে দেশের বাকিটা সবই রাজা, রাজসভা, রাজপ্রাসাদ। রাজার খুড়োরা, রাজার ভায়েরা, রাজার ভাইপো ও রাজার জ্ঞাতিরা, রাজার ভাগ্নে, রাজার মামা রাজার পাত্রমিত্র, সভাসদ্, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, সহচর, অনুচর প্রভৃতি ছোট বড় বহু কর্ম্মাধ্যক্ষ জুটে রাজ্যশাসনে রাজাকে সাহায্য ক'রছে।

শ্যামভূমিতে প্রায় এক কোটী লোকের বাস। তাদের সকলকে দেখ্‌তে যেন অনেকটা এক রকম। সেই মোঙ্গোলীয় বর্ণ, চোখ, মুখ, গঠন, আকৃতি—প্রায় সবারই সমান! এখনও প্রায় সকলেই সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ও দুঃখের কথা এই যে বাইরে থেকে দেখে এ জাতকে যতটা এক বলে মনে হয়, এদের মধ্যে সে একতার একান্ত অভাব!

চূড়া মুণ্ডনের জন্য সুসজ্জিত বালক।
[এই চিত্রে ইংরাজ সেনাপতির বেশে নৃপতি সুল্লালনকর্ণ স্বয়ং মুণ্ডিতচূড়া যুবরাজকে তীর্থ সলিলে স্নান করাচ্ছেন।

চৈত্র-মরু উৎসব। (চৈত্রের রৌদ্র-তপ্ত দিনে দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে ভক্তেরা এসে বালুকার ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মাণ করে [illegible] পুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত করে রেখে যায়।)

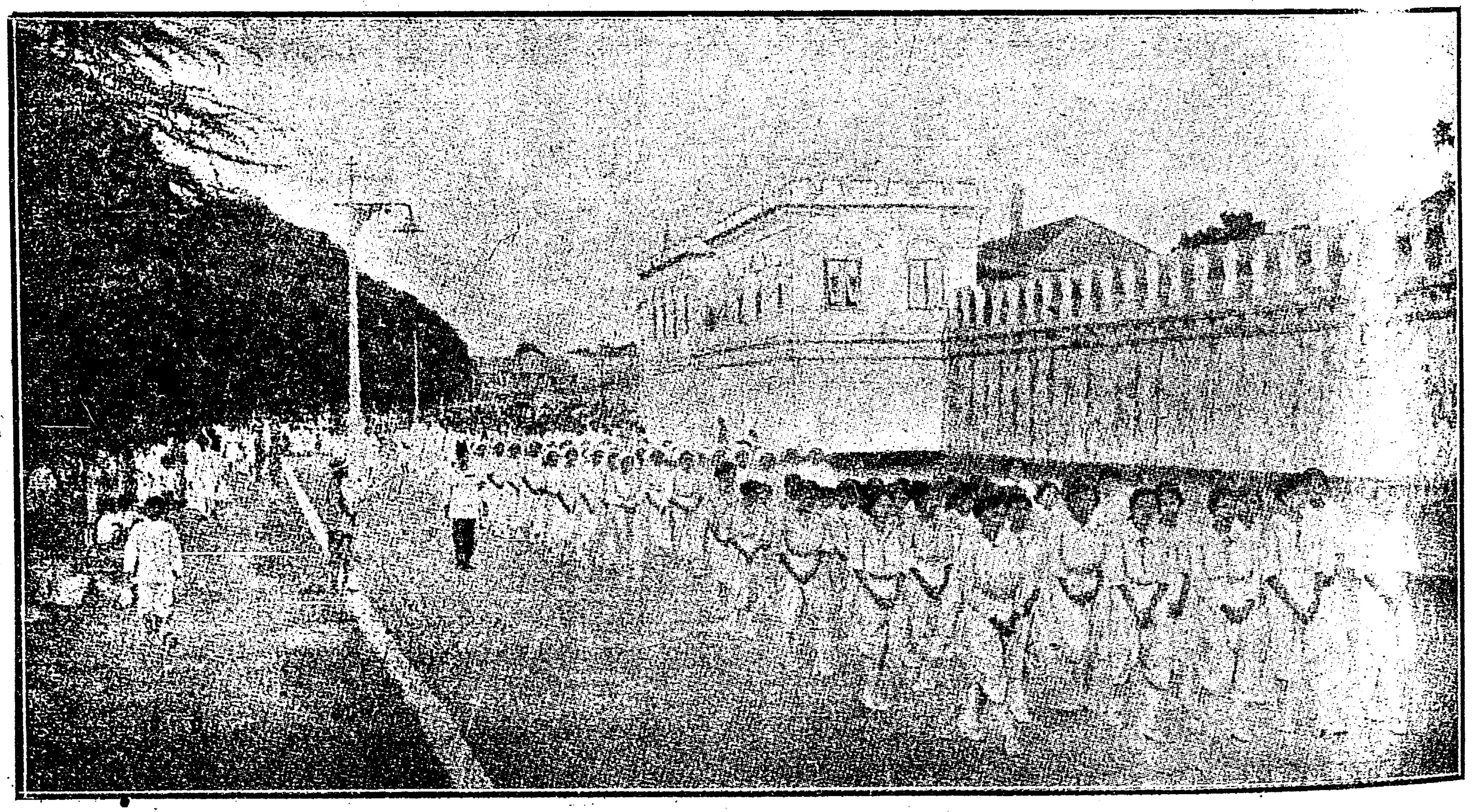

শ্মশান-যাত্রা। (রাজ-শবাধার শোভাযাত্রা করে মহাসমারোহে রাজতরণীর উপর নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। রাণীরা তাঁদের সমস্ত সহচরীদের সঙ্গে শ্বেত শুভ্র শোকবেশ পরিধান করে পদব্রজে এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছেন।)

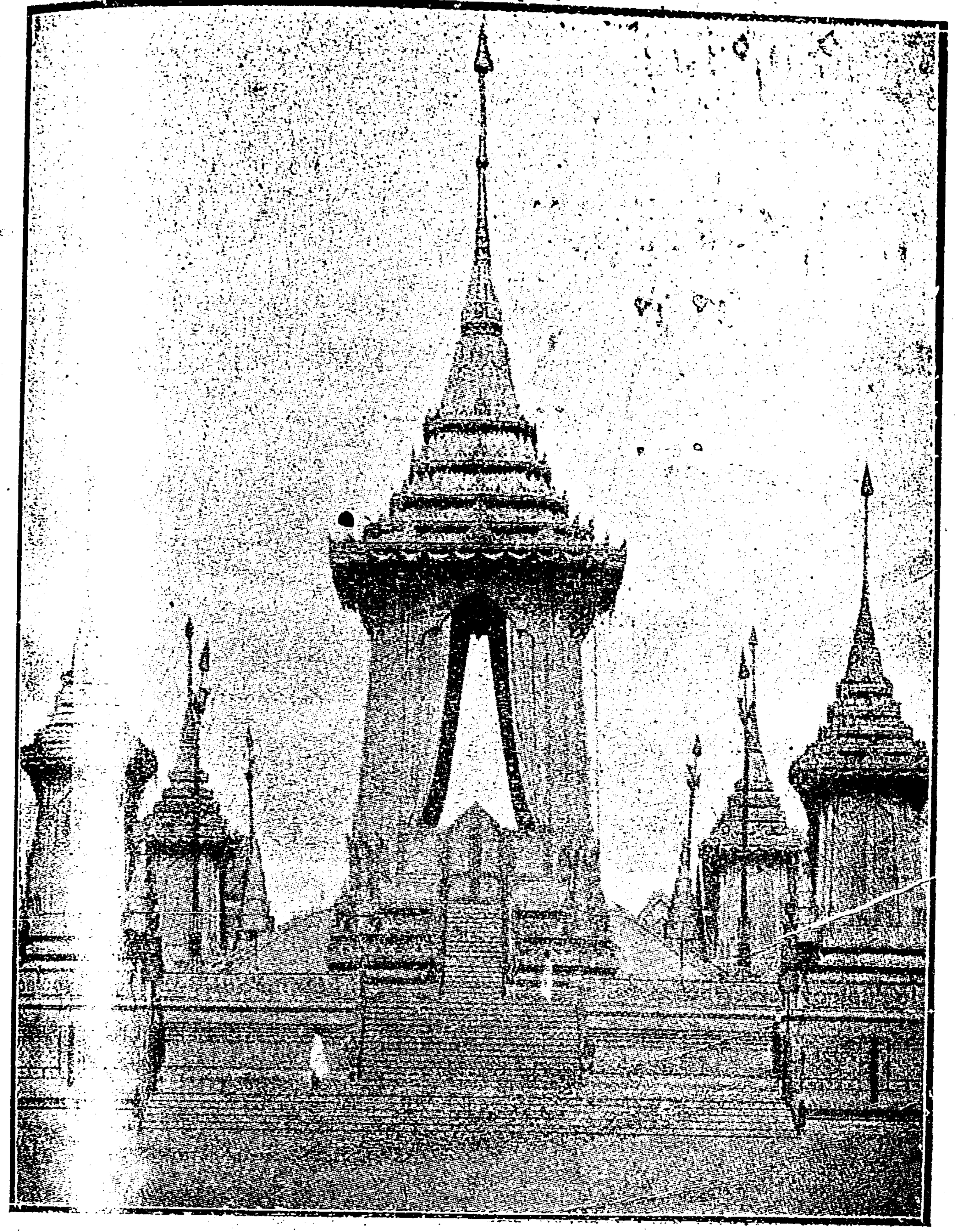

নৃ[illegible] সুলালন কর্ণের চিতামঞ্চ। (এমন বিরাট ওবিচিত্র কারুকার্য্যখচিত চি[illegible] ইতিপূর্ব্বে আর কোনও রাজার সৎকারের জন্য নির্ম্মিত হয় নি।)

শ্যাম[illegible]মির সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী মধ্যপ্রদেশে যারা বা[illegible] ক'রে তারাই হ'চ্ছে আসল বনিয়াদী 'শ্যাম্‌লী'। তারা এখনও নিজেদের "থায়" ব'লে পরিচয় [illegible], কারণ তাদের উৎপত্তি হ'য়েছিল অতি প্রাচীন [illegible]াঙ্গলীয় জাতির 'লায়ো-থায়্‌ ও মোন-আনাম্‌ না[illegible]ক দুটি সম্পূর্ণ পৃথক শাখার সংমিশ্রণের ফলে। [illegible]দের লোক সংখ্যা হবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ।

পূর্ব্ব ও উত্তর শ্যামখণ্ডে যারা বাস করে, তারা "লায়ো" বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। অথচ "থায়দের" সঙ্গে "লায়োদের" পোষাক পরিচ্ছদের, আচার ব্যবহারের, আকৃতি প্রকৃতির, এমন কি ভাষার পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মিল আছে! এদের সংখ্যা হবে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ।

এ ছাড়া শ্যামভূমির পার্ব্বত্য অংশের একদল পাহাড়ী অধিবাসী আছে, তারা যদিও আসল মোন্‌-আনাম্‌ জাতের লোক, কিন্তু ব্রহ্মবাসীদের সঙ্গে তাদের কিছু কিছু মিল আছে ব'লে মনে হয়; হয়ত কোনও সুদূর অতীতে ব্রহ্ম সীমান্তবাসীদের সঙ্গে পার্ব্বত্যশ্যামীদের মিলন ঘ'টে ছিল। শুধু ব্রহ্ম কেন, শান, আনাম্‌ মালয় প্রভৃতি প্রতিবেশীদের সহিত মিলনেরও স্পষ্ট প্রতিলিপি এদের অনেকেরই পীত ললাটপটে মুদ্রিত রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়।

শ্যামের রাজধানী 'ব্যাঙ্কক্‌' সহরে কিন্তু শ্যামভূমির অধিবাসীদের চেয়ে প্রবাসী বিদেশীদের সংখ্যাই বেশী। তার মধ্যে আবার চীনেদের ভাগই সকলের চেয়ে অধিক।

শ্যামবাসীদের দেহ বেশ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। পল্লীবাসীদের কথা ত' ছেড়েই দাও, কেননা তারা খোলা আলো বাতাসের মধ্যে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম ক'রে জীবন যাপন করে; সুতরাং তারা যে সুস্থ ও শক্তিমান হবে, তাতে আর

চূড়ামুণ্ডনের অধিবাসরাত্রে। (সেদিন বালককে পৃথক শয্যায় নববস্ত্রাদি পরে শয়ন করতে হয়।)

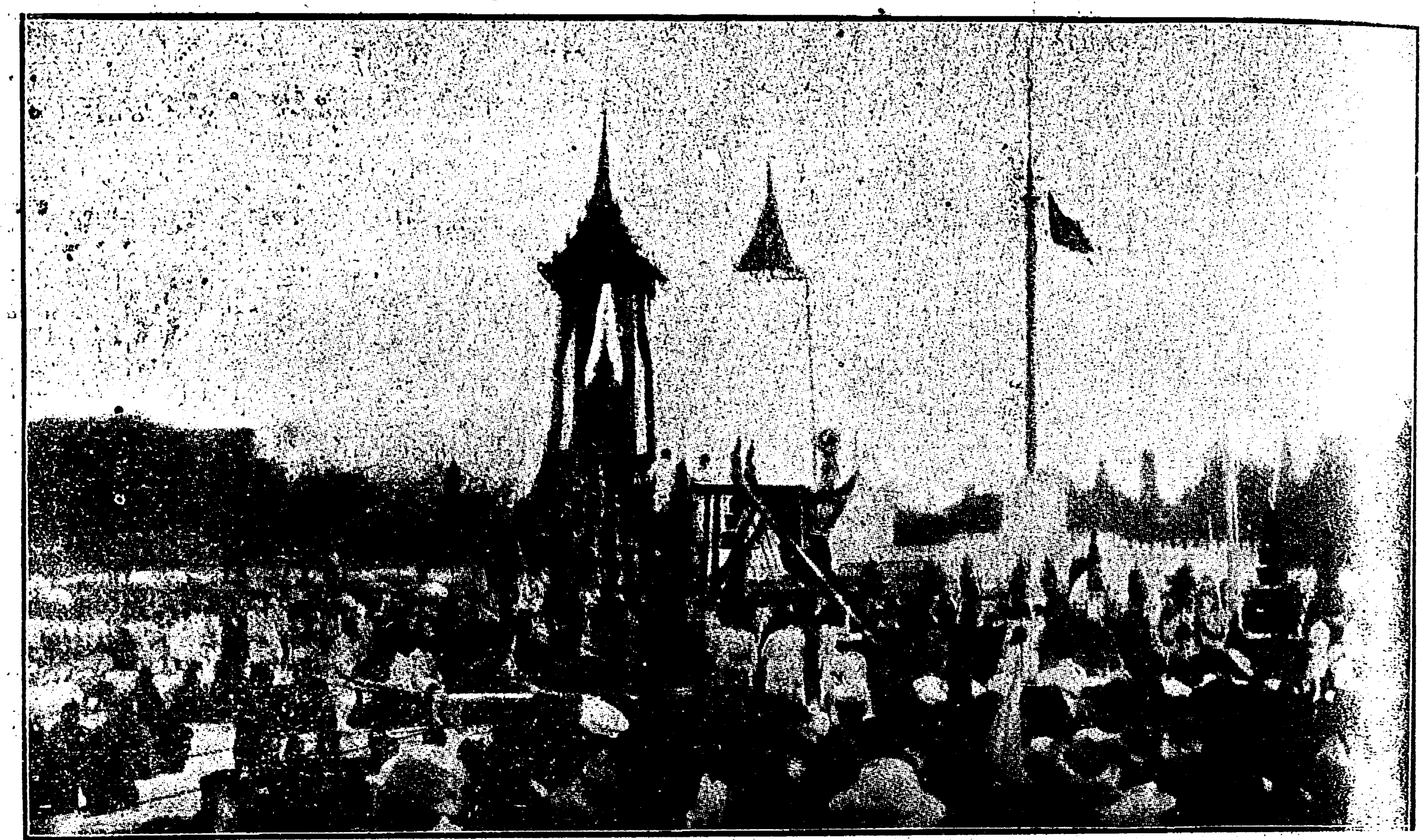

শ্মশান-ভূমি। (রাজার শবদেহ সৎকারের দিন তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানটি অতি রমণীয়ভাবে সজ্জিত ক[রা হ]য়)

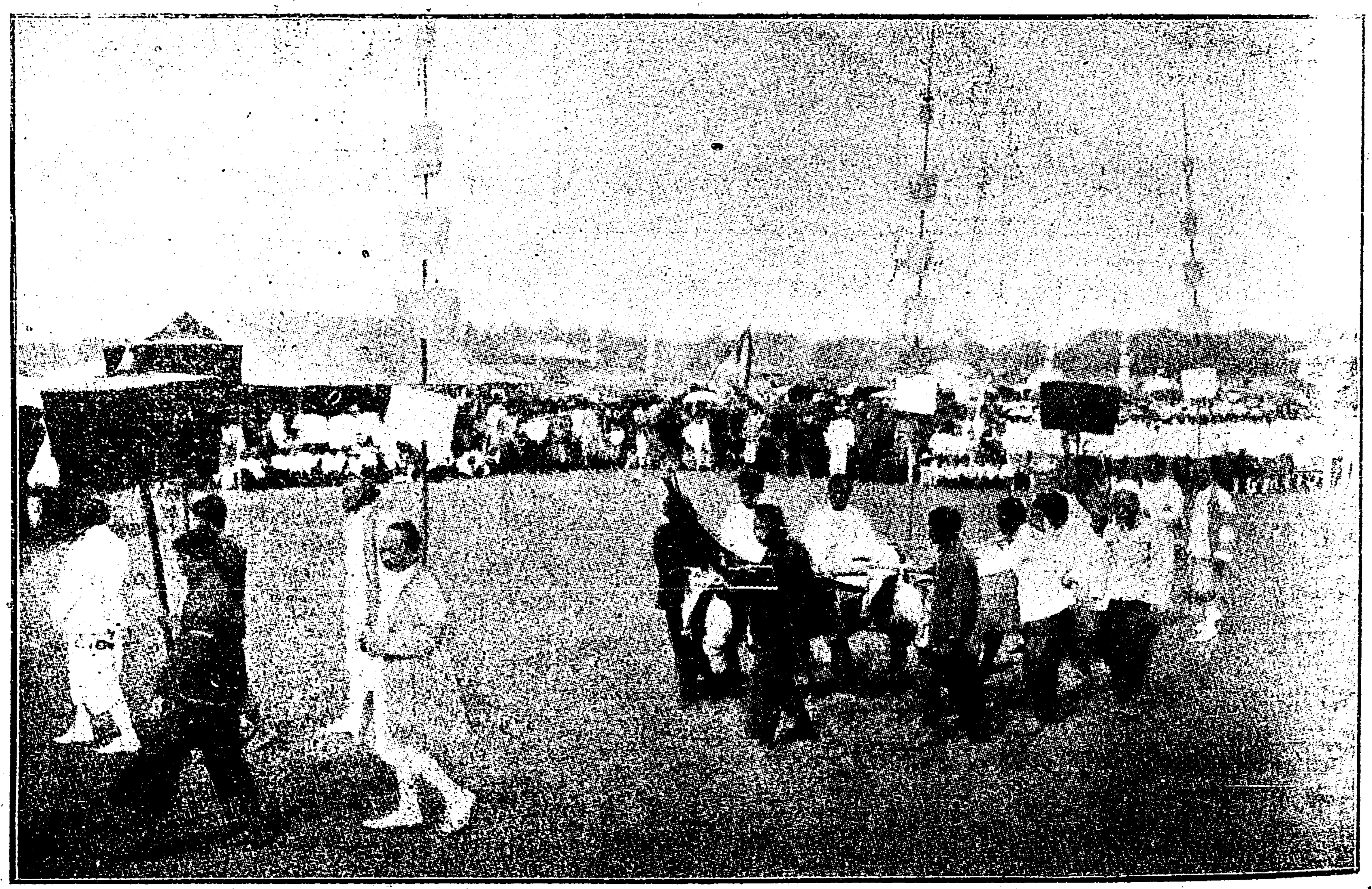

ভূমি কর্ষণ উৎসব। (প্রতি বৎসর ক্ষেতে বীজ বপন করবার সময় যখন জমীতে প্রথম হল-চালনা করা হয়, সেই সময় এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। সোণালী রং করা একখানি লাঙ্গলে সুসজ্জিত বলদ জুড়ে উৎসব বেশে চাষারা সেদিন মাঠে নামে। গ্রামশুদ্ধ লোক দেখ্‌তে আসে)।

বাজারের একটী দোকান।

কারেন্‌ তরুণী।

(এরা ঘাসের বীজের কারুকার্য্য খচিত জামা পরে। কাণে রূপার মাকড়ি ব্যবহার করে। কুমারী অবস্থায় এরা মাথায় ঢাকা দেয় না। বিবাহের পর মাথায় একখানি নীল ওড়না পরে। এরা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক।)

আশ্চর্য্য কি, কিন্তু সহরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে অলস জীবন যাপন ক'রছে যারা, তারাও আজকাল রাজার অনুগ্রহে তাদের হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে।

নৃপতি শ্যামরাজ ষষ্ঠ রাম তাঁর রাজ্যে শারীরিক ব্যায়াম একেবারে প্রত্যেক নগরবাসীর পক্ষে "বাধ্যতা-মূলক" বলে নিয়ম ক'রেছেন। ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে দৈহিক শক্তির স্ফূর্ত্তিকর ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি প্রচলন ক'রে তিনি শ্যামের প্রত্যেক ছেলেটিকে সুস্থ সবল সুদৃঢ় ও শক্তিমান ক'রে গ'ড়ে তুলছেন। তাঁর রাজ্যের প্রত্যেক যুবককে কিছু দিন সৈনিকের কার্য্য ক'রতে রাজাদেশে বাধ্য করা হ'য়েছে। এই ভাবে ব্যায়াম-ক্রীড়া, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি শারীরিক শক্তির চর্চ্চার দ্বারা শ্যামভূমি থেকে নৃপতি ষষ্ঠ রাম, অস্বাস্থ্য, দুর্ব্বলতা, আলস্য ও জড়তাকে দূরীভূত ক'রেছেন।

শ্যামভূমির লোক—কি পুরুষ কি নারী, কেউ কালো নয়। কাঁচা সোণার মত গৌরবর্ণ সম্ভ্রান্ত ধনীজায়া থেকে রৌদ্রতপ্ত কৃষক-বধূর তাম্র-গণ্ডে পর্য্যন্ত একটা কেমন গোলাপ ফুলের লালচে আভা লেগেই আছে! ভ্রমর-কৃষ্ণ কাল চুল অনেকেরই আছে; কিন্তু চোখ দু'টি প্রায় সবারই ক'টা! পুরুষেরা দাড়ি গোঁফ রাখে না।

আগে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ধর্ম্মভয়ে শুধু কেবল কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা বাব্‌রী চুল রাখ্‌তো। কিন্তু এই বছর দশ পনেরো থেকে রাজেন্দ্র ষষ্ঠ রামের কল্যাণে তারা বাব্‌রী চুল রাখাটা যে ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় কোনও ব্যাপার নয় এটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে। তাই এখন ছেলেরা রীতিমতো ছোট-বড় চুল ছাঁটছে এবং মেয়েরা তাদের উচ্ছ্বসিত কুন্তল-তরঙ্গকে আর নিতম্ব চুম্বনে বাধা দিচ্ছে না।

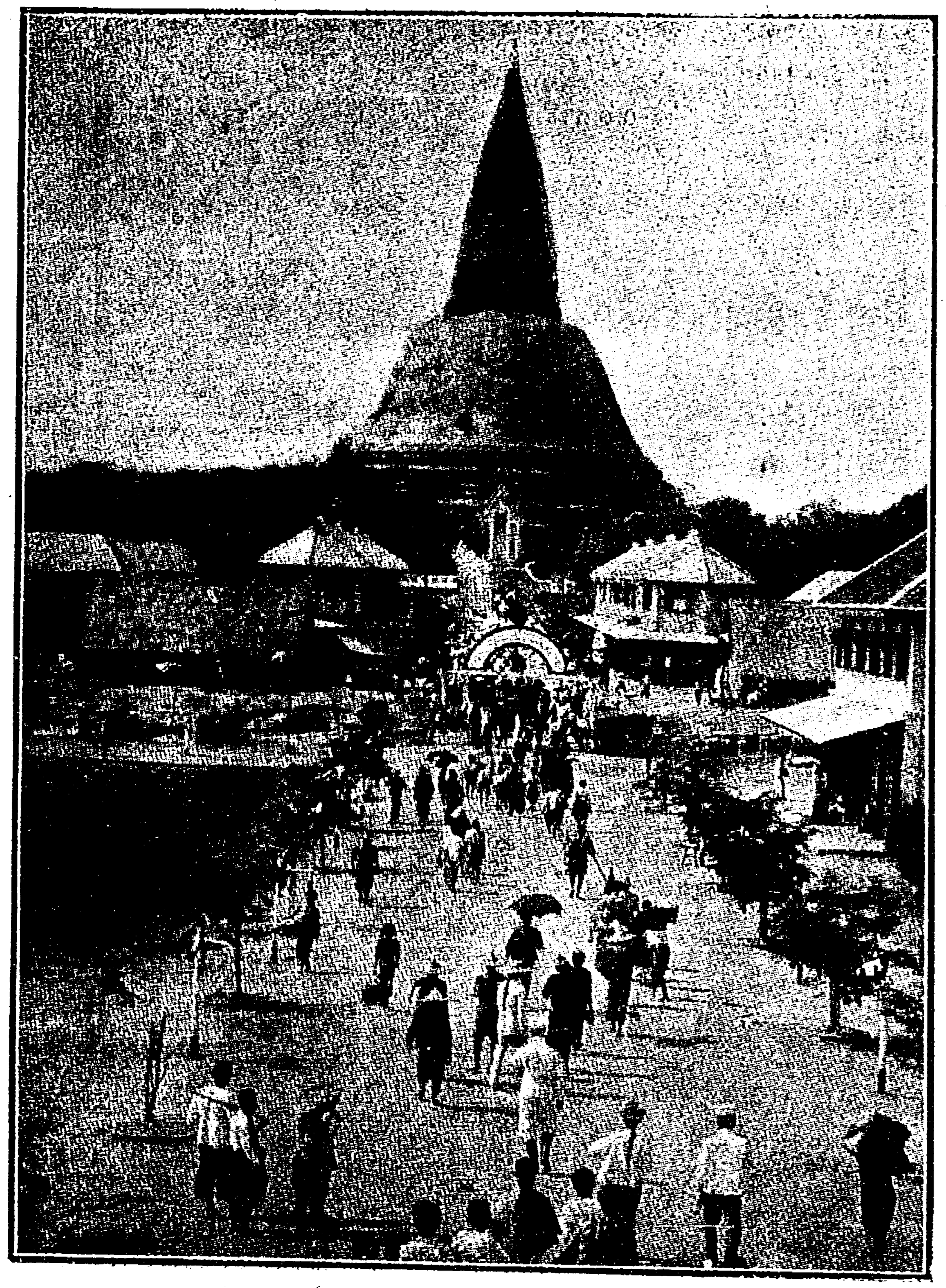

ফ্রাপাতুমের বৌদ্ধমন্দির। (রাজধানী ব্যাঙ্ককের উপকণ্ঠে মেনাম্ নদীর পশ্চিম কূলে ফ্রাপাতুম পল্লী। এ স্থানটা শ্যামভূমির একটা প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে সামরিক বিদ্যালয় ও কৃষিবিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে। ফ্রাপাতুমের বিরাট বৌদ্ধমন্দির একটা দেখ্‌বার জিনিস। সমগ্র শ্যামভূমিতে এতবড় মন্দির আর নেই।)

শ্যামবাসীরা ভারতবাসীর মতই তাম্বুল চর্ব্বণের একান্ত অনুরাগী। তবে আজকাল সিগারেটের ধূমপান করাটা তাদের মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত হওয়াতে পানের ব্যবহার অনেক ক'মে গেছে।

স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এরা কাপড় পরে। সাত হাত লম্বা, আড়াই হাত বহরের কাপড় ঠিক আমাদেরই মতন মাঝখানে কসি এঁটে পরে, কিন্তু 'কোঁচা' করে না, দুটো মুখই পায়ের মাঝখান দিয়ে টেনে পিছনে 'কাছার' মত এঁটে দেয়। অনেকটা ঢিলে 'মাল-কোঁচা-বাঁধা' গোছের কাপড় পরা এদের ছেলে মেয়ে দু'য়েরই। কাপড়কে এরা বলে "পানুঙ্"। এই শব্দটার সঙ্গে উড়িষ্যাবাসীদের

শ্যামের রমণী।

(এদের অদ্ভুত শির-শোভা একটা দ্রষ্টব্য পদার্থ।)

কাপড়ের জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দের খুব মিল আছে—সেটা হচ্ছে "নুঙা"! "নুঙা" কি তবে "পানুঙের" অপভ্রংশ না কি? হতেও পারে, আশ্চর্য্য কি? এই কাপড়গুলি সূতিরও হয়, রেশমীও হয়, রেশ্‌মী "পানুঙ্" পরতেই এরা খুব বেশী ভালবাসে। তাছাড়া "পানুঙ্" সূতিরই হোক আর রেশমীই হোক, রঙীন হওয়াই চাই। রঙীন পরবার এদের ভারী ঝোঁক! এক রকম কাপড় এরা প্রত্যহ পরে না। প্রতি সপ্তাহে সাতদিন সাতখানা

রাজপ্রাসাদের দ্বারে! (রাজকার্য্য শেষ হবার পর মহারাজ প্রাসাদে ফিরেছেন। খুব জমকাল ও মূল্যবান উজ্জ্বল পোষাক পরে রাজসভাসদগণ মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। স্বর্ণছত্রধারীরা, চামর ও ব্যজনকারেরা এবং ধ্বজ-পতাকাধারীরাও রাজার অনুসরণ করেছে। রাজঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের একটু প্রাচুর্য্য যেন প্রাচ্যের স্বভাবসিদ্ধ!)

সাত রকম রঙের কাপড় এরা পরে, তাও আবার প্রত্যেক-বারের বিশেষ রঙের সঙ্গে সেদিনের পানুঙের রঙ্ মেলা চাই,—যা তা রঙের পানুঙ্ যেদিন ইচ্ছা পরা চল্‌বে না!

কৃষক বা মজুর শ্রেণীর লোকেরা কাপড়ের সঙ্গে আর অন্য কিছুই পরে না। মেয়েরা কেবল স্তনদ্বয় আবৃত করবার জন্য বুকে একখানি নিচোল বাস বাঁধে। এই কুচ-বস্ত্রকে তারা "পা-হোম্" বলে। সম্ভ্রান্তবংশের ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা পানুঙের উপর পিরান পরে। আজকাল পিরাণের উপর আবার কোর্ত্তাও গায়ে দেয়। জুতো-মোজা পরে, টুপী মাথায় দেয়। আগে কিন্তু শুধু একখানি উত্তরীয় ব্যবহার ক'রতো। আজকাল উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর ও সামরিক বিভাগের সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলেই পানুঙের পরিবর্ত্তে 'পায়জামা' ব্যবহার ক'র্‌ছে। সম্ভ্রান্ত মহিলারা আগে পানুঙের উপর মাত্র একটা 'নীমা' প'রতেন; কিন্তু আজকাল একেবারে মেম সাহেবদের মত 'ব্লাউস্' 'জ্যাকেট্' 'শেমিজ' 'গাউন' পরছেন। জুতো মোজাও পায়ে দিচ্ছেন। শ্যাম-সুন্দরীদের অঙ্গ-শোভা এই য়ুরোপীয় বেশের অনুকরণে যে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এ কথা স্বীকার ক'রতেই হবে।

ঘুঁটী খেলা।

(শ্যামের অধিবাসীরা অত্যন্ত জুয়া খেল্‌তে ভালবাসে। এমন কি পথের ধারে ভাঙা মন্দিরের পাশে নুড়ি নিয়ে ঘুঁটি খেল্‌তে ব'সেও বাজী রেখে তারা জুয়া খেলে। এখন রাজ-আদেশে শ্যামদেশের জুয়ার আড্ডা সমস্ত তুলে দেওয়া হ'য়েছে। উৎসব বা পর্ব্ব উপলক্ষে বিশেষ অনুমতি ভিন্ন জুয়াখেলা নিষেধ।)

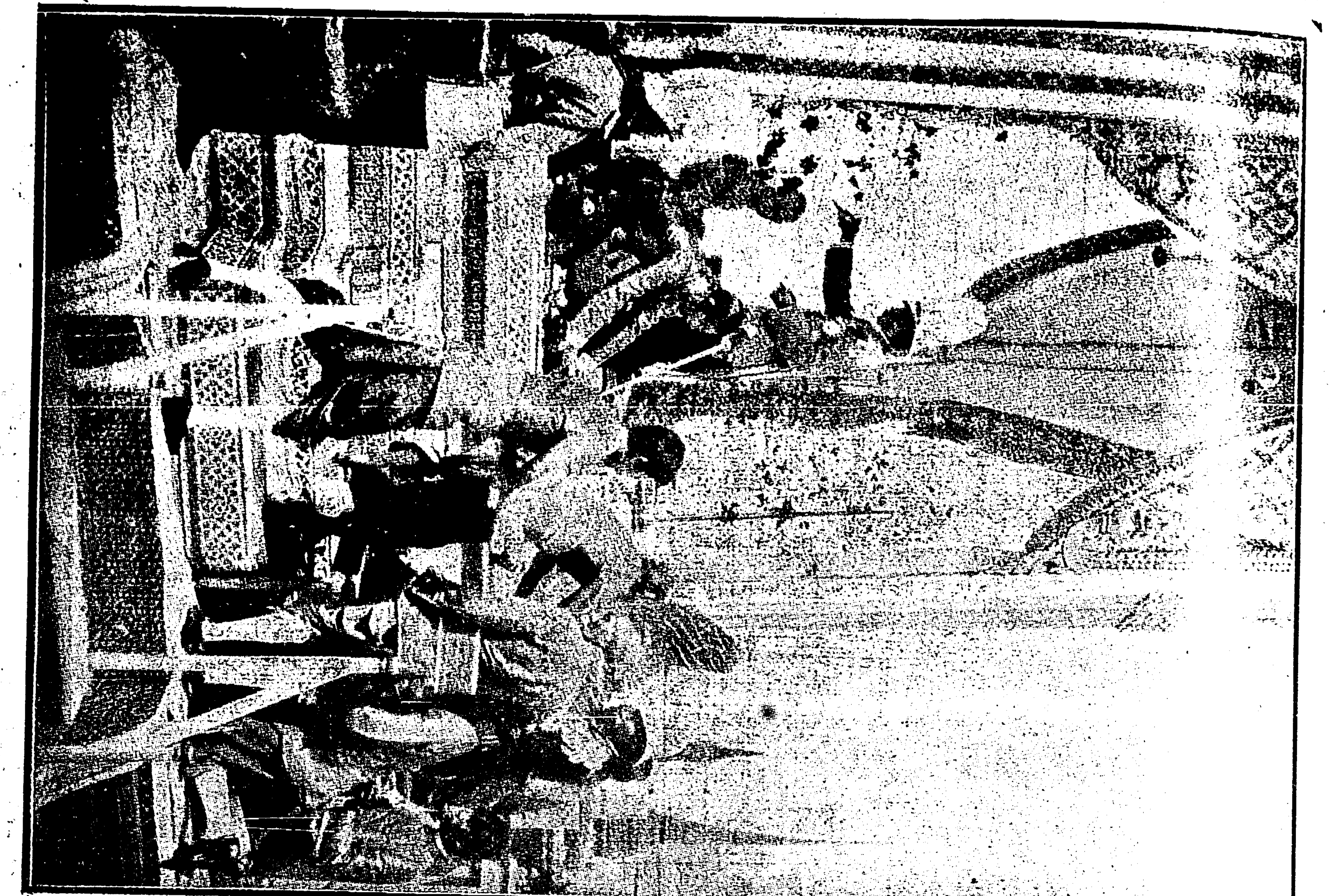

চূড়ামুণ্ডন। (সুসজ্জিত-বেদীর উপর সদ্য-মুণ্ডিত-চূড়া বালক উপবিষ্ট। পূর্ব্বাকাশে উষার কোলে তখন শিশু-সূর্য্য সবে মাত্র তার ঘুমভাঙা চোখ মেলে চারিদিকে দেখছে! শঙ্খ-পাত্রে শিশুর শিরে সপ্ত-তীর্থের বারি বর্ষণ করা হচ্ছে।)

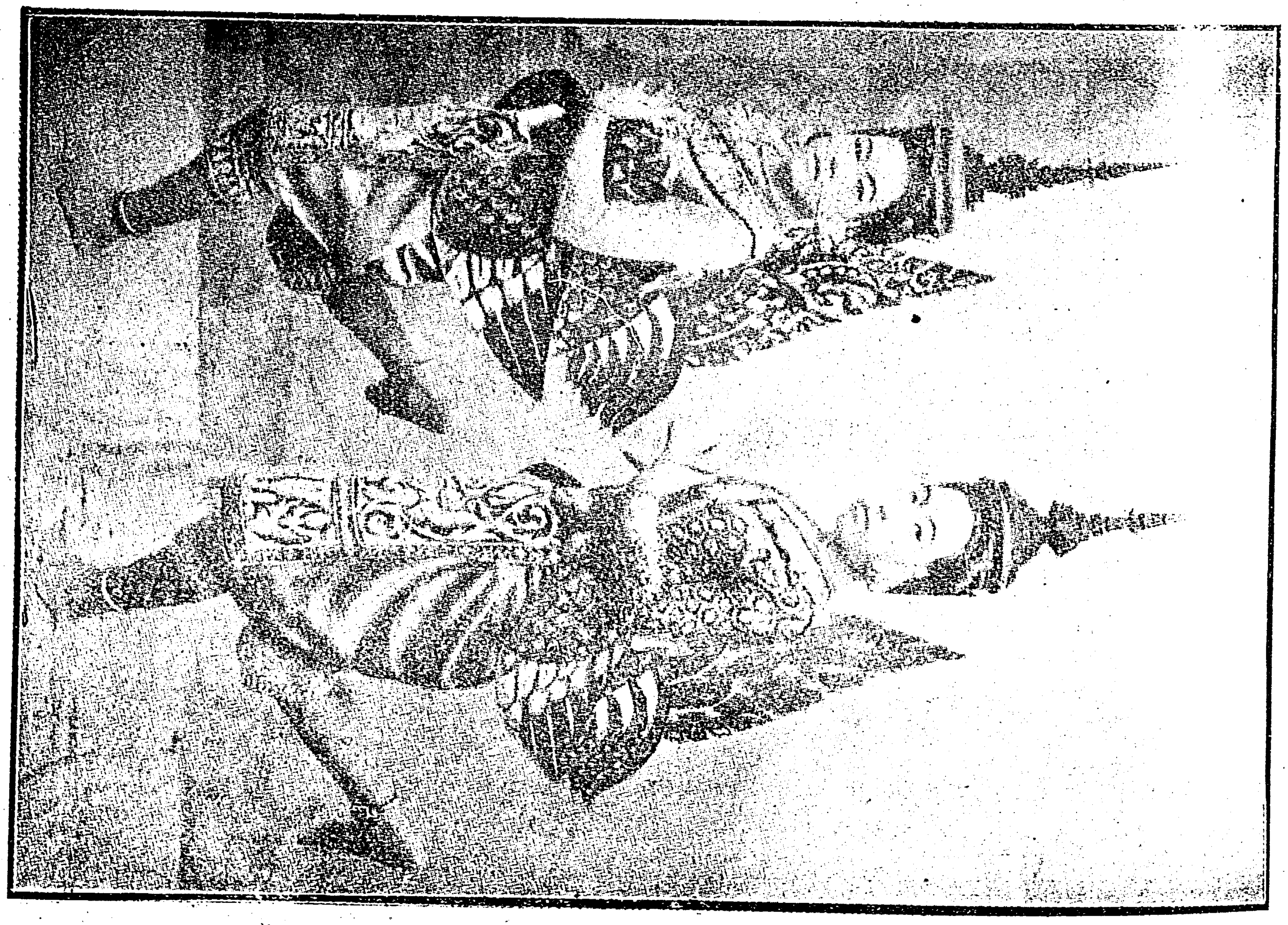

শ্যামের নর্ত্তকী। (নৃত্য গীত ও নাটকাভিনয়ের শ্যামবাসীরা একান্ত অনুরাগী। এদের প্রত্যেক নাচটির মধ্যে একটি সুসঙ্গত অর্থ ও গভীর ভাব থাকে। প্রেমিকা প্রণয়িনীর নাচ, বিজয়িনী জেতার নাচ, গর্ব্বিতা অভিমানিনীর নাচ এসব তারা একা একা নাচে, এবং দলবদ্ধ হয়ে নাচে সৈনিকদের যুদ্ধ যাত্রা, অজ্ঞাতকুলশীল প্রণয়ীর জন্য রাজকুমারীর কুলত্যাগ, অপ্সরীদের স্বর্গ ভ্রমণ ইত্যাদি। চিত্রে এই শেষোক্ত নাচটিরই ভঙ্গী দেখান হয়েছে।)

কামু বালকদ্বয়।

গৃহস্থের ছেলেদের শৈশবটা প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই কেটে যায়, নেহাৎ কোনও পালা পার্ব্বণ বা উৎসব উপলক্ষ ছাড়া তাদের অঙ্গে আর বস্ত্র ওঠে না। শিশুদের মস্তক মুণ্ডন ক'রে রাখা হয়। কেবল মাথার মাঝখানে শিখার মত একগুচ্ছ চুল থাকে। ছেলেমেয়েরা ছোট বেলায় উলঙ্গ থাকে বটে, কিন্তু নিরাভরণ থাকে না। শ্যাম-সুন্দরীরা নিজেরাও যেমন নানা কারুকার্য্য-খচিত অলঙ্কার পরে, তেমনি শিশু পুত্র কন্যাদেরও অলঙ্কার পরাতে ভালবাসে।

এদের মধ্যে আভিজাত্য-গর্ব্বটা খুব বেশী পরিমাণেই ছিল, কিন্তু আজকাল সেটা খুব দ্রুত অন্তর্হিত হ'চ্ছে। বয়োবৃদ্ধকে শ্রদ্ধা করা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানো এদের মধ্যে একটা চিরাচরিত প্রথা। আবার হীনাবস্থার লোককে অথবা জ্ঞানে, গুণে, খর্ব্ব ব্যক্তিদের তাচ্ছিল্য করাটাও ঠিক আমাদেরই মত এদেরও একদিন একেবারে মজ্জাগত দোষ ছিল। কিন্তু অধুনা এদের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বিস্তার লাভ করায় ক্রমে সেটা লোপ পাচ্ছে।

সমান অবস্থার লোকের সঙ্গে এরা প্রাণ খুলে মেলা মেশা করে; বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন ক'রতে চায়। এরা বড় শান্তি-প্রিয়, অতিথি-বৎসল, উদার, দয়ার্দ্র হৃদয় ও সরল-চিত্ত লোক। এদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ। ছেলেমেয়েদের এরা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে এবং অতিরিক্ত আদর-যত্ন করে। এরা বড় ভাব-প্রবণ জাতি। এদের জাতীয়

সীয়াও বালিকা।

চরিত্র অতি সহজেই সৎ বা মন্দ প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে পড়তে পারে। আরও একটা দোষ এই যে এরা বড় মানের কাঙাল!

ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে শ্যামবাসীর মোটেই মতিগতি নেই, এবং এ কাজ তারা পারেও না; সুতরাং, শ্যামভূমির বাণিজ্য-সম্ভার সে দেশের শ্রীমন্ত বা চাঁদ সওদাগরের হাতে না থেকে সমস্তটাই বিদেশী বণিকদের করতলগত হ'য়েছে।

সে দেশের চাষারাও অল্পে সন্তুষ্ট। বেশী কিছু তারা আকাঙ্ক্ষা করে না। বৎসরে তিন চার মাস মাত্র খেটে সম্বৎসরের ধান চাল উৎপন্ন ক'রে নিয়ে ব'সে থাকে। নাগরিকরা পল্লীবাসীদের চেয়ে একটু বিলাসী বলে তাদের অভাব কিছু আছে বটে, কিন্তু সে অতি সামান্য; সেটা তারা ছোটখাটো হাল্কা কাজ কিছু ক'রে উপার্জ্জনের দ্বারা দূর করে। তবে এ কথা ঠিক যে যত কম খেটে সে রোজগারটুকু করা যায়, সেই দিকেই এদের বেশী ঝোঁক।

চাষাদের বাড়ীগুলি অধিকাংশই কাঠের তৈরি। প্রায় নদীর ধারটি ঘেঁসে এরা সব নিজেদের কুটীর নির্ম্মাণ করে। অধিকাংশ কুটীরই বাঁশ, দরমা, বাঁখারি ও চিয়াড়ি এবং কাঠ-কাঠ্‌রায় তৈরি হয়। আজকাল করোগেট-টিনের বাড়ীও প্রচুর হ'চ্ছে।

ব্যাঙ্কক্ সহর আজকাল একেবারে বিলিতি সহরের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ সমস্ত, বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ী, বিচারালয়, কোষাগার, দপ্তর খানা, খাঁজাঞ্চিখানা ইত্যাদি সব রাজকীয় কর্ম্ম-মন্দির, ক্লাব বা আড্ডাবাড়া, ব্যবসায়ীদের হাউস বা বাণিজ্য-গৃহ, বৈদেশিক রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের আবাস প্রভৃতিতে সে নগর আজ একেবারে সৌধকিরীটিনী হয়ে উঠেছে! রাজপথে বৈদ্যুতিক ট্রাম চল্‌ছে, বৈদ্যুতিক দীপ জলছে। নদীর ধারে বন্দর, ডক, কলকারখানা, গুদাম প্রভৃতিতে একটা দিক যেমন একেবারে যাচ্ছেতাই বিশ্রী হয়ে উঠেছে, নদীর অপর দিক তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছোট ছোট কুটীরে ঘেরা, মাঝে মাঝে বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারের বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত সৌধ-চূড়া নদীর সে তীরকে ছবির মত সুন্দর করে তুলেছে! নদীর জলে নৌকার উপর "বজ্‌রা বাটী" নির্ম্মাণ ক'রে সেখানে অনেকেই জলচরের মত জলে বাস ক'রছে।

শ্যামভূমির পার্ব্বত্য অধিবাসী।
(এদের বলে "কামু"। এরা পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করে। গভীর জঙ্গল থেকে কাঠের গুঁড়ি কেটে আনবার জন্য কাঠ ব্যবসায়ীরা এদের নিযুক্ত করে।)

রঙ্গমঞ্চের উপর নৃত্য।
(এটি গীতি নাট্যাভিনয়ের একটি দৃশ্য, অসুর ও অপ্সরীর নৃত্য গীত হ'চ্ছে।)

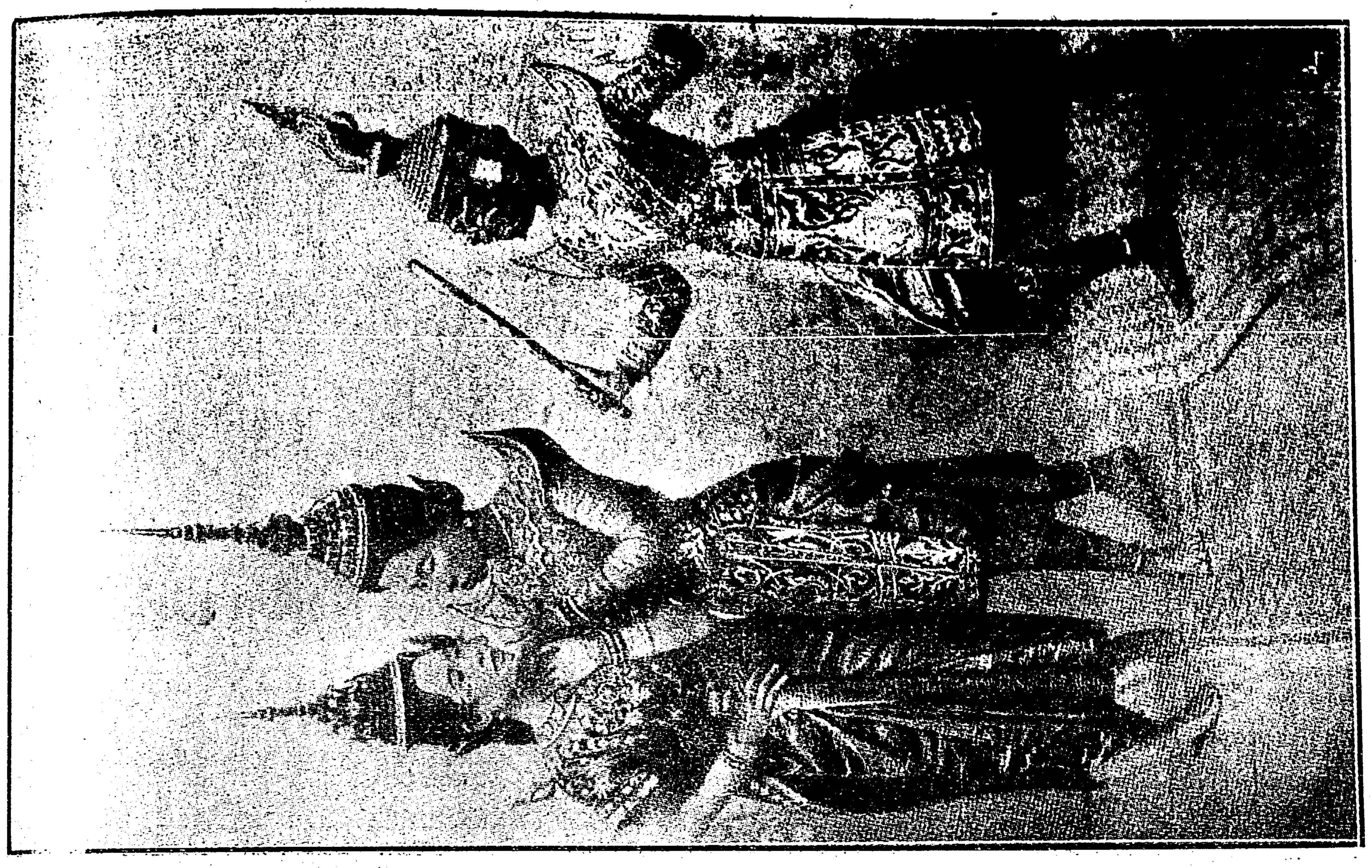

নাটকাভিনয়ের একটি দৃশ্য।
(রাজপুত্র রাজকন্যার সঙ্গে গোপনে মিলিত হ'য়ে প্রেমালাপ ক'রছিলেন, এমন সময় রাজকুমারীর রক্ষক দৈত্য জান্‌তে পেরে রাজপুত্রকে মারতে আসছে।)

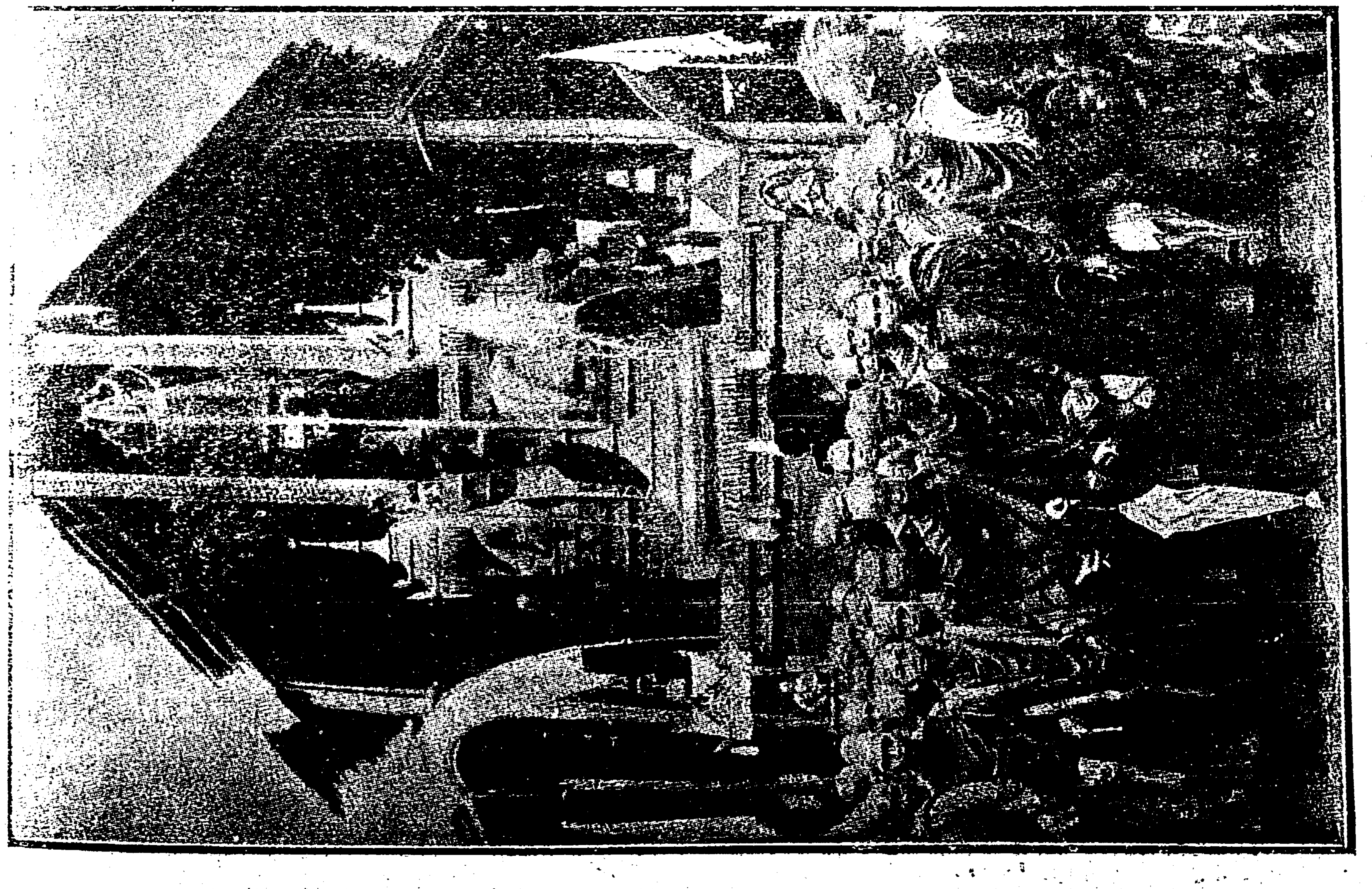

বৌদ্ধ মঠ ও ভিক্ষুর দল।
(মঠকে শ্যামবাসীরা বলে "বট"। ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হয়ে একএকটি মঠে বাস করে। সাধারণের অযাচিত দানের উপরই এদের জীবিকা নির্ভর করে।)

জলের উপরের এই সুদৃশ্য সুন্দর বজরা বাড়ীগুলি ব্যাঙ্কক সহরের একটা প্রধান বিশেষত্ব!

'সহস্র তটিনী সেবিত' শ্যামভূমির অধিবাসীরা সকলেই একেবারে সাক্ষাৎ বরুণের অনুচর! জলকে তারা জল বলেই গ্রাহ্য করে না। পূর্ব্বেই বলেছি, জলের উপর তৈরি 'ভাসা-ঘরে' তারা বেশীর ভাগ বাস করে। তাছাড়া, যাতায়াতের জন্য রাজপথ থাকতেও তারা নদীপথে চলাচল কর'তেই ভালবাসে। তাদের ছোট ছোট কচি ছেলেরা অনেক সময় হাঁটতে শেখবার আগেই সাঁতার কাটতে শেখে! অধিক কথা কি, তাদের হাট-বাজারও বসে জলের উপর একেবারে নদীর বুকে! মেয়েরা সবাই নৌকা চড়ে হাট করতে যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা নৌকো চড়ে ভিক্ষা সাধে। ফেরিওয়ালারা নৌকা নিয়ে তাদের সওদা ফেরি করে বেড়ায়। শ্যামভূমিকে অনেকটা ভিনিসের ভাই বলা চলে। রেলগাড়ীর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দেশের বারো আনা মাল নৌকাযোগেই আমদানী রপ্তানী হয়।

ব্যাঙ্কক-মেখলা "মেনাম' নদী এখন একাধিক ষ্টীমার ও মোটর লাঞ্চের যাতায়াতে একেবারে ধূমাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

গৃহকর্ত্রী ও তাঁর বালক ভৃত্য

(ইনি একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পত্নী এবং 'মোন' বংশীয় ক[illegible]। স্বামীর গৃহ প্রত্যাগমন সময় উপস্থিত জেনে তাঁকে আদর অ[illegible] করবার জন্য দ্বার দেশে সপরিচারক অপেক্ষা করছেন। 'মো[illegible]' বংশ হ'চ্ছে মিশ্র বা সঙ্কর জাত। ব্রহ্মের বন্দী পেগুয়ানরা শ্যামের সঙ্গে মিশে 'মোন' জাতের উদ্ভব হয়েছে।)

যত বড় লোক, ধনী ব্যবসাদার এবং উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তারা আর নৌকা চড়ে না, সবই "মোটর লাঞ্চ" ব্যবহার করে। তাছাড়া, সাধারণ যাত্রীদের জন্য বড় বড় ফেরি ষ্টীমার দিনরাত নদীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াত ক'রছে!

ছোট ছেলের জন্ম থেকে পাঠাভ্যাস কাল পর্য্যন্ত শ্যামভূমির বিধি ব্যবস্থা ও নিয়ম কানুন একেবারে হুবহু ভারতবর্ষের ব্যবস্থার সঙ্গে মিলে যায়। সেই একটি মন্ত্রপূত বিশেষ সূতিকা-গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, ধাত্রী এসে প্রসূতিকে সাহায্য করবে। আগুনের তাপ সেঁকে প্রসূতিকে সুস্থ করে তোলবার চেষ্টা তাদের আমাদের চেয়ে একটুকুও কম নয়। যথা সময়ে আচার্য্য এসে শিশুর কোষ্ঠিপত্র প্রণয়ন ও নামকরণ ক'রে দিয়ে যায়। দুবৎসর বয়সে শিশুর স্তন্যপান বন্ধ হয়ে যায় এবং তার অন্ন-পানের ব্যবস্থা হয়। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু উলঙ্গ অবস্থায় সকলের আদর ও স্নেহের মধ্যে লালিত হয়। তার পরে তাকে বস্ত্রদান করা হয় ও তার হাতে খড়ি হয়।

শিক্ষাটা শ্যাম দেশের সম্রাট সকল শিশুর পক্ষে বাধ্যতা মূলক ক'রে দেওয়ায়, আজকাল চাষার ছেলেকেও অন্ততঃ পনেরো ষোল বৎসর পর্য্যন্ত গ্রামের ইস্কুলে বা বৌদ্ধ মঠে বিদ্যা শিক্ষা করতে যেতে হয়। কিন্তু সহরের

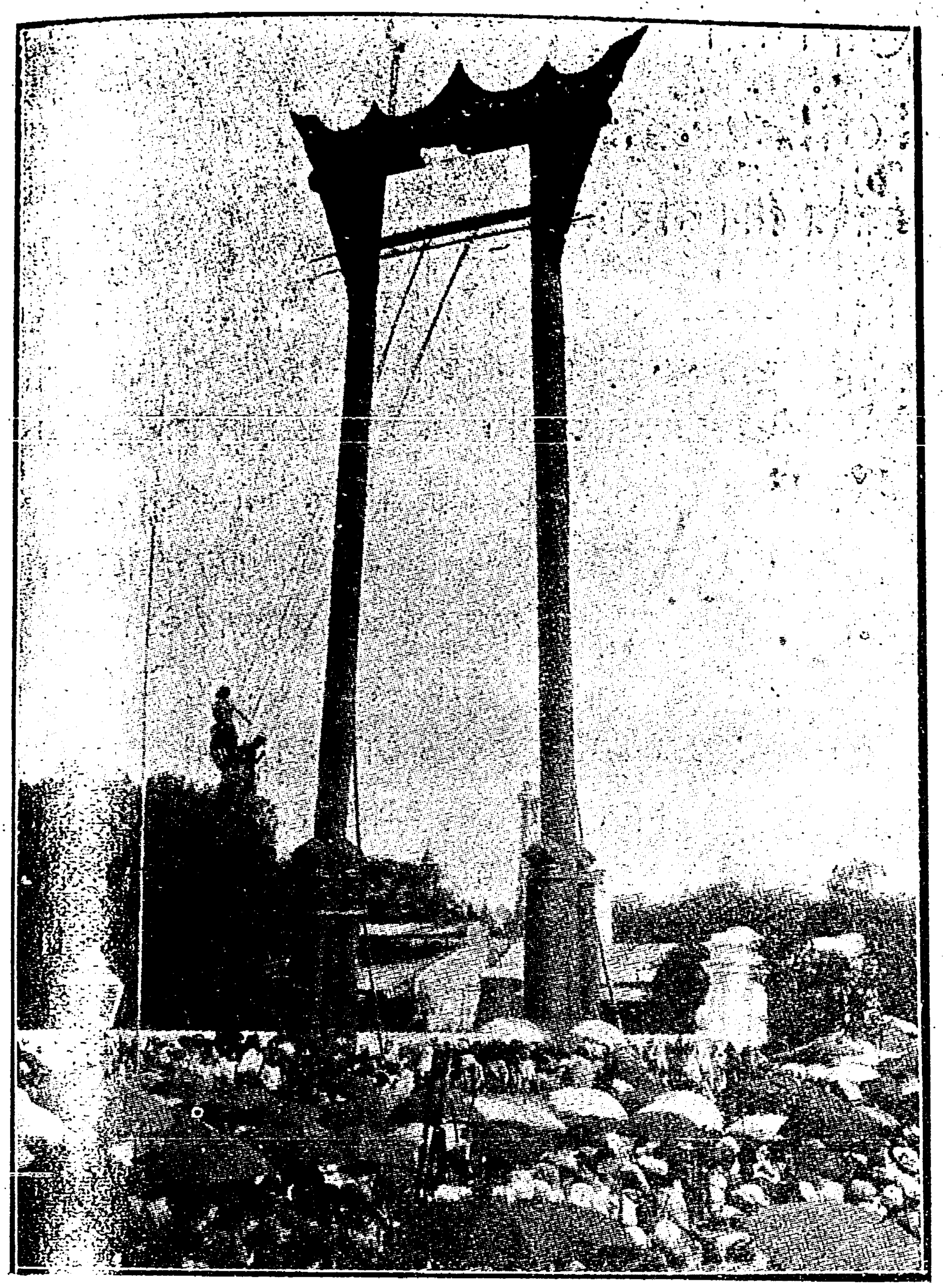

দোল পর্ব্ব।

(এই [illegible]র্ব্বের সময় স্থানে স্থানে দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ ক'রে শ্যামবাসীরা দোলনায় উঠে দোলে। দোলমঞ্চটির উচ্চতা প্রায় একশ ফুট। মঞ্চের কিছু দূরে একটী বাঁশের ডগা[illegible] একটা টাকার থলে বেঁধে বাঁশটি পুঁতে রাখা হয়। দোলনায় দুল্‌তে দুল্‌তে যে [illegible]তার দাঁতে করে থলেটি বাঁশ থেকে খুলে নিতে পারে, টাকাগুলি সে পুরস্কার পা[illegible]। এই খেলা দেখবার জন্য হাজার হাজার লোক দোলমঞ্চের নিকটে সমবেত হয়।)

ছেলেরা যারা চাষ বাস করবে না, তাদের আরও পাঁচ ছয় বৎসর উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য থাকতে হয়।

বালিকা বিদ্যালয় এখন শ্যাম দেশে নানা স্থানে হ'য়েছে বটে, কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনটা সে দেশে এই সবে সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে।

"চূড়া-মুণ্ডন" সে দেশের একটা মস্ত বড় প্রথা। দশ থেকে বারো বৎসরের মধ্যে সেই যে শিশুর মাথায় শিখার মত একগুচ্ছ চুল রাখা হ'তো, সেটিও মুণ্ডন করে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে সেখানকার রাজা-রাজড়া ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব ধুমধাম হয়। নাচ-তামাসা, ভূরি ভোজ ইত্যাদি বিবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। আর একটা ব্যাপারও তাদের মধ্যে খুব ঘটা করে সুসম্পন্ন হয়, সেটা হ'চ্ছে "শাক্যসিংহের সন্ন্যাস!" বৌদ্ধ ধর্ম্মানুশাসন মতে প্রত্যেক বৌদ্ধকে জীবনে একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করতেই হয়, তা' সে তিন দিনের জন্যই হোক্ বা তিন মাসের জন্যই হোক অথবা বরাবরের জন্যই হোক্। এই সন্ন্যাস উৎসবে সেখানকার ধনীরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। বহুমূল্য বেশভূষা, রত্ন-আভরণ, জীবনের নানা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস লালসা সেদিন

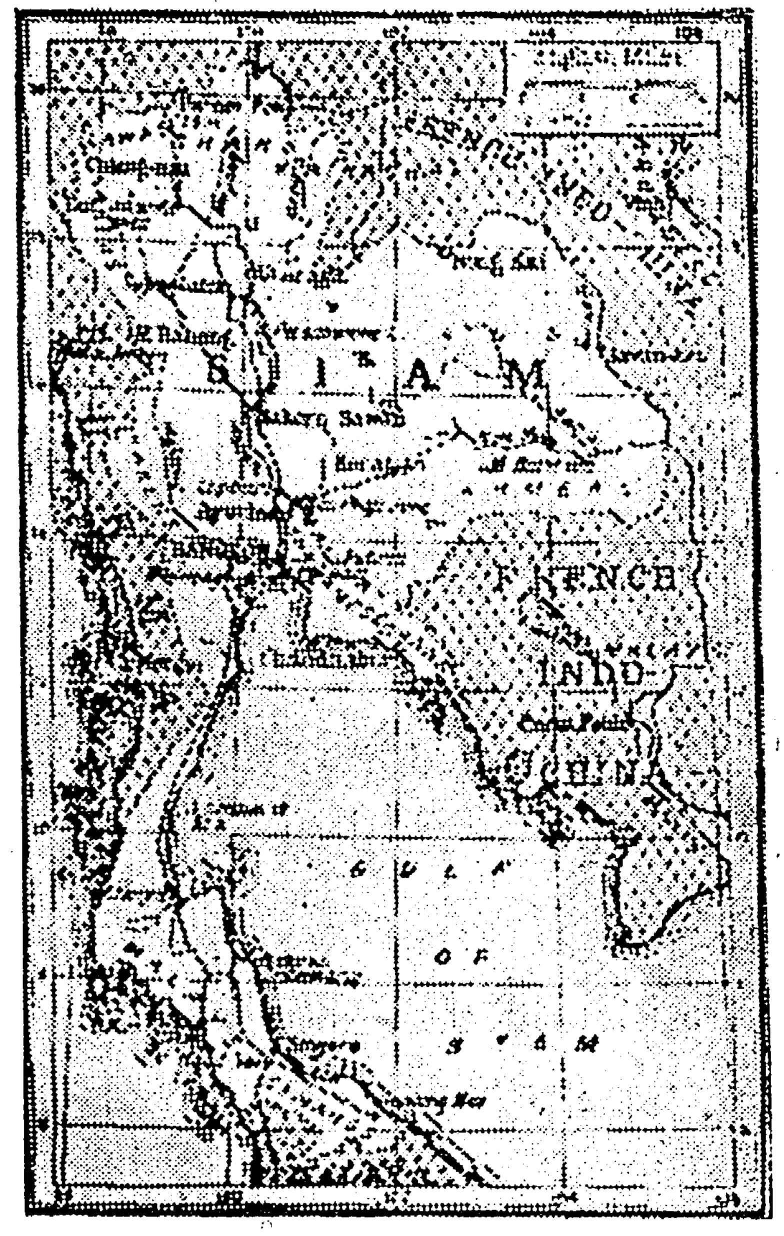

শ্যামভূমির মান চিত্র।

পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করবার আয়োজন করে দেওয়া হয়, কেন না এই সমস্ত প্রলোভন তুচ্ছ করে উৎসবের পাত্রকে সেদিন প্রভু বুদ্ধের মতই সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তে হবে।

শ্যাম-সুন্দরীরা কেউ যৌবনে পদার্পণ না ক'রলে বিবাহ করেন না। সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়, সে দেশের ছেলেদের উনিশ কুড়ি বছর বয়সে এবং মেয়েদের পনেরো ষোলো বছর বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহ-প্রথা হ'চ্ছে চুক্তিপত্র সই করেই। তবে তার সঙ্গে একটা ধর্ম্মগত আচারের অনুষ্ঠান এবং পাত্র পাত্রীর আর্থিক অবস্থার অনুরূপ পান ভোজন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও হ'য়ে থাকে। কন্যার গৃহে পাত্র শুভাগমন ক'রে কন্যার পাণিগ্রহণ করে। বিবাহ সম্বন্ধ পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকেরাই প্রায় স্থির করে। অনেক সময় পাত্র পাত্রী পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েও বিবাহ করে। বহু বিবাহ তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সেটাতে কেবলমাত্র পুরুষেরই অধিকার।

গুরুগিরী

(চিত্র)

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে রামদয়ালের সঙ্গে আমার পরিচয়,—স্বধু পরিচয় নয়—বন্ধুত্ব। এই সুদীর্ঘ কালেও সে বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন হয় নাই।

আমরা দুইজন একই মেসে থেকে, একই কলেজে, এক সঙ্গে চার বৎসর পড়েছিলাম। আমার বাড়ী পূর্ব্ব-বঙ্গে বিক্রমপুরে, রামদয়ালের বাড়ী পশ্চিম-বঙ্গে বাঁকুড়া জেলায়। সে ছিল বড়-মানুষ, জমিদারের একমাত্র পুত্র—দেড়লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। আর আমি ছিলাম ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের একমাত্র ছেলে; আমার বাবা বেতন পেতেন ৮০ টাকা। এই বড়মানুষ জমিদারের ছেলে আর গরিব স্কুল-মাষ্টারের ছেলের মধ্যে সখ্যতা বড় বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমাদের এই বন্ধুত্বের একটা কারণ ছিল।

রামদয়াল ছিল গোঁড়া হিন্দু। এটা যে কি করে হোলো, তা এক কথায় বল্‌তে পারা যায় না। তার বাপ কৃষ্ণদয়াল ঘোষ মহাশয়ের তেমন গোঁড়ামি ছিল না, তার মাও যে আচার-নিয়মের খুব পক্ষপাতিনী ছিলেন, তাও নয়; অথচ গ্রামের স্কুলে যখন পড়ে, তখন হইতেই রামদয়ালের পূজা-আহ্নিকের দিকে ঝোঁক হয়। তার পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে যখন কলিকাতায় পড়তে এল, তখন কলেজের বাতাস লেগে কোথায় তার গোঁড়ামি দূর হয়ে যাবে, পূজা-আহ্নিক, জপ-তপ উড়ে যাবে, তা না হয়ে তার ঐ সব যেন আরও বেড়ে গেল। আমাদের মেসে সে ছোট একটী ঘর একেলার জন্য নিয়েছিল। সে ঘরে সে আর কাউকে প্রবেশ করতে দিত না; কারণ, সেখানে তার পূজার আসন থাকত। রোজ ভোরে উঠে, সকলের আগে সে স্নান করত। রবিবারে কালীঘাট কি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া তার একেবারে বাঁধা নিয়ম ছিল। অন্য দিন ভোরে স্নান করেই সে তার ঘরে দুয়ার বন্ধ করে জপ-তপ করত। ঘণ্টাখানেক পরে তবে দুয়ার খুলত; তার পর পড়াশুনা করত। আবার সন্ধ্যার সময় দুয়ার বন্ধ করে সেই জপ-তপ। আমাদের মেসের সকলেই তাকে 'আচার্য্য দেব' ব'লে ঠাট্টা করত; আমিই সে দলে মিশতাম না। রামদয়ালের এই ধর্ম্মনিষ্ঠা, এই আচারপরায়ণতা আমার বড় ভাল লাগত। এই কারণেই তার সঙ্গে আমার সখ্যতা হয়েছিল। তার অনুরোধে যদিও আমি জপ-তপ আরম্ভ করি নাই, এখনও সে সকল বালাই আমার নেই, তবুও আমি তাকে বড়ই শ্রদ্ধা করতাম। সে আমাকে শ্রদ্ধা করত; আমার সঙ্গেই বেশী মিশতো। এই শ্রদ্ধাই আমাদের দুজনকে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেই জন্যই আমরা যে চারি বৎসর কলিকাতায় ছিলাম, একই মেসে কাটিয়েছি। এক সঙ্গে একই বছরে এফ-এ পরীক্ষা দিই; দুইজনই প্রথম বিভাগে পাশ হই। তার পর দুইজনই প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়ি, এক সঙ্গেই বি-এ পাশ করি। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে বি-এ পাশের আগেই একই কারণে দুইজনে পড়া ত্যাগ করি। একই মাসে রামদয়ালের আর আমার পিতৃ-বিয়োগ হয়; রামদয়াল জমিদারীর তত্ত্বাবধানের জন্য পড়া ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়; আর আমি সংসারে একেবারে অনাথ ও নিঃসম্বল হয়ে পড়া ছাড়ি। বাবা যা বেতন পেতেন, তাতে তাঁর নিজের খরচ, আমার পড়ার খরচ দিয়ে তিনি কিছুই বাঁচাতে পারতেন না; সে ইচ্ছাও তাঁর ছিল না, কারণ, এ সংসারে আমি ছাড়া তাঁর আর কোন বন্ধনই ছিল না। আমি যেবার প্রবেশিকা দিই, সেইবারই আমার মা মারা যান। বাবা তার পর এই চার বছর এক রকম উদাসীন ভাবেই কাটিয়েছেন। যখন তখনই বল্‌তেন, সুশীল, তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে বে-থা দিয়ে গৃহস্থালী পেতে দিতে পারলেই আমার ছুটী। সেই ছুটীই তিনি নিলেন, কিন্তু কোন সাধই তাঁর পূর্ণ হোলো না!

ওদিকে রামদয়াল যখন এল-এ পাশ করে, তখনই তার বাপ-মা তার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নিজেরা যখন চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হলেন, তখন আমাকে তার মত লওয়াতে অনুরোধ করেন। আমি কিছুতেই তাকে বিয়ে করতে রাজী করাতে পারি নাই। তার একই কথা,—সে সন্ন্যাস অবলম্বন করবে, সংসারে তার আসক্তি নেই। শেষে কিন্তু ঘটনা একেবারে উল্‌টে গেল; রামদয়ালকে দেশে গিয়েই কিছুদিন পরে বিয়ে করতে হোলো; আর বাবা যে আমাকে গৃহস্থালীতে স্থিতি করতে চেয়েছিলেন, আর আমারও তাতে কোনই আপত্তি ছিল না, আমিই হলাম গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী। বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই,—আমি কেন বিয়ে করে জঞ্জাল বাড়াতে যাব। আমি কল্‌কাতায় একটা মাষ্টারী জুটিয়ে নিলাম। যা পাই, তাতে একলা মানুষ রাজার হালে থাকি। ছুটি হ'লে কখনও বা এখানে সেখানে বেড়াতে যাই, কখনও বা রামদয়ালদের বাড়ী গিয়ে হাঁফ ছাড়ি। তার মায়ের স্নেহে, তার স্ত্রীর আদরে আমার ছুটির দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে যায়।

আর একটা কথা বল্‌লেই আসল ব্যাপারের ভূমিকাটা শেষ হয়। রামদয়াল দেশে গিয়ে জমিদার হয়ে বসল, বিয়েও করল, একটি ছেলেও হোলো, কিন্তু তার জপ-তপ তাকে ছাড়ল না,—ছাড়ল ত না-ই, বরঞ্চ বাড়ল। সে এক গুরু পেয়েছে, তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছে; সুতরাং তার জপ-তপ আরও বেড়ে গিয়েছে; সে রাজর্ষি জনকের একটা ছোট-খাটো সংস্করণ হয়ে বসেছে। তার এই গুরুর নাম বিপুলানন্দ স্বামী। আমি তাঁকে রামদয়ালের বাড়ী দু-তিনবার দেখেছি, কিন্তু তাঁর কাছে ঘেঁসতে সাহস হয় নাই। তিনি যখন রামদয়ালের গৃহে অধিষ্ঠিত হতেন, আমি তখন স্থান ত্যাগ ছাড়া অন্য সুগম পন্থা পেতাম না। তাঁর নামটী কিন্তু ঠিক হয়েছিল, ঘৃত-ছানা-মিষ্টান্ন-পুষ্ট দেহখানি যে 'বিপুল', সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। আর রামদয়ালের মত শাঁসালো শিষ্য লাভে যে তাঁর 'আনন্দ'ও বিপুল, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। রামদয়াল বলে যে, তার গুরুদেব মহা পণ্ডিত, পরম যোগী। আমি কিন্তু একদিনমাত্র তাঁর সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি দম্ভে অদ্বিতীয়। তাই আমি তাঁকে দূর থেকে অভিবাদন করেই প্রস্থান করতাম। রামদয়ালের কিন্তু তাঁর উপর প্রগাঢ় ভক্তি। সে তার গুরুকে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত।

এইবার আসল কথাটা বলি। আমাদের কলেজ ছাড়বার পর সাত বছর কেটে গেছে। যে সময়ের কথা এখন বল্‌ছি, সে এই বছর-দুই-তিন আগের পূজার সময়ের ঘটনা।

সেবার আমার শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, তাই পূজার ছুটীতে কোথাও যাব না বলে স্থির করে কলিকাতাতেই অবস্থান করছিলাম। নবমী পূজার দিন অপরাহ্নে রামদয়ালের ম্যানেজার বাবুর এক টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে লেখা আছে, রামদয়ালের ছেলেটির অসুখ, অবস্থা খুব খারাপ; রামদয়ালের স্ত্রী আমাকে অবিলম্বে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। ছেলের অসুখ, সে সংবাদ রামদয়াল পূর্ব্বে আমাকে জানায় নাই। তাহার পর যখন বড়ই বাড়াবাড়ি হয়েছে, তখনও সে আমাকে টেলিগ্রাম করে নাই। তারে সংবাদ দিলেন তার ম্যানেজার; আবার তিনি রামদয়ালের স্ত্রীর অনুরোধে তার করেছেন। এর কারণ কি? এ রকম ত কখনও হয় না। যাক্ সে কথা—বসে-বসে ভাববার তখন সময় ছিল না। আমি বাঁকুড়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সন্ধ্যার পরের ট্রেনেই যাত্রা করলাম। সারারাত আর ঘুমাতে পারলাম না, স্বধু রামদয়ালের ছেলের কথা ভাবতে ভাবতেই নবমীর রাত্রি আমার অনিদ্রায় কেটে গেল। পরদিন বিজয়ার দিন পূর্ব্বাহ্নে বাঁকুড়া ষ্টেসনে গিয়ে নামলাম।

ষ্টেসন থেকে রামদয়ালের বাড়ী সাত মাইল দূরে। বাহিরে গিয়ে দেখি, পাল্কী বা লোকজন কেহই আমাকে নিয়ে যেতে আসে নাই। অন্য সময় দেখেছি, ষ্টেসনে গো-যান অনেক থাকে, পাল্কীও পাওয়া যায়। কিন্তু সে দিন একখানি গাড়ী কি একটা পাল্কী কিছুই ষ্টেসনে উপস্থিত নেই। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, সেদিন বিজয়া দশমী; গাড়োয়ান কি পাল্কী বেহারা কেহই সেদিন ভাড়া খাট্‌বে না; তারা সেদিন মেলা দেখে, তাড়ি খেয়ে, নেচে-গেয়ে, আমোদ-আনন্দ করে কাটাবে।

তখন কি করি, পদব্রজেই রওনা হলাম। সাত মাইল পথ ত বড় বেশী নয়, আর রাস্তাও ভাল; সঙ্গেও জিনিসপত্র কিছুই নেই।

যখনি রামদয়ালদের বাড়ীতে পৌছিলাম, তখন বেলা বারটা বেজে গিয়েছে। যে বাড়ীতে পূজার সময়, বিশেষতঃ বিজয়ার দিন পূজামণ্ডপ লোকারণ্য থাকত, সে দিন দেখি, সে স্থান প্রায় জনশূন্য, অল্প কয়েকজন লোক বিষণ্ণ মুখে বসে আছে; দুই চারিজন নীরবে এদিক-ওদিক ঘুরছে। বাদ্যকরেরা বাদ্যযন্ত্র সুমুখে নিয়ে মলিন মুখে বসে আছে। প্রতিমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, আমার আশঙ্কা উদ্বেগের চিহ্ন যেন মায়ের মুখেও রয়েছে।

আমি সেখানে আর বিলম্ব না করে বাড়ীর ভিতর চলে গেলাম। দ্বিতলের যে ঘরে রামদয়াল শয়ন করে, সেই ঘরে গিয়ে দেখি, মেজেয় একটা বিছানায় রামদয়ালের ছেলে শুয়ে আছে; পার্শ্বেই পৃথক একটা আসনে স্বামী বিপুলানন্দ বসে আছেন; তাঁর সুমুখেই বসে আছেন স্বামীজির আট-দশ জন গৈরিক-পরিহিত, হৃষ্টপুষ্ট-দেহ চেলা। রামদয়াল ছেলের মাথার কাছে বসে আছে।

আমি ছেলের বিছানায় গিয়ে বসেই তার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম—এ যে অন্তিম অবস্থা!

তখন রামদয়ালকে জিজ্ঞাসা করলাম, খোকার এ রকম অবস্থা কখন থেকে হয়েছে?

রামদয়াল বল্‌ল, কা'ল থেকে এই একই ভাবে আছে। স্বামীজি বল্‌ছেন কোন ভয়েব কারণ নেই।

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে বল্‌লাম, কি বল্‌ছ তুমি, ভয়ের কারণ নেই! আমি ত দেখ্‌ছি, সব শেষ হ'তে আর দেরী নেই।

স্বামীজি আমার দিকে তাঁর রক্তচক্ষু ফিরিয়ে বল্‌লেন, কি বাজে বক্‌ছ। দেখ না আমি কি করি।

আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে রামদয়ালকে বল্‌লাম, কৈ, ডাক্তার বাবুকে যে দেখ্‌ছি নে।

স্বামীজি আরও উত্তেজিত হয়ে বল্‌লেন, ডাক্তার আবার কে? আমিই চিকিৎসক।

তখন বুঝতে পারলাম, কেন রামদয়ালের স্ত্রী ম্যানেজার বাবুর দ্বারা আমাকে আসবার জন্য তার পাঠিয়েছেন।

আমি দেখ্‌লাম, আর কারও কাছে না গেলে সকল বৃত্তান্ত শুন্‌তে পাব না। এখানে যদি আর একটাও প্রশ্ন করি, তা হলে হয় ত স্বামী বিপুলানন্দ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌বেন। আমি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বারান্দায় দেখি, একখানি বেঞ্চের উপর বৃদ্ধ ম্যানেজার মলিন-মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, সুশীল, তুমি এসেছ, ভালই করেছ। পাশের ঘরে এস, সব কথা তোমাকে বল্‌ছি। হায়, হায়, ছেলেটাকে ওরা সকলে মিলে মেরে ফেল্‌ল।

তাঁর সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে দুইজনে দুইখানি চেয়ারে বসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি কাকাবাবু?

তিনি বল্‌লেন, কি আর তোমাকে বল্‌ব বাবা! দাদামণির জ্বর হয়েছে আজ তের দিন। প্রায় তিন চার দিন ডাক্তার মহেন্দ্রকেই দেখালাম। সে কিছুই করতে পারল না; তারই পরামর্শ মত বাঁকুড়া থেকে রোজ সিবিল সার্জ্জনকে আনাতে লাগলুম; তিনি ভরসাও দিলেন যে, রোগ শক্ত হ'লেও ভয়ের কারণ নেই। একটু সময় নেবে। আমাদেরও ভয় দূর হোলো। এই ভাবে কয় দিন যেতেই ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পরে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি খোকাকে দেখে বল্‌লেন, এই সব ডাক্তারী ঔষধ খাইয়ে ছেলেটাকে যে মেরে ফেলতে বসেছ। সব ঔষধ বন্ধ করে দেও। কা'ল সকালে আমি ছেলের চিকিৎসার ভার নেব। জান ত বাবা, রামদয়ালের স্বামীজির উপর কেমন ভক্তি, কত বিশ্বাস। সে বল্‌ল, সে আপনার কৃপা। আপনি যখন এসেছেন, তখন আমার আর ভয় নেই, খোকা নিশ্চয়ই বেঁচে উঠ্‌বে। তার পর আর কি, সপ্তমীর দিন থেকে ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ হোলো। আমি রামদয়ালকে কত বল্‌লাম, বাঁকুড়ায় পূর্ব্বের মত লোক পাঠাতে চাইলাম। রামদয়াল সে কথায় কর্ণপাতই করল না। স্বামীজি কোন ওষুদই দিলেন না, সুধু একটু জলে খানিকক্ষণ ফুঁ দিয়ে বল্‌লেন, এই জল আমি মন্ত্রপূত করে দিলাম। তিনবার করে এই জল খাওয়াবে। দেখো তিন দিনের মধ্যে ছেলে উঠে বস্‌বে। রামদয়ালও তাই বিশ্বাস করল। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিন ছেলেটাকে কোন পথ্যও

দিলেন না। সে কথা বলাতে বল্‌লেন, তোমরা বুঝবে কি? আমি ঐ জল দিয়েছি, ওতে জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছি। ঐ জল একবিন্দু পেটে গেলে আর পথ্যের দরকার হবে না। কি করব বাবা, ছেলেটাকে বিনা চিকিৎসায় আর না খাইয়েই মেরে ফেলল। ওদিকে বৌমা কেঁদে অস্থির। তিনি আর কি করবেন? রামদয়ালকে না কি চিকিৎসার কথা বল্‌তে গিয়েছিলেন; সে রেগে উঠে না কি বলেছিল, স্বামীজি সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই খোকাকে আরাম করে দেবেন, কোন ভয় কোরো না। বাবা, মায়ের প্রাণ কি সে কথা শোনে। তিনি কাল আমাকে ডেকে তোমাকে তার করতে বল্‌লেন। তাঁর বিশ্বাস, কেউ যদি ঐ স্বামীজির কবল থেকে ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে, সে এক তুমি। তাই, তোমাকে কা'ল তার করেছিলাম বাবা! কিন্তু আজ যা দেখ্‌ছি, তাতে আর রক্ষা নেই। কোন চিকিৎসকই আর খোকাকে বাঁচাতে পারবে না। আমার ত মনে হচ্চে, আজকের দিনটাও কাটবে না। হায় হায়, এ কি হোলো। বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

আমি বল্‌লাম, কাকাবাবু, আর কেঁদে কি হবে। এখন দেখি, যদি ডাক্তার আন্‌তে পারি। এই বলে আমি রোগীর ঘরে গেলাম। ডাক্তারী জানি না বটে, কিন্তু নাড়ী দেখ্‌তে একটু আদটুকু জানি। আমি খোকার নাড়ী দেখ্‌তে গিয়ে দেখি স্পন্দন নেই; বুকে হাত দিয়ে দেখি, সেখানেও সাড়া নেই, শরীরে উত্তাপ মাত্র নেই। আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম, দেখ্‌ছ কি, সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

স্বামীজি তাড়া দিয়ে বল্‌লেন, কি চীৎকার করছ? দেখি আমি। এই বলে খোকার গায়ে হাত দিয়ে একটু চুপ করে থাক্‌লেন; তার পর রামদয়াল ও শিষ্যদের দিকে চেয়ে মাথা দোলাতে-দোলাতে বল্‌লেন, পাগলী একটা শক্ত খেলায় ফেল্‌লে দেখ্‌ছি। আচ্ছা, আগে অন্য প্রক্রিয়া করে দেখি, তার পর শেষ ত আছেই।

রামদয়াল, কোন ভয় নেই, তোমার ছেলেকে আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি। রামদয়াল স্বামীজির মুখের দিকে চেয়ে রইল। শিষ্যেরা বলে উঠ্‌ল, প্রভুর অসাধ্য কি আছে? আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—এরা বলে কি?

স্বামীজি তখন খোকার সমস্ত শরীর অনাবৃত করে গায়ের উপর হাত বুলুতে লাগলেন, আর অনুচ্চ স্বরে কি মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। প্রায় দশ মিনিট এই ভাবে গেলে, তিনি রামদয়াল ও শিষ্যদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, আগেই ত বলেছি পাগলী একটা শক্ত খেলায় ফেলেছে। বেশ, তাই হবে। তোমরা শোন, আমি এই ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে আর তোমরা জীবিত পাবে না; আমার প্রাণ-শক্তি এই ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাকে বাঁচিয়ে তুলব, আমি কিন্তু সেই দণ্ডেই দেহরক্ষা করব। রামদয়াল আমার পরম ভক্ত। তার জন্য আমি দেহপাত কর্‌তে প্রস্তুত। এখনই আমি সে প্রক্রিয়া আরম্ভ করছি। এই বলে তিনি গর্ব্বভরে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন।

তখন তাঁর শিষ্যগণ একেবারে সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ল, সে কিছুতেই হ'তে পারে না প্রভু! একটী শিশুর জন্য আপনি দেহরক্ষা করবেন, এ কিছুতেই আমরা করতে দিতে পারিনে। আপনার জীবনের সঙ্গে কি এই বালকের জীবন বিনিময় হতে পারে—অসম্ভব, অসম্ভব। রামদয়ালবাবু, আপনি কি এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন?

রামদয়াল করযোড়ে বল্‌ল, না প্রভু, সে হতেই পারে না। আমার পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য আপনার অমূল্য জীবন দিবেন, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। যাক্, আমার ছেলে। রামদয়াল আর কথা বল্‌তে পারল না।

স্বামীজি তখন নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বল্‌লেন, তবে আর কি করা যায়!

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। আমার তখন ইচ্ছা করছিল——————

কৌতুকাঙ্কন

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি, এস্‌-সি

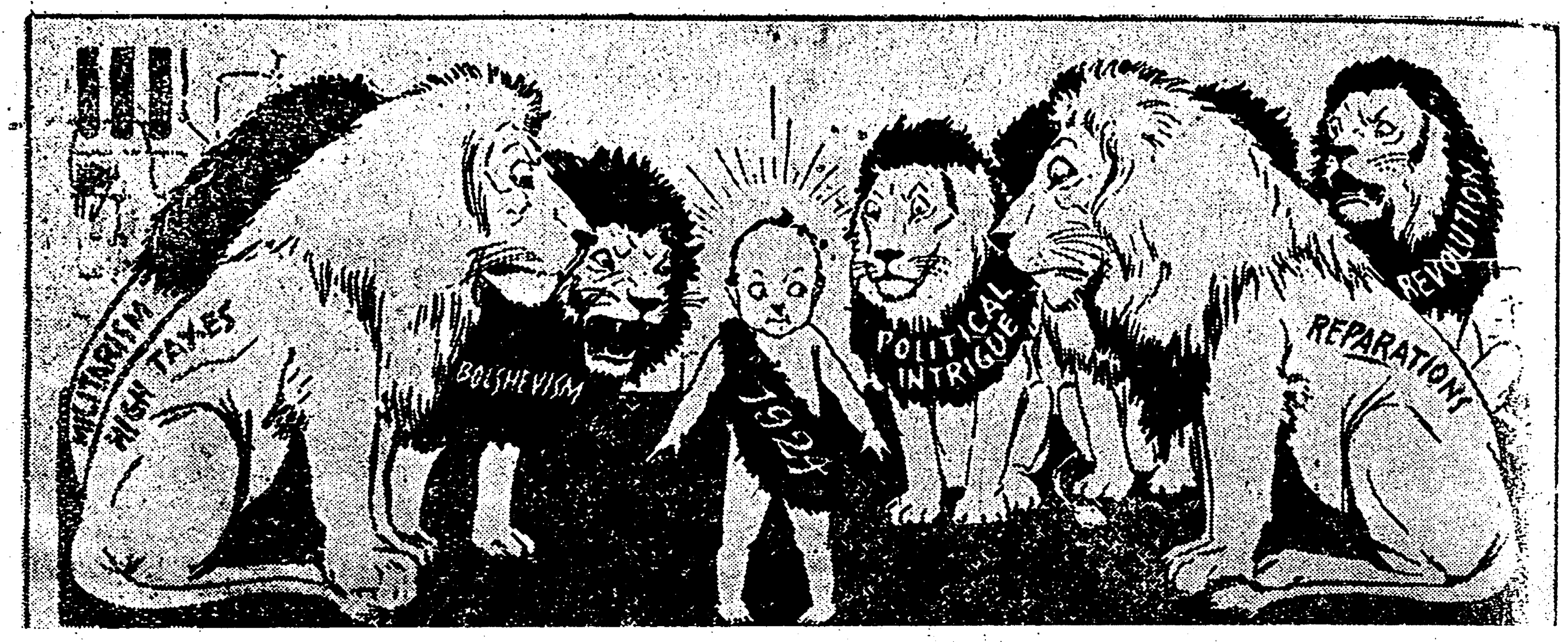

ব্রিটিশ সিংহদল

(১৯২৪ সালেও আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে রাজ-নৈতিক ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, ক্ষতিপূরণের দাবী, বোলশেভিক-বাদ, করবৃদ্ধি ও ক্ষাত্রবৃত্তি প্রভৃতি হিংস্র কেশরী ঢুকে সিংহের দল বৃদ্ধি করছে)

[Marcus in the New York Times]

টেক্সর চাপন

(অপরিমিত করের চাপনে মরণাপন্ন করদাতাকে সাহায্য ক'র্‌তে ক্ষীণকায় গণতন্ত্রবাদী ও জনরাষ্ট্রপন্থীরা উঠে-পড়ে লেগেছে। করদাতার একমাত্র আশা যে হয়ত তার শেষ নিঃশ্বাস পড়বার আগে সে নিষ্ক্রিয় স্বরাজ দেখে যেতে পার্‌তো।

(Kirby in the New York World]

ধরে রাখা দায়

("আয়ার্লাণ্ড" তার বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে—আর ভারতবর্ষ তার অনুসরণ করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌ছে দেখে ভারতের বন্ধন-শৃঙ্খল আরও জোর ক'রে আঁকড়ে ধরে জনবুল ব'ল্‌ছে "কুকুরটা ত ভাগল, এখন বাঘটাকে ত ধরে রাখা দায় হয়ে উঠ্‌ছে"।)

[Mucha (Warsaw)]

ঝুঁটি ছাঁটা

(ফরাসীর রকম-সকম দেখে ইংলণ্ড আর আমেরিকা দুজনে গা টেপাটিপি ক'রে ব'ল্‌ছে "ফরাসীর ঝুঁটিটা বড় বেড়েছে, ওটা একটু কেটে-ছেঁটে কম করে না দিলে আর চল্‌বে না দেখছি!") [Die Muskete (Vienna)]

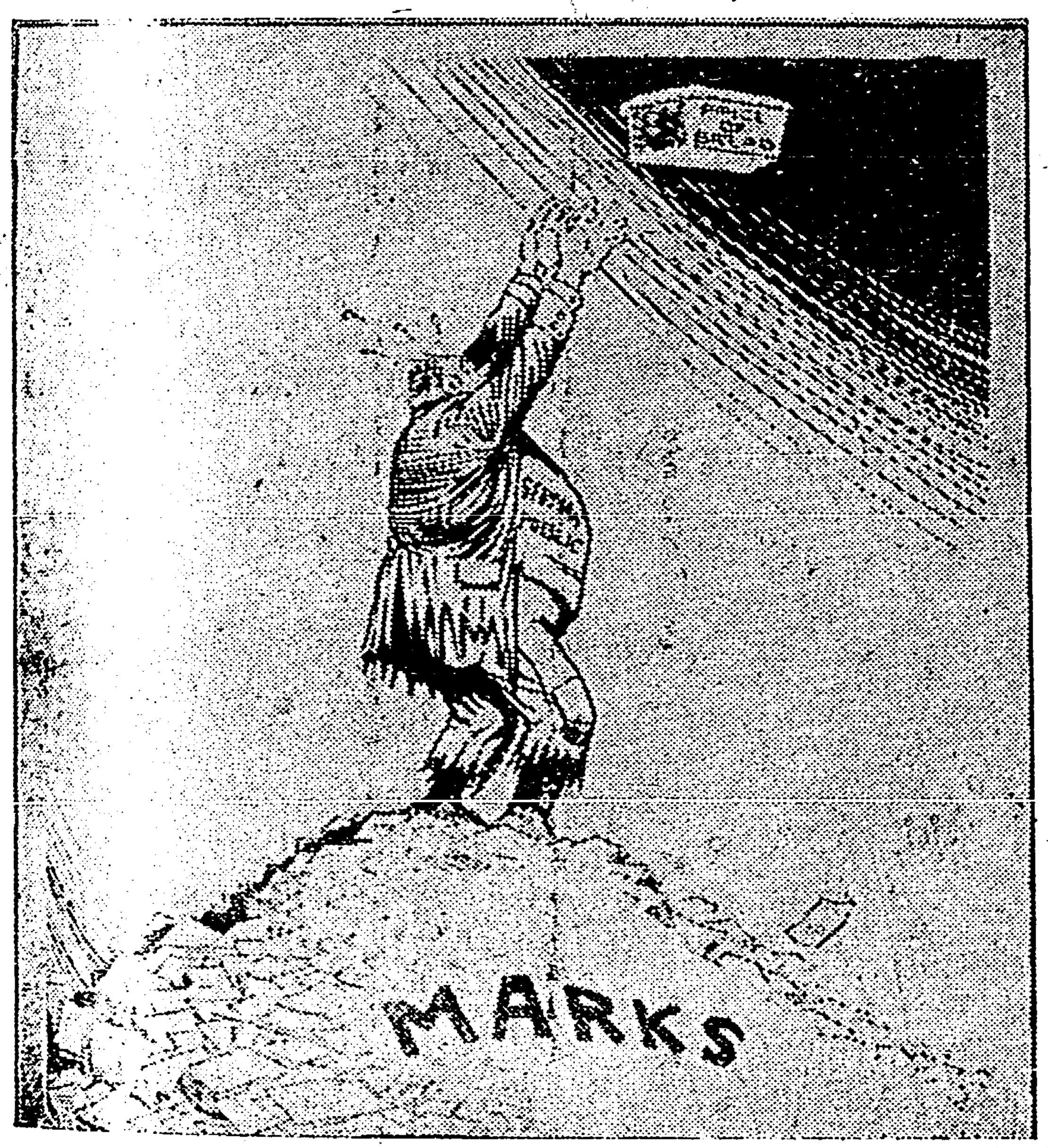

রুটির নাগাল

(কিছুদিন আগে জার্ম্মাণীতে রুটির মূল্য অতিরিক্ত বেড়ে গে'ছল। অথচ সেখানকার প্রচলিত মুদ্রা মার্কের দাম তখন অসম্ভব রকম কমে যায়। এই বিপরীত ব্যাপারে দেশের লোকের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, স্তূপাকার মার্কের পাহাড়ের উপর চড়েও একজন লোক একখানি রুটির নাগাল পেত না।)

[Cargill in the Kansas City Journal]

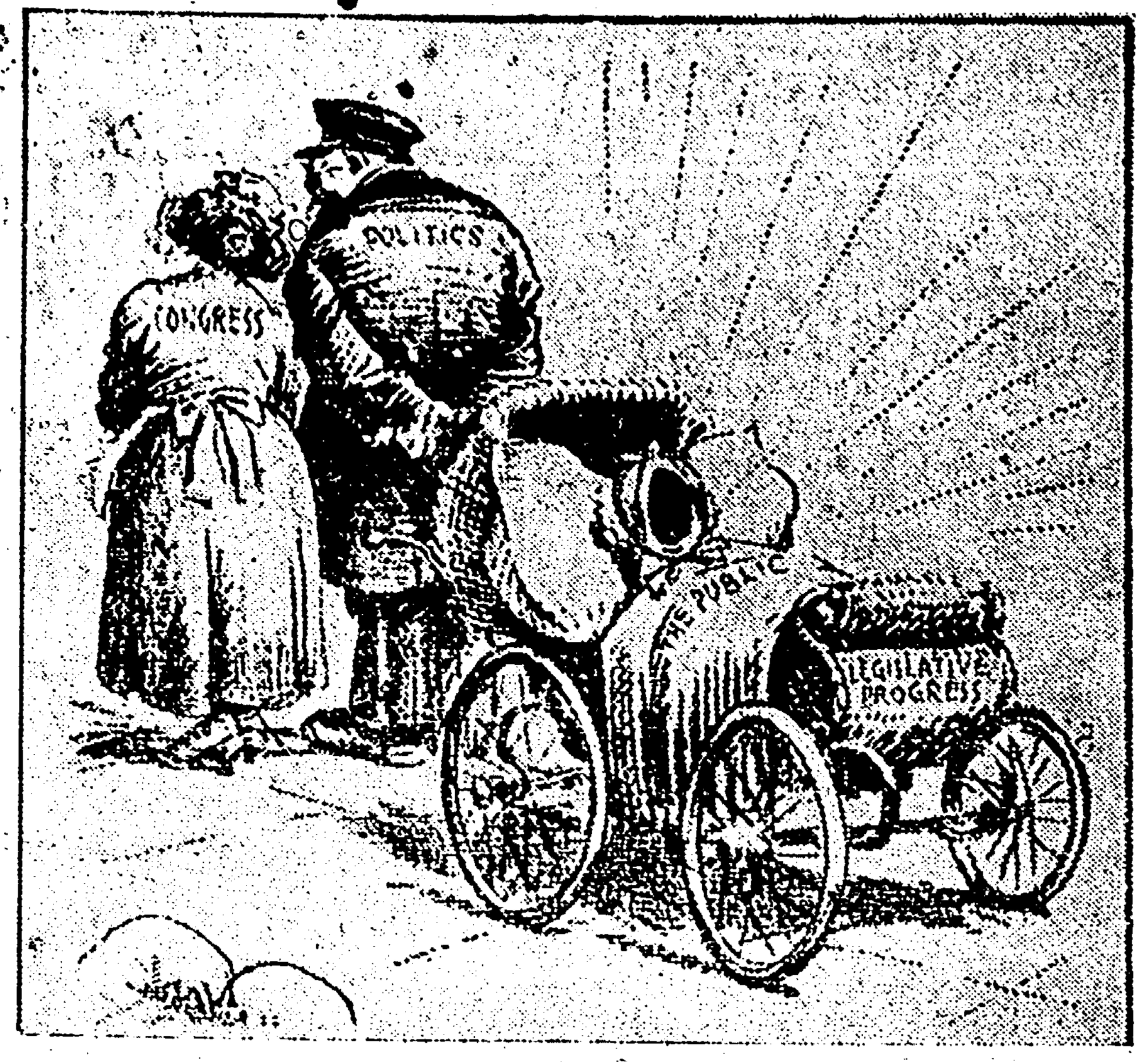

জাগরণ

(কংগ্রেস ও রাজনৈতিক নেতাদের পরিচালনে সুপ্ত জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় শৈশব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল, কিন্তু আজ সে জেগেছে। জেগে উঠেই শিশু তা'র নিজের মতে চ'লবার জন্য বায়না ধরেছে।)

[Sykes in the Philadelphia Evening Public Ledger]

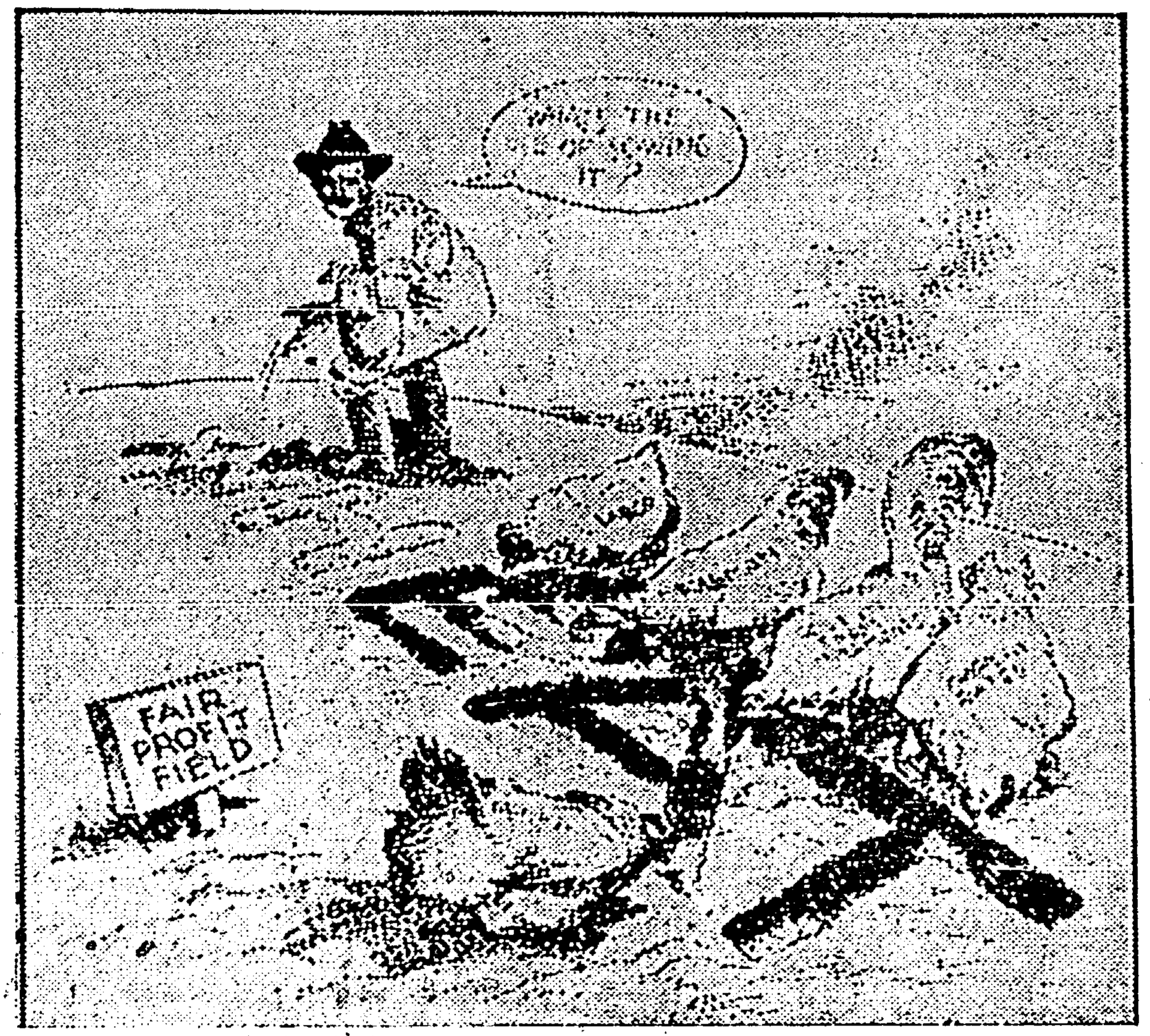

লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়

(চাষা সম্বৎসর পরিশ্রম ক'রে ক্ষেতে যে গোধূম বুনলে, তার কতক গেল মজুরদের পেটে, কতক গেল মহাজনের পেটে, কতক গেল যন্ত্রপাতির দামে, কতক গেল রেলভাড়ায়, আর বাকী যা ছিল তা টেনে নিলে জুয়াখেলায় বা বাজে খরচে সুতরাং চাষাকে খালিপেটেই থাক্‌তে হ'চ্ছে বারমাস)

[Evans in the Columbus Despatch]

ফরাসীর দুঃস্বপ্ন

(রূঢ়ের ব্যাপার নিয়ে ফরাসী যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে যে রণরাক্ষস ও মৃত্যু-প্রেত দুজনে "পঁয়কার"-রূপী ফরাসীর দু কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে "একবার হুকুম দাও ব্যস্‌! শেষ যা' কর্‌তে হয় আমরা ক'রবো।")

[L' Humanite (Paris)]

জলের পিপে

(আমেরিকা আইন করে দেশ থেকে মদ্যপান উঠিয়ে দেওয়াতে সুরাসক্ত লোকগুলোর সেখানে এমন অবস্থা হয়েছে যে, রাস্তা দিয়ে জলের পিপেও নিয়ে যাবার জো নেই ;—পিপে যাচ্ছে দেখলেই তারা মদের পিপে মনে করে এক চুমুক যদি পায় এই আশায় একেবারে দলে দলে ছুটে আসে গাড়ী ধর'তে)

[Darling in the New York Tribune]

দোসরা ঘর দেখো

(দক্ষিণ আফ্রিকার মতো আমেরিকাও এসিয়ার লোককে আর সেখানকার বাসিন্দা হ'তে দিচ্ছে না। নূতন আইন করে তাদের হাঁকিয়ে দিয়ে বল্‌ছে—"দোস্‌রা ঘর দেখো!")

[Darling in the Collier's, The National Weekly]

আয়কর

(যাঁদের বেশী টাকা তাঁরা হরেক রকম কোম্পানীর কাগজ কিনে নিজেদের আয়করের কবল থেকে মুক্ত হ'য়েছেন। কিন্তু যারা গরীব অল্প উপার্জ্জন ক'রে, কিছুই সঞ্চয় ক'র্‌তে পারেনি, আয়কর (Income Tax) প্রত্যেক মাসেই তাদেরই পকেট কাটছে)

[Knott in the Dallas News]

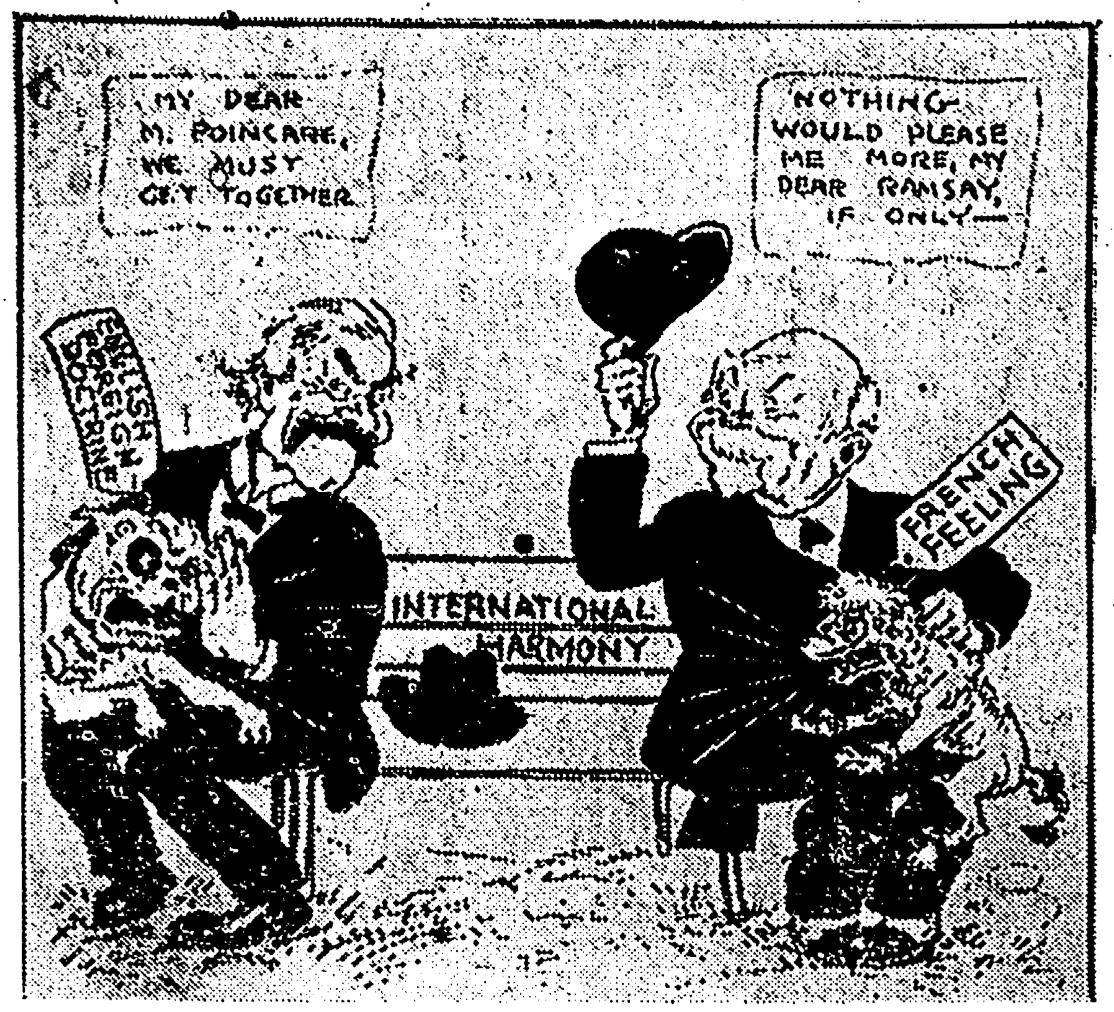

সিংহ ও শার্দ্দূল

(ফরাসী ও ইংরাজ পরস্পরের চির শত্রু ছিল। কেবল জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধাচারণ করবার জন্য দুজনে কিছুদিন থেকে মৌখিক মিত্রতা অবলম্বন ক'রেছেন বটে, কিন্তু সিংহ শার্দ্দূলের মনোভাবটা কাহারও কাছে অবিদিত থাক্‌ছে না।) [Morris for the George Mathew Adams Service]

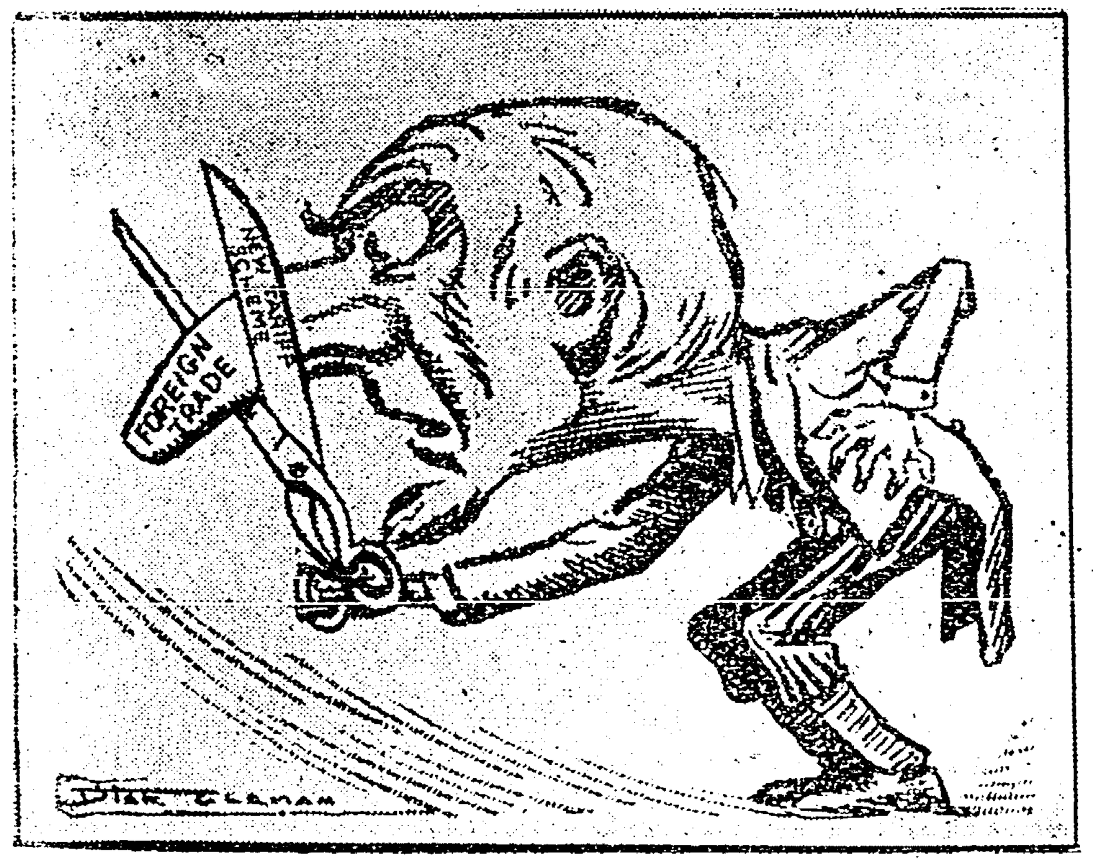

নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ

(আমেরিকা নিজেদের দেশ থেকে কোনও জিনিষ বিদেশে রপ্তানী বা বিদেশ থেকে কোনও জিনিষ আমদানী কর্‌তে চায় না। সে মনে করে এতে তার দেশের ভয়ানক ক্ষতি হবে ; কিন্তু লোকে বল্‌ছে এটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা ছাড়া আর কিছুই নয়)

[South Wales News (Cardiff)]

নেতার বিড়ম্বনা

(মার্কিণ যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেণ্ট কুলিজ, আমেরিকার কংগ্রেসকে সংস্কারের পথে চালিত ক'রতে চাইবামাত্র অধিকাংশ সভ্যরা সভা ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে। এ দেশের নেতাদেরও মধ্যে এই বিড়ম্বনা পুনঃপুনঃ ঘটতে দেখা যায়) [Campana de Gracia (Bercelona)]

আয়-ব্যয়

(স্বর্গগত পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) মিতব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর দেশের লোককে মিতব্যয়ী হবার জন্য বার বার অনুরোধ ক'রে গেছেন। আজ তাঁর প্রেতাত্মা এসে দেশের লোকের ব্যয়-বাহুল্য দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।) [Morris for the George Mathew Adams Service]

অসার ভোট

(বিলাতে একুশ বৎসর ও ততোধিক বয়সের লোকদের ভোট দিবার অধিকার দেওয়ায় স্ত্রী-ভোটের বিরোধীরা ব্যঙ্গ-চিত্রে দেখাচ্ছেন যে একুশ বছরের যুবতীর মাথায় আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-বাসনা ছাড়া আর কিছুই থাকে না ; সুতরাং রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের ভোট একেবারেই বাজে) [Daily Express (London)]

কর্ত্তার মর্জ্জি

(মুসোলিনী তাঁর শাসন-নীতির বিরোধীদের রাষ্ট্র-পরিষৎ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বলছেন "এ রাজ্যের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা আমি। শাসন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন করা না করা আমার ইচ্ছা। তোমরা দূর হও !")
[Il Travaso (Rome)]

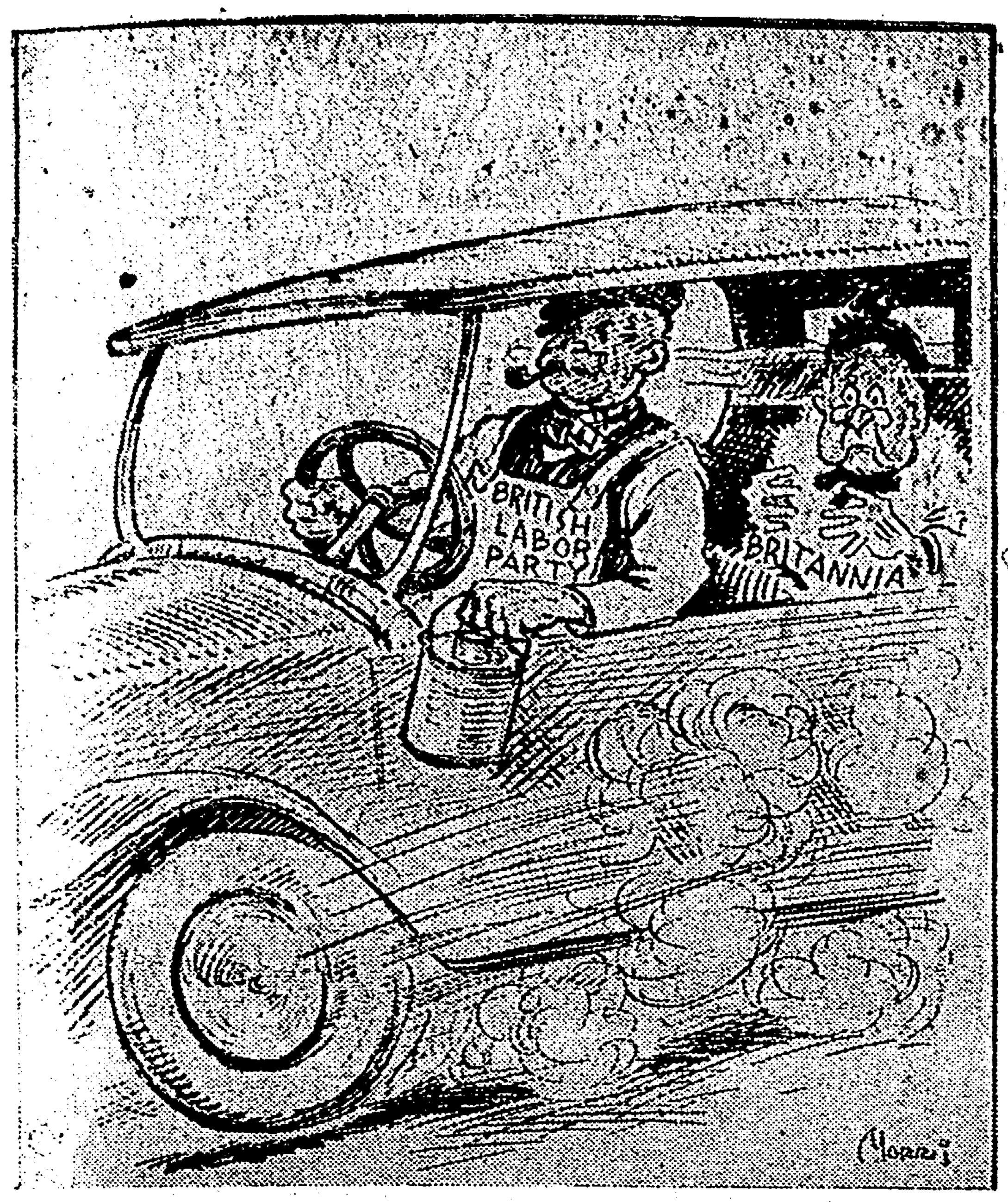

রাষ্ট্রীয় রথে

(বিলাতে এখন শ্রমিক দলেরা রাজকার্য্য পরিচালন ক'রছে, তাই বিপক্ষদল ব্যঙ্গ ক'রে বল্‌ছে, ব্রিটানীয়া সর্ব্বদা সশঙ্কিত হয়ে ভাব্‌ছেন "কি জানি কখনই বা কি দুর্ঘটনায় এইবার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যায়।")
Morris for the George Mathew Adams Service]

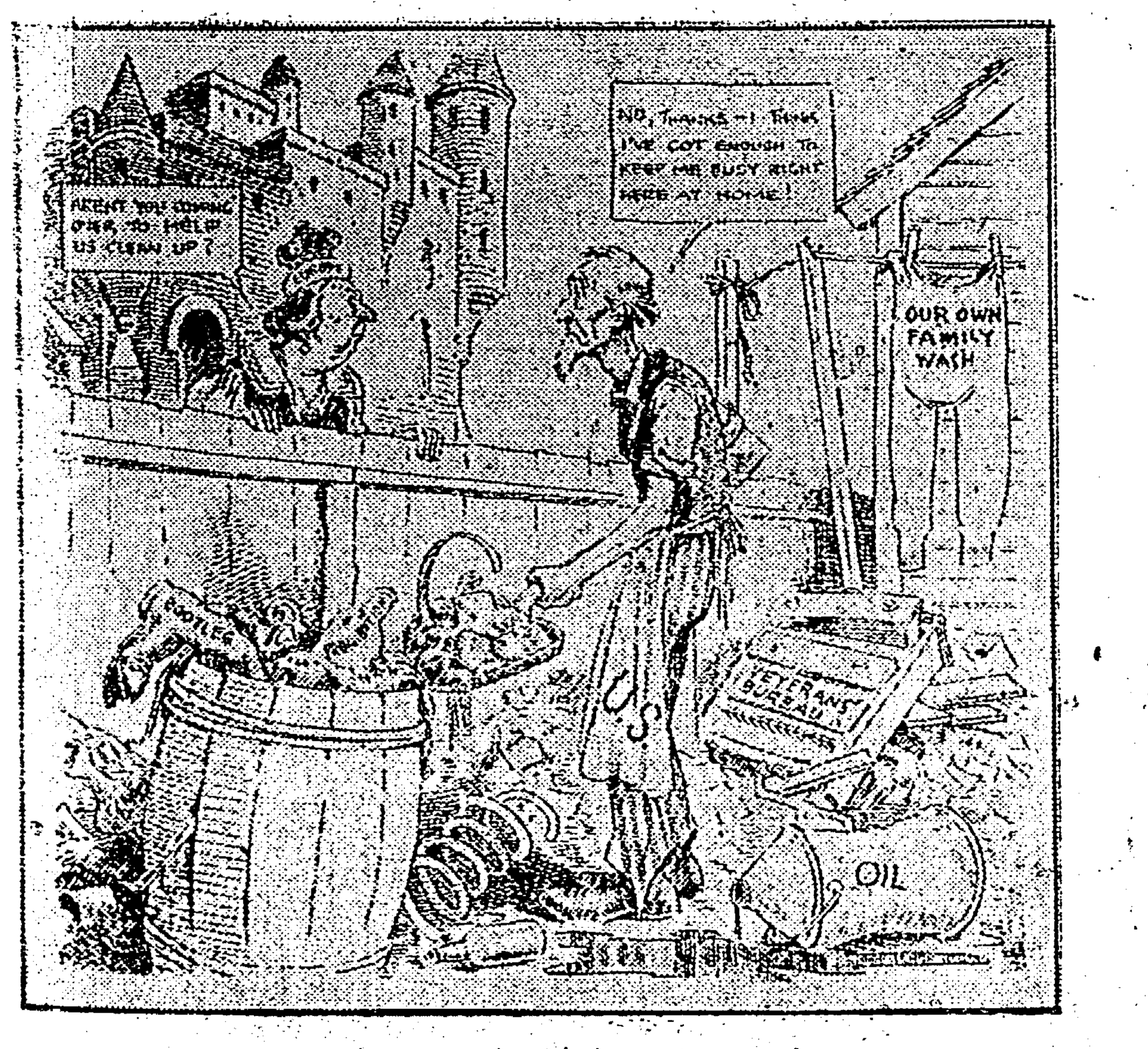

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা

(য়ুরোপের অশান্তি মেটাবার জন্য প্রতীচ্য আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করাতে আমেরিকা বল্‌ছে "মাপ করবেন ঠাকরুণ ! আমার নিজের ঘর সামলাই আগে ! পরের কাজে হাত দেবার আমার মোটেই ফুরসুৎ নেই।")
[Ireland in the Columbus Despatch]

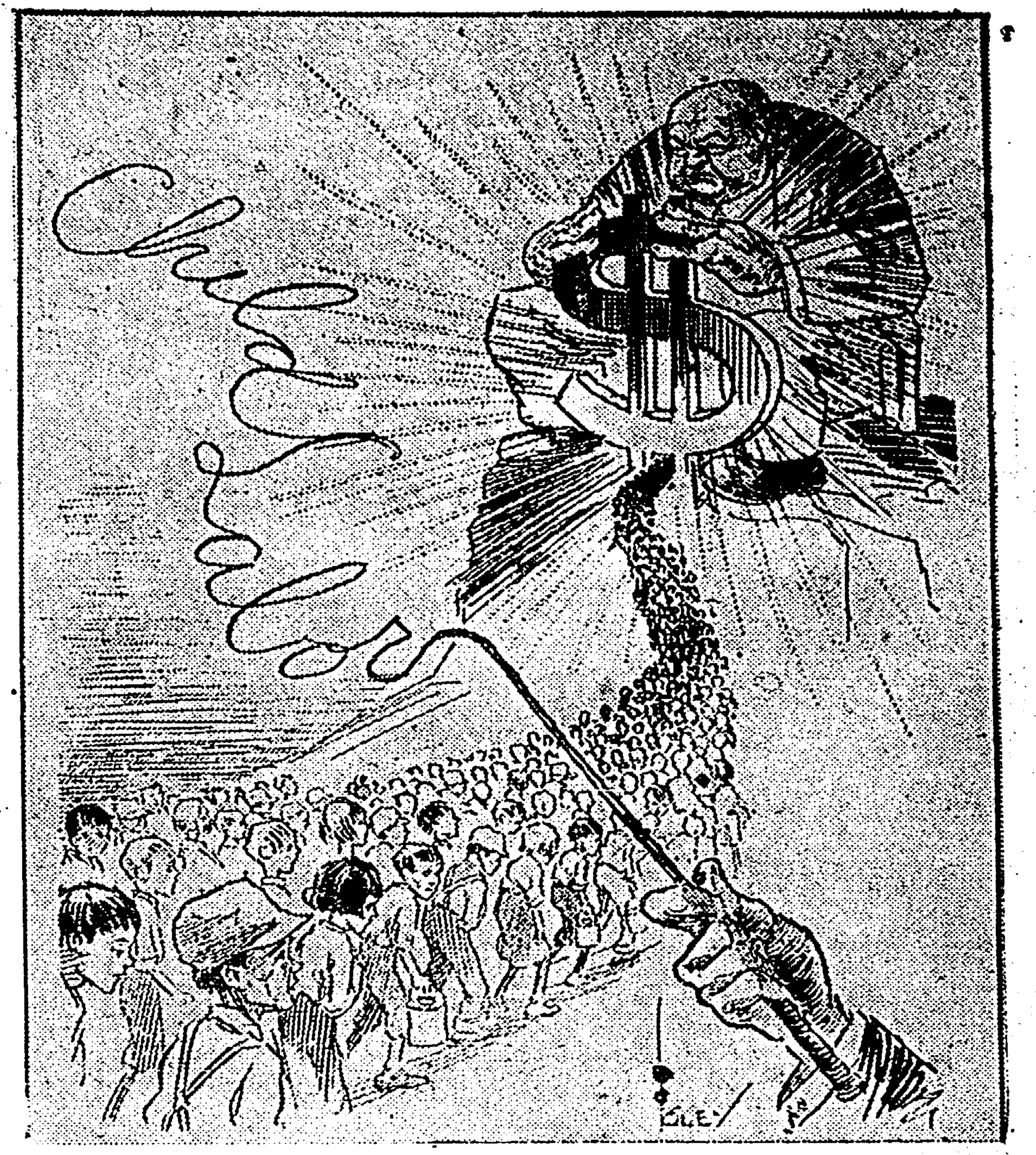

শিশু বলি

অর্থগৃধ্নু পিতামাতার কঠোর লালসা পূর্ণ ক'রতে অসংখ্য ছোট ছোট বালকবালিকারা য়ুরোপের নানা কল-কারখানায় শারীরিক পরিশ্রম ক'রে অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে বাধ্য হয়। এতে তাদের শরীর ও মন দুটোই একেবারে অধঃপাতে চলে যায়। অর্থ-কাপালিকের শিশুবলি রুদ্ধ ক'রবার জন্য সেখানে এখন নিয়ম হয়েছে যে ১৮ বছরের কম বয়সের বালকবালিকাদের যদি কলকারখানায় মজুরী করে জীবিকানির্ব্বাহ ক'রতে দেখা যায়, তবে তাদের ও তাদের পিতামাতার কঠিন শাস্তি হবে। এ দেশেও এই রকম একটা নিয়মের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে)

[Foley in the Minneapolis Minnesota Daily Star (Labour)]

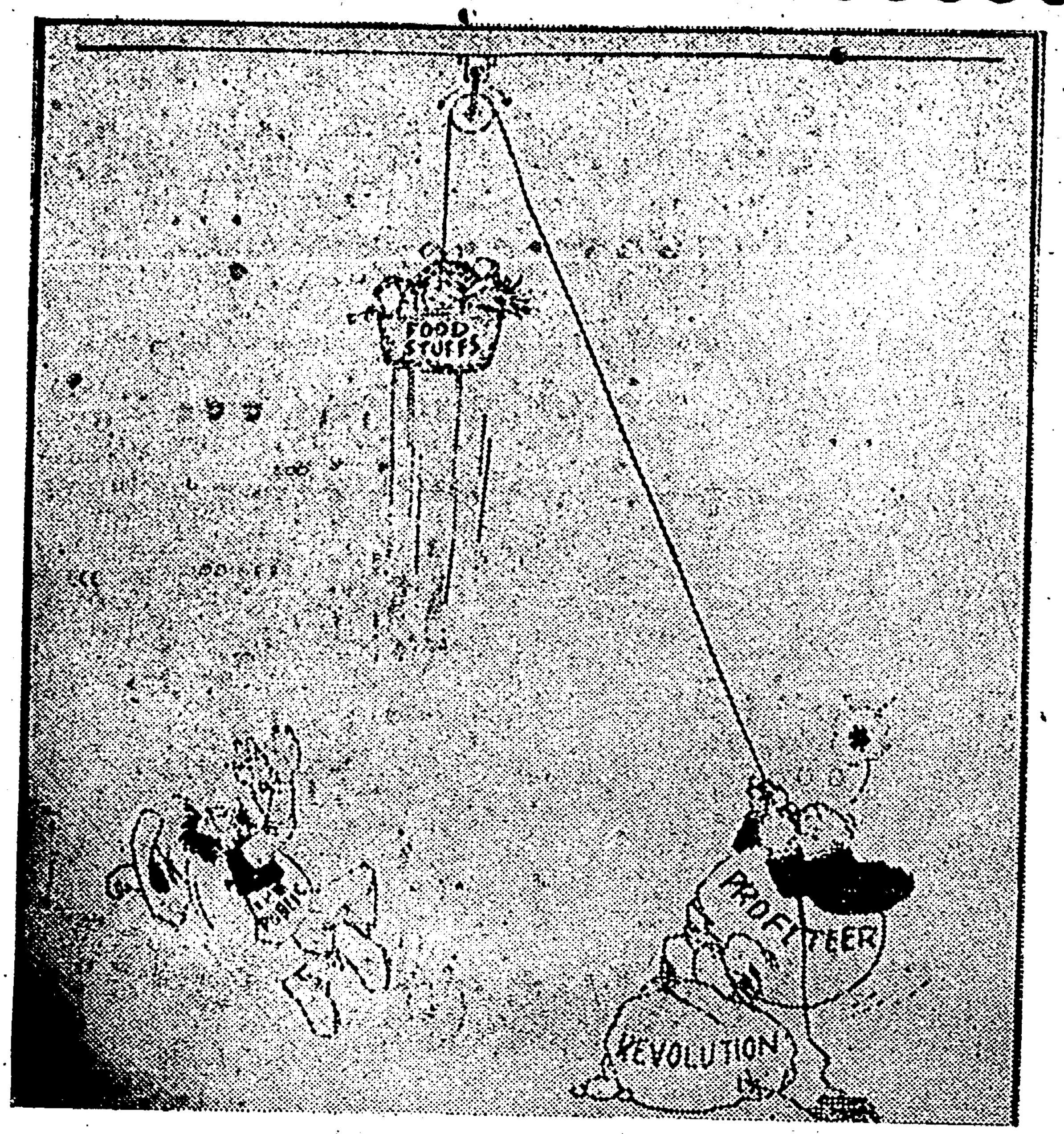

খাদ্যের দুর্ম্মূল্যতা

(অধিক লাভের লোভে ব্যবসাদারেই খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি ক'রে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে টেনে তুল্‌ছে, অথচ মুখে ব'ল্‌ছে "কি ক রবো যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্তর্বিপ্লব এই সব অনাসৃষ্টি ব্যাপারের জন্যই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে!")

[El Mundo (Mexico city)]

হাটে হাঁড়ি ভাঙা

(পাওনা খেসারত আদায়ের দাবী নিয়ে ফরাসী জার্ম্মাণীকে পীড়াপীড়ি করতে জার্ম্মাণী যখন য়ুরোপের প্রতিনিধিদের তার লোহার সিন্দুক খুলে দেখিয়ে বল্‌ছে, "দেখ্‌ছেন তো আমার একটি কপর্দ্দকও নেই।" তখন পিছন থেকে ফরাসী বল্‌ছে, "তোমার নিজের কাছে না থা'ক্‌তে পারে, কিন্তু হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলাণ্ড, আমেরিকা এদের কাছে তোমার যে টাকা লুকান আছে তা থেকে ত' দিতে পার!" শুনে সবার বদন বিস্ফারিত।)

[La croix (Paris)]

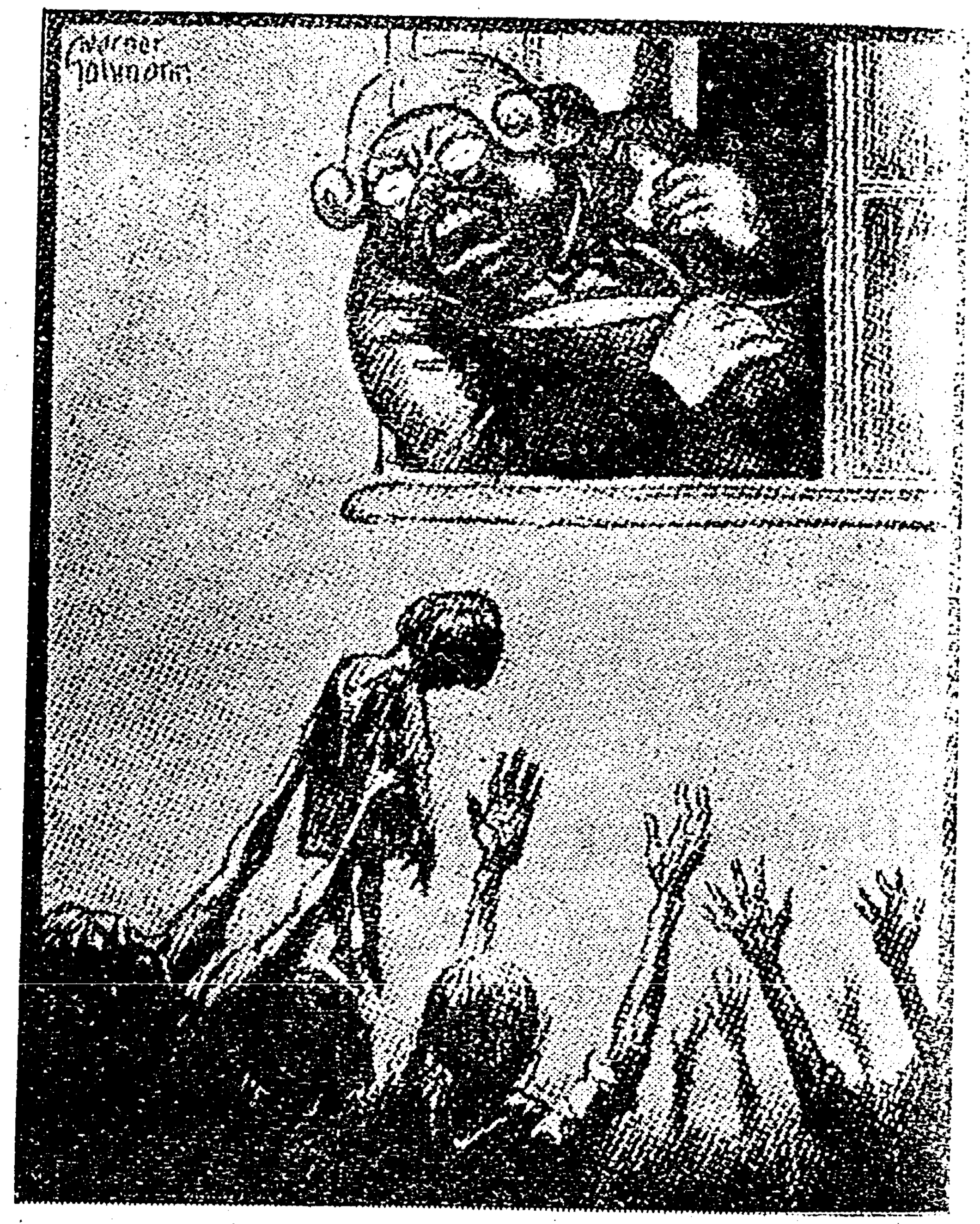

আশার বাণী

(অন্নাভাবে জলাভাবে মৃতপ্রায়, ক্লিষ্ট প্রজাদের সকরুণ অভিযোগের উত্তরে শাসক-সম্প্রদায় তাদের বল্‌ছেন "আর একটা বছর অপেক্ষা করো, এই আগামী সালের বাজেটে তোমাদের সব দুঃখ কষ্ট দূর ক'রে দেবো, এখন বিরক্ত করো না, চুপ করে পড়ে থাক")

[Kladderadatsch (Berlin)]

একাই একশ

(মুসোলিনীর স্বেচ্ছাচারিতায় ত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে পার্লামেন্টের লোকেরা পদত্যাগ করবার ভয় দেখালে মুসোলিনী ক্রোধে কম্পমান হয়ে তাঁর দেশী ও বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় মুগুর তুলে চীৎকার করে বল্‌ছেন "দুর্ব্বল সহযোগীদের নিয়ে কাজ করার চেয়ে একা বেশ সুশৃঙ্খলে শাসন করা যায়। তোমরা সবাই দূর হয়ে যাও! আমি কাউকে চাই না!")

[Il Travaso (Rome)]

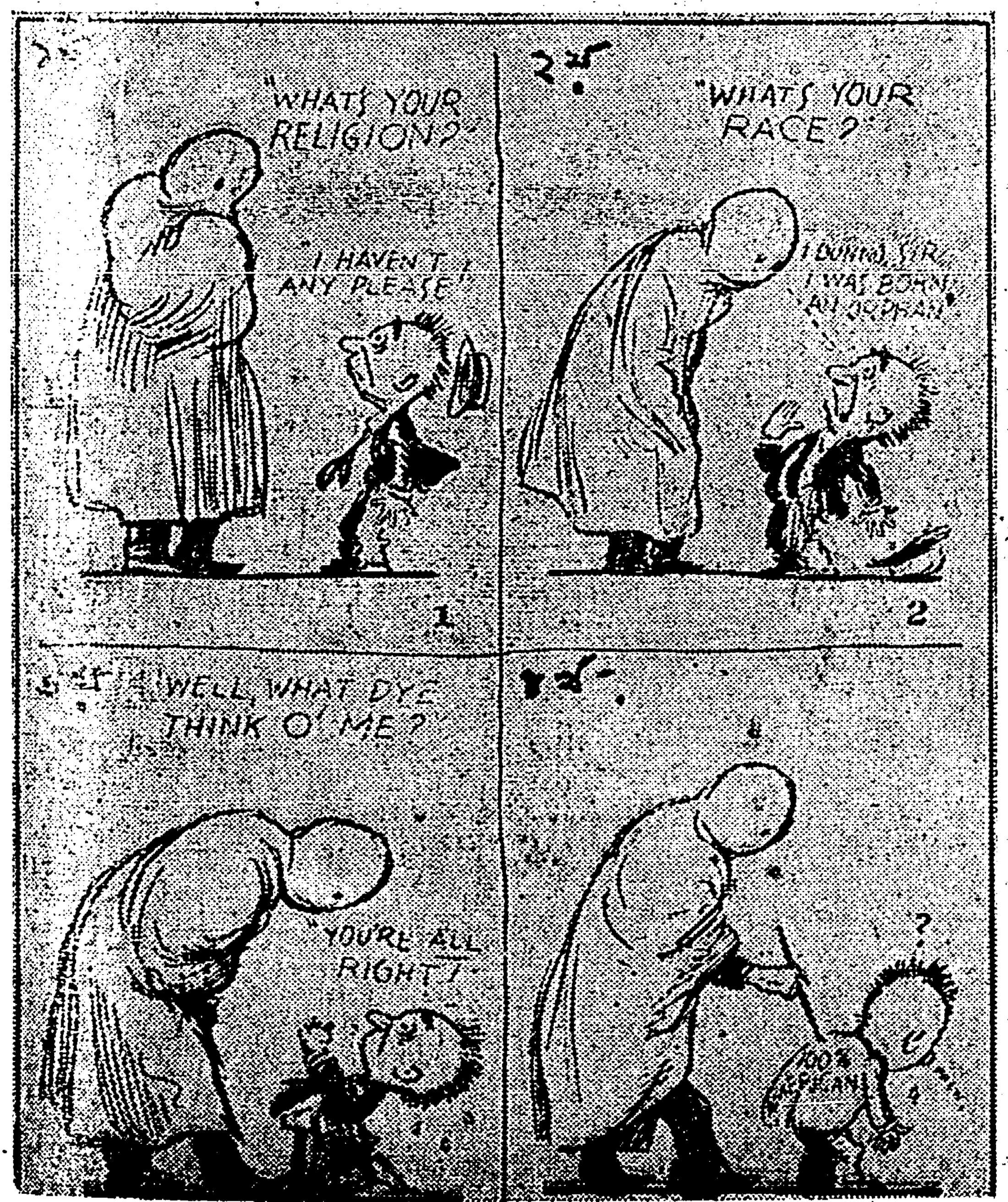

মার্কিণের মার্কা

প্র:—তোমার ধর্ম্ম কি?

উ:—কই কিছু নেই ত।

প্র:—তোমার জাত কি?

উ:—কি জানি! আমি যে অনাথ হয়েই জন্মেছি।

প্র:—আচ্ছা আমার সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?

উ:—কেন, বেশ ভালই আছেন মনে হয়।

মন্তব্য:—বা: তুমিই পূরো মাত্রায় মার্কামারা মার্কিন!

[Munphis Commercial Appeal]

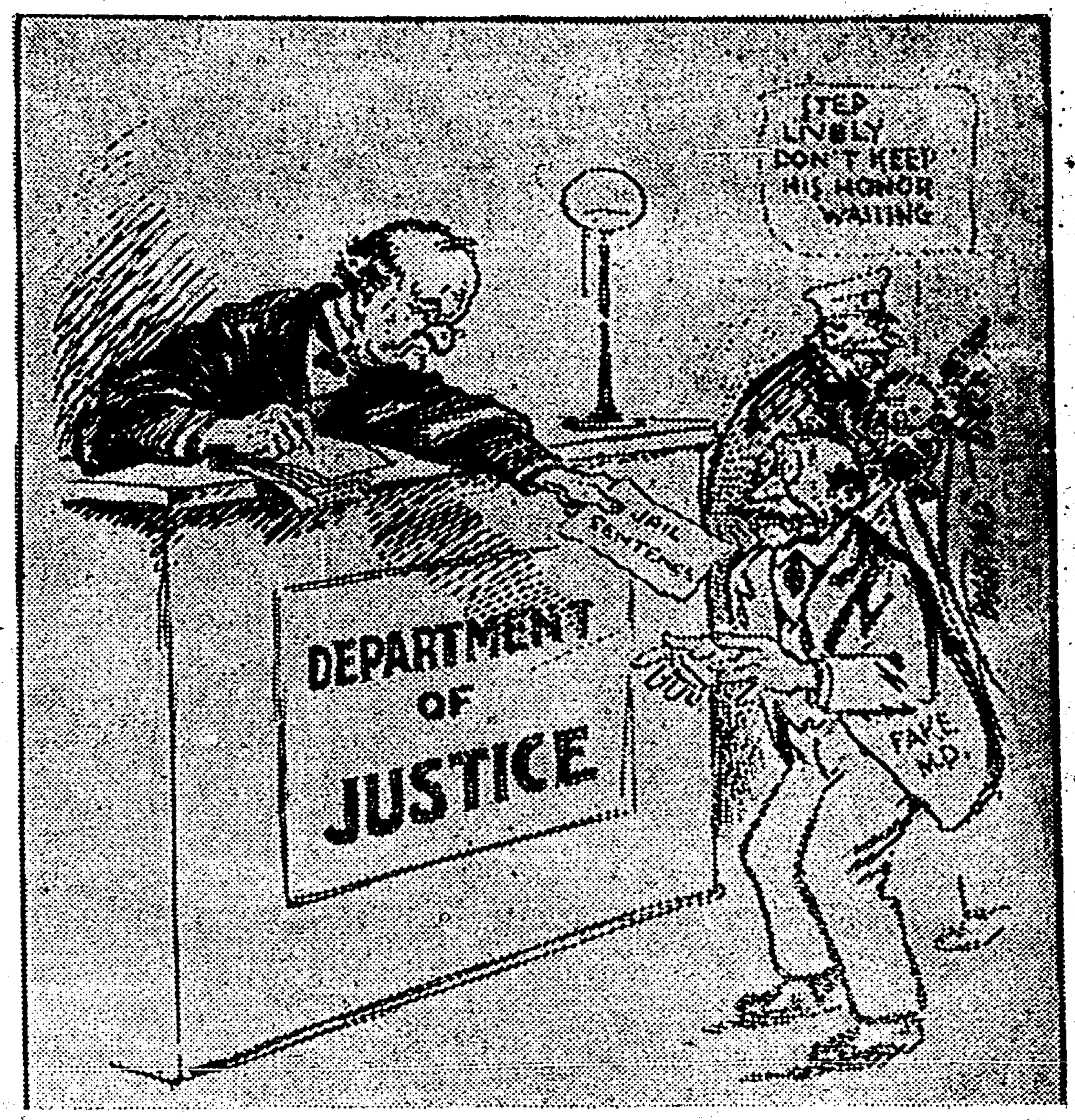

জজের ডাক্তারী

(হাতুড়ে চিকিৎসকের পাল্লায় পড়ে প্রতি বৎসর অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে দেখে গভর্মেণ্ট সে সব গোবৈদ্যকে বধ করবার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল, আদালত ঐ সব হাতুড়েদের বধ করবার জন্য তাদের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করে শ্রীঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা দিচ্ছেন। হাতুড়ে ডাক্তারের বৈদ্যগিরি রোগের এর চেয়ে ভাল চিকিৎসা আর কি হতে পারে? এখানেও জজেদের দিন কতক ডাক্তারী করবার দরকার হয়েছে)

[Morris for the George Adam's Service]

মা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

রাঁচির একটা অফিসে আমি ষাট টাকা মাইনের 'টাইপিষ্ট'। জীবনের যা কিছু বন্ধন, হুগ্‌লি জেলার একটী গ্রামের ছোট কুঁড়ে ঘরে ফেলিয়া, পেটের দায়ে, আড়াইশ' মাইল দূরে, এই চাকুরী করিতে আসিয়াছি। ঠিক নিজের পেটের দায়ে নয়; কেন না ছেলেবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত নিজের জন্য ভাবনাটা কখনো বড় করিয়া ভাবি নাই। বিশ্বাস আছে, নিজের দিন একরকম চলিবেই—কেন না, তাহার ভার আমার নিজের হাতে। কেবল বৃদ্ধা মাতা শেষ বয়সে কষ্ট পাইবেন, ইহা দেখিতে পারিব না বলিয়াই, দাদাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া, মাসে মাসে সেখানে টাকা পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতাম। দাদা আমার এক বছরের বড়।

এক দিন পাঁচটার সময় অফিসের কাজ শেষ করিয়া যখন তাড়াবন্দী টাইপ-করা কাগজগুলি একপাশে ঠেলিয়া রাখিলাম, তখন আপনা হইতেই আমার মন যেন হাল্‌কা হইয়া ছুটির আনন্দে ভাসিবার জন্য প্রস্তুত হইল। অফিসের অন্যান্য লোকেরা নিকটে নিজের নিজের 'কোয়ার্টারে' থাকিত; আমার জন্য জায়গা না হওয়ায়, সাহেব আমায় কিছু মাসিক ধার্য্য করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—সহরে কোথাও বাসা করিয়া থাকিতে।

সেদিন বৃষ্টি হইবে বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। সঙ্গে ছাতা ছিল না। কিন্তু যখন ছুটি হইল, তখন অবিশ্রান্ত ধারায় ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে! আমার সহকর্ম্মীরা তাঁদের নিকটের বাসায় রুমাল-মাথায় বা কাগজ-মাথায় ছুটিয়া পৌঁছিলেন। অফিস-বারান্দায় রহিলাম আমি একা! তাঁদের মধ্যে দু' একজন আমায় নিজেদের কোয়ার্টারে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু এই বর্ষার অবিরল ধারায় আমি অকারণ পুলকের সন্ধান পাইয়া সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলাম।

অবশ মন ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল! আমি সেই বারান্দার উপর দুই গালে দুই হাত দিয়া উবু হইয়া বসিলাম। সম্মুখের বৃষ্টির সুর আমার মনকে যেন কোন্ দূর দূরান্তরে লইয়া যাইতেছিল! বাদলের উদাস হাওয়ায় সে যেন উধাও হইয়া উড়িতেছিল! একে একে কত কথা মনে পড়িতে লাগিল! এম্‌নি বরষার দিনে ছোটবেলায় কত দিন কি আনন্দে উঠানে বৃষ্টির জলে স্নান করিয়াছি। কত দিন এমনি ভাবে বর্ষা-সজল সন্ধ্যায়, শূন্যমনে গাছের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, আর বড় বড় জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া পল্লব হইতে পল্লবান্তরে ঝরিত! সে সব দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে! আজ যেন আবার তাহাদিগকে নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইতেছিলাম।

এমন সময় আমার স্বপ্নাবেশ ভঙ্গ করিয়া টেলিগ্রাফ-পিয়ন তাহার লাল রঙের সাইকেলে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া, তাড়াতাড়ি, আমি যেখানে ছিলাম, সেইখানে উঠিল। ভাবিলাম, সকলেই ত চলিয়া গিয়াছে,—কাহার বিপদের খবর এ বহন করিয়া আনিল? বাঙালীর জন্য ত টেলিগ্রাফে বিপদের সংবাদ ছাড়া অন্য কিছু থাকে না! এমন সময় ভিজা কোটের পকেট হইতে সন্তর্পণে একটি কাগজে-মোড়া লাল খাম সে আমার হাতে দিয়া বলিল, "বাবু, জেরাসে দেখিয়ে ত ইস্‌কা পাত্তা কাঁহা মিলে গা?"......যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়।...... ভয়ে ভয়ে সেটি হাতে লইয়া দেখিলাম, উপরে আমারই নাম। পিয়নকে সই দিয়া ভিতরের কাগজটি পড়িতে পড়িতে আমার মন অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। আমাদের সুমুখের বাড়ীর সতীশ-মামা টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে, আমার দাদা জ্বর-বিকারে মরমর,—আমি যেন শীঘ্র বাড়ী যাই।

গ্রাম সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মজুমদারকে আমি মামা বলিতাম। তিনি গ্রামেই চাষ-বাস লইয়া চিরকাল থাকেন ও বিপন্নের সর্ব্বসময় যথাসাধ্য সাহায্য করেন। আমাদের বাড়ীর সুমুখেই তাঁর বাড়ী। ছেলেবেলা হইতে আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিতাম ও ভালবাসিতাম। তিনিও এই পিতৃহীন বালককে বরাবর সন্তানের ন্যায় স্নেহ

করিয়া আসিয়াছেন ও আমাদের সংসারের অনেক ভার স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে লইয়াছেন। যেদিন চাকুরীর সংবাদ পাইয়া আমি চিরদিবসের বাঙ্‌লাদেশ হইতে সুদূর ছোটনাগপুরে বাস করিতে আসিতেছিলাম, সেই দিন দুপুরে তিনি আমায় ডাকিয়া কত উপদেশ দিলেন, কত কথা বুঝাইলেন। যখন ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া তিনি বিদায় লইলেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগের ভাব স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল,—যেন তাঁহারই সন্তান দূরদেশে চলিয়াছে! তিনি বলিলেন যে, মাকে তিনি সান্ত্বনা দিবেন, আমাদের বাড়ীর সমস্ত দেখাশুনা করিবেন। তাঁহার ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়া আমি এই প্রবাসের কষ্টময় দিনগুলি যতদূর সম্ভব মধুর করিবার চেষ্টা করিতাম। আজ যখন তিনিই ব্যস্ত হইয়া আমায় খবর দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন বুঝিলাম অসুখ সাংঘাতিক। কেন না, অল্পে তিনি আমায় ব্যস্ত করিতেন না।

শঙ্কায় আমার মুখের ভাব বোধ হয় অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল; পিয়ন বলিল, "বাবু—কুছ্ খারাব্ খবর্?" সেই পোট্টাদেশের লোকটিরও চোখ সহানুভূতিতে স্থির ও সজল হইয়া উঠিয়াছিল! "হাঁ, ভাইকা বেমার", বলিয়া আমি বারান্দা হইতে নামিবার উপক্রম করিলাম। পিয়নের কথা অগ্রাহ্য করিয়াই সেই বৃষ্টির মধ্যে সাহেবের কুঠির দিকে ছুটিলাম—ছুটির জন্য! টেলিগ্রাফ দেখাইয়া যখন সাহেবকে বলিলাম যে, ইহাদের জন্যই এতদূরে গোলামী করিতে আসিয়াছি, ও ইহজগতে ইহারাই আমার সর্ব্বস্ব, তখন তিনি বিনা ওজরেই ছুটি দিয়া, যাবার সময় সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিলেন "Cheer up Babu, and God be with you." ছুটি পাইয়া পাগলের মত আবার পথে নামিলাম। তখনো বৃষ্টি থামে নাই।

দশটার ট্রেণে যাইব বলিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে পা দিয়াছি, এমন সময় চাকর বলিল, "বাবু, ও-বাড়ীর মা একবার ডাকলেন।"......আমি যে ঘরখানি ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহা একটি বিধবার। তাঁর একটি ছেলে ও মেয়ে লইয়া তিনি রাঁচিতে থাকিতেন, ও অন্য একটি ছেলে পাটনায় কাজ করিত। স্বামীর ভিটা বলিয়া ও খরচের সুবিধা বলিয়া তিনি রাঁচিতেই বাস করিতেন। বাড়ীভাড়ার সামান্য টাকা, ও পাটনার পুত্রের নিকট হইতে যাহা আসিত, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্বামীর স্মৃতি-বিজড়িত বাড়ীটিতে থাকিতেন। ইনি আমায় মায়ের ন্যায় স্নেহ-যত্ন করিতেন।......আজ আমি হঠাৎ চলিয়া যাইতেছি বলিয়া হয় ত তিনি দেখা করিতে ডাকিয়াছেন, এই ভাবিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু গিয়া দেখি, তিনি একখানি পত্র হাতে করিয়া কাঁদিতেছেন। আমায় দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা এই দেখ, পাটনা থেকে মনোজ আমায় চিঠি দিয়েছে যে, তার হঠাৎ খুব অসুখ করেছে। সে শয্যাগত! অভাগীর যে রকম কপাল, তাতে কখন যে কি ঘটে জানি না। তুমি বাবা আমায় পাটনায় রেখে আসবে চল। আমি ত একলা যেতে পারব না, আর আমার কে-ই বা আছে?" তখন আমার অবস্থা তাঁকে বুঝাইয়া বলিলাম; কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায়, আমি তাঁহাকে পাটনায় পৌঁছাইয়া দিয়াই সেই দিনই চলিয়া আসিব ঠিক হইল। এক সঙ্গে, সেই রাত্রেই দশটার গাড়ীতে আমরা রাঁচি পরিত্যাগ করিলাম।......

বাদলের কালো মেঘে চাঁদ লুকাইয়া ছিল,—আবছায়ায় রাতটি আরো ভয়ানক মনে হইতে লাগিল। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছিল। গাছের পাতায় পাতায় বর্ষার জল ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। যেন জলে ভেজা সেই তরুদের শত শত চক্ষু হইতে নীরব অশ্রু অবিরল স্রোতে ঝরিতেছিল! প্রকৃতি স্তব্ধা, মসীময়ী। অন্ধকার শালবন ও বন্ধুর পার্ব্বত্য-ভূমির উপর দিয়া ছোটগাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে ছুটিতে লাগিল! কে জানিত যে, বিষাদময় চিত্রের মধ্য দিয়া অধিকতর বিষাদের দিকে ছুটিতেছিলাম!

এই সময়ে আমার শীত করিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিলাম, ও কিছু নয়, বাদুলা হাওয়ায় অমন শীত করিয়াই থাকে! কিন্তু যখন জানালা তুলিয়া দিয়া, গায়ে কাপড় জড়াইয়াও শীত ভাঙিল না, তখন বুঝিলাম জ্বর আসিয়াছে! আমার সহযাত্রী রাঁচির মা-টিকে আর উহা জানাইয়া ব্যস্ত করা উচিত মনে করিলাম না। সুতরাং সেই অবস্থাতেই রহিলাম। তার পর দিন সকালে পাটনায় তাঁহাকে মনোজের নিকট রাখিয়া আমি দেশে রওনা হইলাম।

* * * *

যখন ট্রেণ হইতে নামিয়া গ্রামের দিকে চলিতেছিলাম,

পা যেন আর তখন আমায় বহিতে পারিতেছিল না। একে রাত্রি জাগরণ ও পরিশ্রম যথেষ্টই হইয়াছিল; তার উপর, গায়ে কত ডিগ্রি জর তা কে বলিবে? অবশ, ক্লান্ত দেহ, অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া গ্রামের দিকে চলিলাম। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেই শুনিলাম, "বল হরি—হরিবোল!" সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক আমার দাদাকে খাটে করিয়া লইয়া পথে বাহির হইল। অচেতন জড়ের মত সমস্ত স্থির হইয়া দেখিলাম। হঠাৎ ভীড় হইতে সতীশমামা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "বাবা, এত দেরী হল কেন? আমার 'তার' সময়ে পৌঁছে থাকলে, তোমার ত কাল আস্‌বার কথা! ভাইটিকে আর দেখতে পেলে না!" আমি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম "মামা, আমি যে আমার এক বিপন্ন প্রতিবেশিনীর উপকার করতে গিয়ে এই দেরী করে ফেলেছি—তাঁকে আমি 'মা' বলি।" সতীশমামার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। ধীরে, গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন "বাবা, তোমার বড় দুঃসময় চলেছে, মনের বল হারিয়ো না—দৃঢ় হও; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!"

"চলুন মামা, এ কাজটা শেষ করে ফেলি।" বলিয়া শ্মশান পর্য্যন্ত আমি আমার ভাইয়ের অনুগমন করিলাম। ......জর-গায়েই সকলের মানা সত্বেও স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সতীশমামা আসিলেন। আমি সদরে পা দিয়াই কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিলাম "মা!"—প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল "মা—আ—আ"! আবার ডাকিলাম; কেহ উত্তর দিল না। তখন সতীশমামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মামা, মা কোথা?" উত্তরে তিনি নীরবে উর্দ্ধ দিকে অঙ্গুলি দেখাইলেন। তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। সতীশমামাও ছোট ছেলের মত আমায় বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটু স্থির হইয়া শেষে তিনি বলিলেন—"বাবা, তোর মা যখন স্বর্গে গেলেন, তখন আমি তোকে খবর দি নাই—নরেশকে দিয়েই তাঁর শ্রাদ্ধ শেষ করাই। জানতাম, তা হলে কার বলে তুই টিকে থাকবি? তাই তোকে গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে আসতে দি নাই। কিন্তু ভগবান যখন তোর ভাইটিকেও নিতে এলেন, তখন দেখলাম যে, আর তোকে ফাঁকি দিতে তিনি দেবেন না। ভেবেছিলাম, তুই এলে নিজ মুখেই তোর মায়ের খবর দেবো। তোর ভাইকে প্রাণের মত ভালবাসতাম, এক দিনের তরেও তাকে মায়ের অভাব বুঝতে দি নাই; কিন্তু এত কোরেও তাকে বাঁধ্‌তে পারলাম না রে!" বলিয়া তিনি আবার কাঁদিয়া উঠিলেন।

সময় কাটেই—সে রাতও কাটিল। তার পরদিন সকালে সতীশ মামার পায়ের ধূলা ও সম্মতি লইয়া পাটনায় রওয়ানা হইলাম।

উদ্‌ভ্রান্তের মত যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখন বাদলের কালো মেঘ ঘন ভাবে সন্ধ্যাকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কড়া নাড়িতেই মনোজের ছোট ভাই কপাট খুলিয়া দিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, মাটিতে শূন্য শয্যার পার্শ্বে শীর্ণ, মলিন মুখে তাহার জননী বসিয়া! আমায় দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন, "বাবা, আমার মনোজ যে আর নাই!" প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারণ করিতে যেন বিধবার একএকখানি বুকের পাঁজর ভাঙিয়া যাইতেছিল। আমিও আর থাকিতে না পারিয়া তাঁর পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িয়া বলিলাম—"আমারো মা, ভাই, যে এক সঙ্গে আমাকে ফাঁকি দিয়েছে।"

তাঁহার চক্ষের অশ্রু শুকাইয়া আসিল! করুণাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি কর্‌বি বাবা, আয়, পুত্রহীনার কোলে উঠে আয়,—আমিই তোর আজ থেকে মা হলাম।"

সন্ধ্যার সেই করুণ অন্ধকারে যেন আবার মাতৃমুখ দেখিতে পাইলাম!

চঞ্চল চল চরণ ভঙ্গে উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে
ফুটুক হাস্য সরস অধরে ছুটুক ভাতি নয়নে।— —দ্বিজেন্দ্রলাল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

শোক-সংবাদ

৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু

বিগত ৩১শে ভাদ্র মঙ্গলবার মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পুত্র-কন্যার বিয়োগ-বেদনা ভুলিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এ বৎসর যেন মহাকালের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইয়াছে—বাছিয়া বাছিয়া বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন সকল চলিয়া যাইতেছেন। এই সেদিন সার আশুতোষ চৌধুরী গেলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গেই গেলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; তাহার পরই গেলেন মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর; তার পর কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই ভূপেন্দ্রনাথ গেলেন। স্বদেশী যুগে ভূপেন্দ্রনাথ সার সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেশবাসীর হৃদয়ে যে সঞ্জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও সকলের স্মৃতিপথে জাগরুক আছে। ১৯১৪ অব্দে মাদ্রাজ কন্‌গ্রেসের সভাপতি রূপে তিনি স্বাধীনতার যে মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, অন্তরীণের বিরুদ্ধে যে জ্বলন্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও কেহ ভুলিয়া যান নাই। তাহার পর বিলাতের ভারত-সভার সদস্য রূপে এদেশে সুসংস্কৃত শাসন-বিধি প্রচলনের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও সকলের মনে আছে। বঙ্গের লাট পরিষদের সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্‌সেলর হইয়াও অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া নিরাশ হৃদয়ে কর্ম্মত্যাগ করেন। ভূপেন্দ্রনাথ মধ্যপন্থী দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহাকে সকলেই বিশেষ সম্মান করিতেন। সামাজিক হিসাবে তিনি বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এমন অমায়িক ব্যবহার, এমন দয়াপ্রবণ-হৃদয় ব্যক্তি ক্রমেই দুর্লভ হইতেছে। আমরা পরলোকগত বসু মহাশয়ের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনগণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

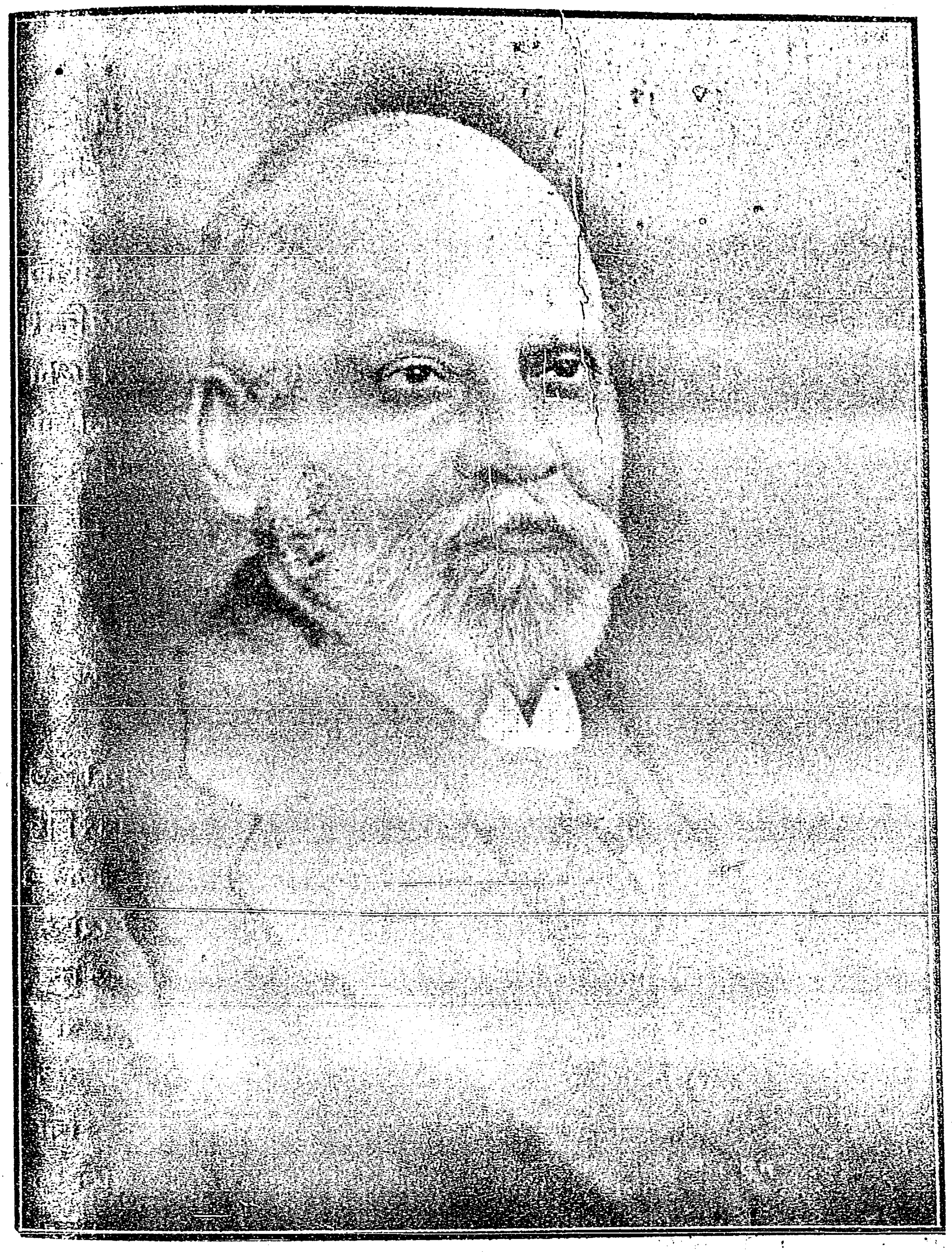

৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু

য়ীহুদী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

(১)

নিস্তব্ধ মরুভূমি-পারে সূর্য্য ডুবে গেল। প্রাচীন ও অপরিচ্ছন্ন সহরটার মাথায় ধূলি ও সন্ধ্যার সোণালি আলোর আঁজি দেওয়া একখানা ওড়না ধীরে বিছিয়ে যাচ্ছে।

"সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, আজকের মতন যাই।"

"রোজই এমনি কোরে চলে যাবে?" বোলে জুবেদা তার তপ্ত কোমল হাত দুখানি আমার কাঁধের ওপর রেখে বুকের কাছে আরও সরে এল।

"কিন্তু না গিয়ে উপায় কি?"

"রাতটাও যাতে থাকতে পার তার কি উপায় হল?"

"চেষ্টা কোরছি—এমনি কোরে আর বিদায় নিতে হবে না বেশী দিন।"

এ কথায় তার ভরাট দীর্ঘ দেহটা আনন্দে ঢেউখেলে উঠ্‌ল। সে পদ্মের মতন তার সজীব মুখখানাকে আমার ঠোঁটের দিকে তুলে ধরলে।

কিছুক্ষণ পরে যখন জুবেদাকে ছেড়ে বোগদাদের ধূলোভরা পথ দিয়ে আমাদের ছাউনির দিকে চলেছি, ততক্ষণে সন্ধ্যা একটু ঘোরালো হয়ে এসেছে। মনটা আমার তখন আনন্দে এমন ভরে উঠেছিল যে ইচ্ছে কোরছিল এই গোটা পৃথিবীটাকেই বুকের ভেতর খুব জোরে চেপে ধরি। আর আমার যা কিছু আছে, যদি কেউ এসে চায় ত সব বিলিয়ে দিই। ঠিক সেই সময় একটা ভিখারী আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পকেটে আমার টাকা পাঁচেকের ওপর ছিল। সে হাত পাততেই একটা আধুলি দিয়ে দিলুম।

(২)

টাইগ্রিস নদী এঁকে-বেঁকে মরুপথে পারস্য উপসাগরের দিকে ছুটে চলেছে। তারি সরস তটের একটা খেজুর কুঞ্জে আমাদের ছাউনি। চারিপাশে দিগন্তের কোলে কোলে বিছানো শুষ্ক তপ্ত বিজন মরুভূমি। আমাদের ছাউনি থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ছেলেবেলায় গল্পে শোনা এই বোগদাদ নগরী।

প্রায় আট মাস হয়ে গেছে আমরা এখানে এসেছি। এখানকার মতন জীবন্ত সৌন্দর্য্যের এমন প্রাচুর্য্য ও নিদারুণ অপচয় আর কোথাও দেখিনি। হয় ত মরুভূমি বোলেই এটা সম্ভব। এই আট মাসে এদের ভাষাটাকে এক রকম দুরস্ত কোরে নিয়ে, সৈনিকের নিয়ম ও নিষেধকে লঙ্ঘন কোরে, জুবেদার সঙ্গে গোপনে মিশে গেলাম। প্রতি সন্ধ্যায়ই তাকে এমনি কোরে ছেড়ে চলে আস্‌তে হয়। তার কারণ এরা আমাদের শত্রু। এদের সঙ্গে, বিশেষতঃ এই গোলাপগুলির সঙ্গে আমাদের মিলন একেবারে নিষিদ্ধ। বিকেল ছটার পর সারা সহরে একটী আলো জ্বল্‌তে পাবে না, বা কারুর পথ দিয়ে চলবার হুকুম নেই! অন্ধকার রাতের মতন একটা দুর্ভেদ্য রহস্য নিয়েই অপরিচ্ছন্ন সহরটা পড়ে থাকে।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। তাম্বুর পর্দ্দার ফাঁকে তারাভরা আকাশখানা ঝিকমিকিয়ে উঠ্‌ল। তার তলে ঘুমন্ত অসাড় সহরটার অস্পষ্ট ছায়া দেখ্‌তে পেলুম। মনে হ'ল, যেমন কোরেই হোক, এই সৈনিকের পোষাক খসিয়ে ফেলে, কেরাণীগিরিতে ঢুকতেই হবে। না হলে জুবেদাকে কিছুতেই একেবারে আপনার কোরে পেতে পারি না। কোন্ দিন রক্তে লাল, কামানের নির্ঘোষ ও ধূমাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রের মৃত্যু-কোলাহলে আমার কণ্ঠটি চিরদিনের মতন ডুবে যাবে, কে জানে!

পর দিন ঘুম ভাঙ্গতেই মতলব ঠাউরাতে লাগলুম কি কোরে আমার কাযটা শেষ করা যায়। যারা সৈনিক-পদ ছেড়ে কেরাণীগিরিতে গিয়ে যোগ দিয়েছিল, তাদের কাছে পরামর্শ চাইলুম। কিন্তু তেমন কোন আশা কোথাও পেলুম না। তবুও নিরাশ না হয়ে চেষ্টা কোরতে লাগলুম।

সেদিনও জুবেদা আমায় জিজ্ঞাসা কোরলে—

"কতদূর?"

"ব্যস্ত কি?" কথাটা হয় ত নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বল্লুম।

"না, এরকম কোরে চলবে না!" হঠাৎ তার গোলাপ-রাঙ্গা নরম গাল দুখানির ওপর দিয়ে চোখের জল নেমে এল। তার জলে-ভরা সরল চোখ দুটোতে চুমো দিয়ে, জল মুছিয়ে শান্ত করবার ছলে বল্লুম—"এ বাড়ীটা কিন্তু আমাদের ছাড়তেই হবে—"

"কেন, কোথায় যাবে?"

"ঐ যে রাস্তার শেষে নদীর দিকের বাড়ীটা—ঐটে আমরা নেব—কি বল?"

"বেশ ত; কিন্তু দেরী কোরছ কেন?"

"তবে এস আমাদের বিয়েটা হয়ে থাক্—"

"এমন নয়; কাযটা তোমার আগে শেষ হোক্—" কথাটা শেষ না কোরেই সে আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে চাইলে। আমার একটা যায়গায় কেমন ব্যথা দিচ্ছে—এই জন্যে যে, জুবেদার কাছে আমি অকপট হতে পারিনি। অর্থাৎ আধি ক্রীশ্চান না হয়েও নিজেকে তাই বোলে পরিচয় দিতে বর্ত্তমানে খুবই বাধ্য।

সেদিন আসবার সময় আমারও তাকে ছেড়ে আস্‌তে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন তার সঙ্গে সেই শেষ দেখা। তাই তাকে বুকের ভেতর নিবিড় কোরে ধরেও স্বোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না! আর এ ভাবটা দিন কয়েক সারা মন জুড়ে লেগে রইল।

কিন্তু যখন এ মিথ্যা উদ্বেগের কোন কারণই আর আমাদের চোখে পড়ল না, আমরা দুজনে বেশ শান্ত হয়ে উঠলুম। দিনগুলি বেশ ভরপুর সুখে কেটে যেতে লাগল!

(৩)

হঠাৎ এক দিন তাম্বুতে ফিরে গিয়ে শুন্‌লুম, পর দিন ভোরে আমাদের সেখান থেকে যাত্রা কোরতে হবে। কোথায়, এক ছাড়া—তা আর কেউ বল্‌তে পারে না। তবে খুব সম্ভব যেখানে লড়াই হচ্ছে সেইদিকে।

বিছানাটার ওপর চুপ কোরে বসে পড়লুম! বোগদাদকে, জুবেদাকে ছেড়ে যেতে হবে?

কারুর সঙ্গে ভাল কোরে কথা না বলে রাতখানাকে একরকম জেগেই কাটিয়ে দিলুম।

পর দিন ভোর হতে না হতে চারিদিকে সাজ সাজ! এতদিনকার এতবড় একটা ছাউনি এক নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। মরুভূমির ওপার থেকে সূর্য্য উঠ্‌তে না উঠ্‌তে আমরা সবাই প্রস্তুত। তার পর পথের লাল ধূলো উড়িয়ে আধঘুমন্ত সহরটার বুকের ভেতর দিয়ে সারে সারে আমরা চলতে লাগলুম।

জুবেদাদের বাড়ীর নীচে দিয়ে চলেছি। হঠাৎ তাদের দোতলার একটা জানালা খুলে গেল। চেয়ে দেখলুম—জুবেদার ঘুম-জড়ান মুখখানা তার ভেতর থেকে ভেসে উঠেছে। চোখোচোখি হতেই আমি ইসারায় জানিয়ে দিলুম—বিদায়! সে যেন কেমন বিস্মিত হয়ে উঠ্‌ল। তার পর ম্লান মুখে বিদায়ের বাণী নিয়ে আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল!

(৪)

একটা মাস চলে গেছে। বোগদাদ থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। কিন্তু কোথায় এসেছি, জুবেদা তা জানে না; তাকে জানাবারও কোন উপায়ই তখন পাইনি।

এক দিন সন্ধ্যা-বেলা বসে বসে ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ মনে হ'ল—যদি পালিয়ে যাই, দূরে—টাইগ্রিস পার হয়ে মরুভূমিকে পেছনে ফেলে রেখে পাহাড় পথে পথে জুবেদাকে সঙ্গে নিয়ে? ধরা পড়লে আমার শাস্তি হবে; কিন্তু না পালিয়ে এখানে থেকে শান্তির কম্‌তি ত কিছু হচ্ছে না! কার জন্যে আমি মরতে চলেছি? আমার প্রাণ দিলে কার গৌরব বাড়বে? আমার দেশের? আমার দেশ ত ঐ বোগদাদ, যেখানে জুবেদা থাকে! কিন্তু মন কিছুতেই পালিয়ে যেতে সায় দিলে না; আবার শান্তও হল না। সেইদিন থেকেই আমি পথঘাটের সব সন্ধান নিতে লাগলুম।

একজন রুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। পর দিন তার সঙ্গে দেখা হতেই কথার ছলে পথঘাটের খবর নিতে লাগলুম। সে তার দেশের এমন বর্ণনা কোরলে—বিশেষতঃ গাঢ় নীল আকাশ-ছোঁয়া তুষারে ঢাকা ফুটফুটে সাদা ককেসাস পাহাড়মালা, ও তারি গায়ে শালের মতন জড়ান, পায়ের তলে কার্পেটের মতন বিছান সবুজ ও গভীর বনের এমনি ছবি এঁকে আমার চোখের সামনে ধরলে যে, আমি সেখানে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। সে আরও বল্লে যে, পাহাড়ের কোল-ঘেঁসা

অতবড় নীল সমুদ্রটা রয়েছে—তার কূলেও ত অনেকে আমারি মতন এখান থেকে গিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে বাস করে। বনের হরিণ ও পাখী শীকার কোরে, সমুদ্রের নানান্ রকম ঝিনুক ও শামুক বিক্রী কোরে, সুখে স্বাধীন ভাবে দিন কাটায়।

"কিন্তু আমি যে সেখানে গিয়ে বাস কোরতে চাচ্ছি—এ কথা তুমি বলছ যে ?"

"নাও হতে পারে—" বোলে সে ঠোঁটের কোলে একটা দুষ্টুমির হাসি নিয়ে চলে গেল। একটু বিস্মিত হয়ে পড়লুম ! আমার মনের কথাটা লোকটা কি কোরে জান্‌তে পারলে ? মনে হ'ল, হয় ত সে নিজেও এমনি ধরণের কায অনেকবার কোরেছে বা অন্য লোককে কোরতে দেখেছে। কাযেই ওর কাছ থেকে আমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

তার পাঁচ দিন পরে দিনের আলো ফুটতে না ফুট্‌তে, রাইফেলটাকে ঘাড়ে ফেলে, টাকা-কড়ি যা ছিল সব সঙ্গে নিয়ে, বোগদাদের দিকে যাত্রা কোরলুম। ধরা পড়বার ভয়ে সৈনিকের পোষাকটা খসিয়ে আরবীর বেশে চলেছি।

আমাদের নৌকাখানা টাইগ্রীসের খরস্রোতে দু'দিন ছুটে চলেছে। নদীর দুটি তীরে, খুব দূরে দূরে ছোট ছোট খেজুর-কুঞ্জ, লম্বা লম্বা মন্দিরের মতন "তুঁত" ফলের গাছ। তারি ছায়ায় কোথাও কোথাও সুস্থ কুসুম-কলির মতন দু'একটা আরবী কিশোরী একলাটি মেষ চরাচ্ছে ! রবি-কর-তপ্ত মরুস্থলীর শুষ্ক বালি উড়িয়ে সারাদিন ধরে বাতাস্ হাহা কোরে ছুটে চল্‌ছে। আমি খুব সাবধানে চলেছি। কেন না এই নদীটির তীরে তীরে পাহারা।

আমি ভাবছিলাম—সেই দূর তুষারে-সাদা ককেসাসের পায়ের তলায় কৃষ্ণসাগরের তটে বনপ্রান্তে জুবেদা আর আমি কত সুখে দিন কাটাচ্ছি ! সে সুখের আর সীমা নেই ! দুঃখটাও তার পায়ে এসে ঠেকে হাসির ঢেউ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ! সেটা যেন আমাদের প্রেমটাকে আরও গাঢ় কোরে তুল্‌ছে। হঠাৎ আমার অজানিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—জুবেদা ! নৌকাওয়ালারা একটু চম্‌কে উঠ্‌ল ; আমিও অপ্রস্তুত হয়ে নদীর ওপর দিয়ে পাল তুলে একখানা বিপরীতগামী নৌকার দিকে চোখ ফেরালুম। দেখলুম, একটা য়ীহুদী পুরুষের পাশে বসে একটি তরুণী য়ীহুদী আমাদের নৌকার দিকে, বিশেষ কোরে আমায় দেখে, মুখটা একটু ঢেকে, নৌকার আচ্ছাদনীর আড়ালে গিয়ে বসল। মেয়েটার লজ্জা দেখে আমার একটু হাসি এল ; আমিও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসলুম। কিছুক্ষণ পরে ফিরে দেখলুম—নদীর বাঁকের আড়ালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে একজন সৈনিক হাত তুলে আমাদের থাম্‌তে বল্লে। আমি নৌকোওয়ালাকে চালাতে বলে রাইফেলটা হাতে তুলে নিলুম। প্রাণ দেব তবু ধরা কিছুতেই দেব না। সে লোকটাও তার রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলে, কিন্তু খুব কাতর সুরে বল্লে—"বড় বিপন্ন।" অবশেষে নৌকো ভিড়িয়ে, সন্দেহ সত্ত্বেও তাকে তুলে নিলুম। কিছুদূর গিয়ে দুজনের বেশ ভাব হয়ে গেল। শুনলুম, সেও আমারই মতন পলাতক। বোগদাদের আগেই নেমে যাবে—তার বেশী আর কিছু বল্লে না।

পর দিন—প্রায় বেলা শেষাশেষি—বোগদাদের সেই খেজুর-কুঞ্জ চোখে পড়ল ! আমরা দুজনেই সেখানে নৌকো থেকে নেমে পড়লুম। সে একটা আরব পল্লীর দিকে চলে গেল—আমি ভয় ও আশা-আনন্দ বুকে নিয়ে বোগদাদের দিকে ছুট্‌তে লাগলুম।

সহরে ঢুকে কোন কিছুর দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা এসে তাদের বাড়ীর ভেতর দাঁড়িয়ে ডাকলুম—

"জুবেদা—"

তার ভাই বেরিয়ে এল। আমায় দেখে খুবই একটু বিস্মিত হয়ে একটু পরে বল্লে—

"জুবেদা তার স্বামীর সঙ্গে তিন দিন আগে টাইগ্রিস দিয়ে ইউরোপ যাত্রা কোরেছে।"

"স্বামী—? ইউরোপ—?" আমি অবসন্ন দেহে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালুম। তারা দুটিতে আজ অফুরন্ত সুখের আশায় পথে কেবলই চলেছে—আর আমার মাথার ওপর শাস্তির কঠিন উদ্যত দণ্ড !

নব-বিধান

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৫)

কথাটাকে আর অধিক ঘাঁটা-ঘাঁটি না করিয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের ক্রোধ ও উত্তেজনাকে শান্ত হইবার পাঁচ-সাত দিন সময় দিয়া আর একদিন ফিরিয়া আসিয়া তখন ভবানীপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, ইহাই স্থির করিয়া সে উমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু সপ্তাহ গত না হইতেই ছাপরা কোর্টে হঠাৎ একটা মকদ্দমা পাওয়ায় তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে পাত্রী-পক্ষ ও পাত্র-পক্ষের তরফে বিভাকে আশা দিয়া গেল যে, কেস যতটা হোপ্‌লেস মনে হইতেছে, বস্তুতঃ, তাহা নয়। বরঞ্চ, মাছ চারের দিকেই ঝুঁকিয়াছে, হঠাৎ টোপ গিলিয়া ফেলা কিছুই বিচিত্র নয়।

অনেকদিন পরে স্ত্রীর সহিত আজ তাহার সদ্ভাবে বাক্যালাপ হইল। উমার মুখে বিভা কিছু কিছু ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, আমি মনে করতুম ঊষা বৌদিদির তুমি পরম বন্ধু, তুমি যে আবার দাদার বিয়ের উদ্যোগ করতে পারো, মাসখানেক আগে এ কথা আমি ভাব্‌তেও পারতুমনা।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, মাসখানেক পূর্ব্বে কি আমিই ভাবতে পারতুম ? কিন্তু এখন শুধু ভাবা নয়, উচিত বলেই মনে হয়। ঊষা বৌঠাকরুণের বন্ধু আমি এখনও, এবং চিরদিন তাঁর শুভ কামনাই কোর্‌ব, কিন্তু যা' হবার নয়, হয়ে লাভ নেই, তার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরেই বা ফল কি !

বিভা অতি-বিজ্ঞের চাপা-হাসি দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, তোমরা পুরুষ মানুষ বলেই বোধ হয় বৌ-ঠাকরুণটিকে বুঝ্‌তে এত দেরি হল, আমি কিন্তু দেখ্‌বামাত্রই তাঁকে চিনেছিলুম। তাঁকে নিয়ে আমরা চল্‌তে পারতুমনা।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, সে তো চোখেই দেখ্‌তে পেলুম বিভা, তাঁকে সরে পড়তে হল। এবং, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে বোঝবার পার্থক্য ঘটেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। একটু অন্য রকমের হলে আজ জিনিসটা কি দাঁড়াতো এখন সে আলোচনা বৃথা, তবে, এ কথা তোমার মানি, ভুল আমার একটু হয়েছিল।

বিভা কহিল, যাক্, তা'হলেই হ'ল। জপ-তপ আর হিঁদুয়ানীর সুখ্যাতিতে হঠাৎ যে রকম মেতে উঠেছিলে, আমার ত ভয় হয়েছিল। আমরাও মুসলমান খৃষ্টান নই, কিন্তু নিজে ছাড়া সবাই ছোট, হাতে খেলে-ছুঁলেই জাত যাবে এ দর্প কেন ? শুধু ভট্‌চায্যিগিরি ছাড়া আর সব রাস্তাই নরকে যাবার, এ ধারণা তাঁর বাপের বাড়ীতে চল্‌তে পারে, কিন্তু এখানে পারেনা। আর, পারেনা বলেই ত স্বামীর আশ্রয়ে তাঁর স্থান হলনা।

কথাটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। এমন করিয়া সত্য-মিথ্যায় জড়ানো বলিয়া ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিলনা।

এই সময়ে উমা ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা ?

বিভা তাহার নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, শুধু আপনার জাত বাঁচিয়ে যাওয়াটাই কি বৌদিদির সবচেয়ে বড় হল ? ধর, তোমার নালিশটা যদি সত্যি হয়, আমার জন্যে দাদা যদি তাঁকে অপমান করেই থাকেন, তেম্‌নি অপমান কি তাঁর জন্যে তুমি আমাকে করনি ? তাই বলে কি তোমাকে ছেড়ে আমি বাপের বাড়ী চলে যাবো ? এই কি তুমি বল ?

ক্ষেত্রমোহন কহিল, না, তা আমি বলিনে।

বিভা কহিল, বল্‌তে পারোনা আমি জানি। উমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার দাদা হঠাৎ একটা নতুন জিনিসের বাইরেটা দেখেই মজে গিয়েছিলেন। হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামির শিক্ষা আমরা পাইনি, কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে যা' পেয়েছিলুম সে ঢের ভদ্র, ঢের সত্য। একটু হাসিয়া কহিল, তোমার দাদার ভারি ইচ্ছে ছিল বৌ-ঠাকরুণের কাছে থেকে তুমি অনেক কিছু শেখো।

বসে শোন্‌বার এখন সময় নেই ভাই, কিন্তু কি-কি তাঁর কাছে শিখ্‌লে আর কি-ই বা বাকি রয়ে গেল, তোমার দাদাকে না হয় শোনাও। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছোট ভগিনীর সম্মুখে স্ত্রীর হাতের খোঁচা তাহাকে বেশি করিয়াই বিঁধিল, কিন্তু জবাব দিতে পারিলনা। হিন্দুয়ানীর অনেকখানি হইতেই তাহারা ভ্রষ্ট, কিন্তু মেয়েদের আচার-নিষ্ঠা, সাবেক দিনের জীবন-যাত্রার ধারা কল্পনায় তাহাকে অতিশয় আকর্ষণ করিত। এই জন্যই চোখের উপরে অকস্মাৎ ঊষাকে পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারই আচরণে আজ সকলের কাছে তাহার মাথা হেঁট হইয়া গেছে। এই বধূটিকেই কেন্দ্র করিয়া সে যে-শিক্ষা ও সংস্কারের কথা আত্মীয় পরিজন মধ্যে মেয়েদের কাছে সগর্ব্বে বার বার বলিত, সেইখানেই তাহার অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। নিজের জন্য ঊষা নিজেই শুধু দায়ী, তাহার অন্যায় আর কিছুই স্পর্শ করে নাই,—করিতেই পারেনা এই কথাটা সে জোর দিয়া বলিতে চাহিলেও মুখে তাহার বাধিয়া যাইত। তাই স্ত্রী চলিয়া গেলে সে উমার কাছে কতকটা জবাব-দিহির মতই সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, গোঁড়ামি সকল জিনিসেরই মন্দ, এ আমি অস্বীকার করিনে উমা,—হিঁদুয়ানীর ওই গলদটাই ঘুচানো চাই,—কিন্তু আমরা যে আরও মন্দ এ কথা অস্বীকার করলে ত আরও অন্যায় হবে।

দাদা ও বৌদিদির বাদ্‌-বিতণ্ডার আলোচনায় উমা চিরদিনই মৌন হইয়া থাকিত, বিভার অনুপস্থিতিতেও তাই এখনও নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

সেই রাত্রে ছাপ্‌রা যাইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রমোহন বিভাকে ডাকিয়া কহিল, আমার ফির্‌তে বোধ করি চার-পাঁচ দিন দেরি হবে, ইতিমধ্যে ভবানীপুরে ওঁদের কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়, বোলো, শৈলেশকে সম্মত করতে আমি পারবো।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, বৌ-ঠাকরুণ তাহলে আর ফিরবেননা ?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, না। যতই ভাব্‌চি, মনে হচ্চে শৈলেশের চেয়ে তাঁর অপরাধই বেশি। তুমি ঠিক কথাই বলেচ। যে শিক্ষায় মানুষকে এত বড় সঙ্কীর্ণ এবং স্বার্থপর ক'রে তোলে, সে শিক্ষার মূল্য এককালে যতই থাক্‌ এখন আর নেই। অন্ততঃ, আমাদের মধ্যে তার আর পুনঃ প্রচলনের আবশ্যকতা নেই। তাই বটে। বৌ-ঠাকরুণের আচার-বিচারের বিড়ম্বনাই ছিল, বস্তু কিছু ছিলনা। থাকলে গৃহাশ্রয় ত্যাগ করতেননা। আচ্ছা, চল্‌লুম। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া মোটরে গিয়া উপবেশন করিল।

মফস্বলের মকদ্দমা সারিয়া কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার পাঁচদিনের বদলে দিন দশেক বিলম্ব হইয়া গেল। বাটীতে পা দিয়া প্রথমেই দেখা মিলিল উমার। সেই খবর দিল যে, দিন দুই পূর্ব্বে মাস ছয়েকের ছুটি লইয়া শৈলেশ বাবু আবার এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছেন। এবং সোমেনকেও স্কুল ছাড়াইয়া এবার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

এমন হঠাৎ যে ?

উমা কহিল, কি জানি। সোমেনকে নিতে এসেছিলেন, বল্‌লেন, শরীর ভাল নয়।

বিভা ঘরে প্রবেশ করিতে তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিল, শরীর ভাল না থাক্‌বারই কথা, কিন্তু সারবার ব্যবস্থা ও নয়। আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উমা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

(১৬)

আরও পাঁচটা জুনিয়র ব্যারিষ্টারের যে ভাবে দিন কাটে ক্ষেত্রমোহনের দিনও তেম্‌নি কাটিয়া যাইতে লাগিল। হাতে টাকার টান্‌ পড়িলে হিঁদুয়ানী ও সাবেক চাল-চলনের অশেষ প্রশংসা করে, আবার অর্থাগম হইলেই চুপ করিয়া যায়,—যেমন চলিতেছিল, তেম্‌নি চলে। শৈলেশের সে বাস্তবিক শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহাকে চিনিত, তাহার মত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষকে দিয়া প্রায় সব কাজই করানো যায়, এই মনে করিয়া সে ভবানীপুর এখনও হাত-ছাড়া করে নাই। তাহাদের এই বলিয়া ভরসা দিত যে, পশ্চিম হইতে ঘুরিয়া আসার যা বিলম্ব। বৌ-ঠাকরুণকে সে এখনও প্রায় তেম্‌নি স্নেহ করে, তেম্‌নি শ্রদ্ধাই প্রায় এখনো তাঁহার প্রতি আছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কাজ নাই। যেখানে থাকুন, সুস্থ

থাকুন, নিরাপদে থাকুন, ধর্ম্ম-জীবনের তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটুক, কিন্তু শৈলেশের গৃহস্থালীর মধ্যে আর নয়। নিজের একটা ভুল এখন প্রায়ই মনে হয়, স্বামীকে ঊষা ভালবাসিতে পারে নাই, পারাও কখনো সম্ভব নয়। ছেলেবেলা হইতে কড়া রকমের আচার-বিচারের ভিতর দিয়া ধাতুটা তাহার কড়া হইয়াই গেছে, সুতরাং ইহকালের চেয়ে পরকালই তাহার বেশি আপনার। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও তাই এত সহজ হইয়াছে। তাহার নিজের মধ্যে যে স্বামী ছিল, ঊষার এই আচরণে সে যেমন ভীত, তেমনি ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার মনে হইত সোমেনকে যে সে এত সত্বর ভালবাসিয়াছিল, সেও কেবল সম্ভবপর হইয়াছিল তাহার কড়া কর্ত্তব্যের দিক দিয়া। সত্যকার স্নেহ নয় বলিয়াই যাবার দিনটিতে তাহার কোথাও কোন টান্‌ লাগে নাই।

এম্‌নি ভাবেই যখন কলিকাতায় ইঁহাদের দিন কাটিতেছিল, তখন মাস দুই পরে সহসা এলাহাবাদ হইতে খবর আসিল যে, সোমেনের এই কচি বয়সেই শৈলেশ তাহার পৈতা দিয়াছে, এবং নিজে এক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। গঙ্গাস্নান একটা দিনের জন্যও পিতা পুত্রের বাদ যাইবার যো নাই, এবং মাছ-মাংস যে পাড়ায় আসে সে পথ দিয়া শৈলেশ হাঁটেনা।

শুনিয়া উমা চুপি-চুপি হাসিতে লাগিল, বিভা কহিল, তামাসাটি কে করলেন ? যোগেশবাবু ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, খবর যোগেশবাবুর কাছ থেকেই এসেছে সত্যি, কিন্তু তামাসা করবার মত ঘনিষ্ঠতা ত তাঁর সঙ্গে নেই।

বিভা কহিল, দাদার বন্ধু ত, দোষ কি ? একটু থামিয়া বলিল, কেন জানো ? বৌদিদির সমস্ত ব্যাপার দাদার কাছেই শুনেছেন, এবং এত লোকের মাঝখানে তুমিই শুধু তাঁর গোঁড়ামির ভক্ত হয়ে উঠেছিলে,—তাই এ রসিকতাটুকু তোমার পরেই হয়েছে। সহাস্যে বলিতে লাগিল, কেস্‌ আরম্ভ করবার মাঝে মাঝে বুদ্ধিটা যদি আমার কাছে নাও ত মকদ্দমা বোধ হয় তোমাকে এত হারতে হয়না। উমা, আজ একটু চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নাও, সাতটার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে কিন্তু লাবণ্য রাগ করবে। তোমার দাদাটিকে আড়ালে ডেকে একটু বলে দিয়ো ভাই, ঠেক্‌লে যেন এখন থেকে বন্দোবস্ত করেন। পয়সা যায়া দেয় তারা খুসি হবে।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। যোগেশবাবুর হঠাৎ ঠাট্টা করার হেতুটা যে বৌদিদি ঠিক অনুমান করিয়াছেন তাহা সে বুঝিল।

ইহার দিন পাঁচ ছয় পরে একখানা মস্ত চিঠি আনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, যোগেশবাবুর বাবার লেখা। বয়স সোত্তর-বায়াত্তর—চাক্ষুশ আলাপ নেই, চিঠি-পত্রেই পরিচয়। লোক কেমন ঠিক জানিনে, তবে এটা ঠিক জানি যে ঠাট্টার সুবাদ আমার সঙ্গে তাঁর নেই।

দীর্ঘ পত্র, বাঙ্‌লায় লেখা। আদ্যোপান্ত বার দুই নিঃশব্দে পড়িয়া বিভা মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি ? তোমাকে ত একবার যেতে হয় ?

কিন্তু আমার ত একমিনিটের সময় নেই।

বিভা কহিল, সে বল্‌লে হবেনা। এ বিপদে আমরা না লেগে আর যাবে কে ? এ চিঠির অর্দ্ধেকও যদি সত্যি হয়, সে যে ঘোরতর বিপদ তাতে ত আর একবিন্দু সন্দেহ নেই !

ক্ষেত্রমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু যাই কি করে ? এবং গেলেই যে বিপদ কাট্‌বে তারই বা ঠিকানা কি !

দুজনে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশের দ্বারা সমস্তই সম্ভব। মনের জোর বলে যে বস্তু, সে তার একেবারে নেই। মরুক্‌গে সে, কিন্তু দুঃখ এইটুকু যে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকেও সে বিগ্‌ড়ে তুল্‌চে। যেমন করে পারো এইখানে তোমার বাধা দেওয়া চাই ?

বিভা বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কান্না-কাটি, অভিমান সমস্তই করিতে পারে, কিন্তু ঠেকাইবার সাধ্য তাহার নাই, তাহা সে মনে মনে জানিত। ক্ষেত্রমোহন অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল, কিন্তু একটু জিনিস আমি নিশ্চয় ধরেছি বিভা। ঊষাকে তোমার দাদা সত্যই ভালবেসেছিল। এত ভাল সে সোমেনের মাকে কোনদিন বাসেনি। এ সব হয়ত তারই প্রতিক্রিয়া।

বিভা রাগ করিল। কহিল, তাই, এম্‌নি কোরে তাঁর মন পাবার চেষ্টা করচেন? দেখ, দাদা আমার দুর্ব্বল হতে পারেন, কিন্তু ইতর ন'ন। কারও জন্যেই এই সঙ সাজার ফন্দি তাঁর মাথায় আস্‌বেনা।

এই প্রতিক্রিয়া বস্তুটা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার বিভা তাহার কি জানে? শব্দটা শুধু ক্ষেত্রমোহন বইয়ে পড়িয়াছে; সেও ইহার বিশেষ কিছু জানেনা, তাই স্ত্রীর ক্রোধের প্রত্যুত্তরে সে চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে তর্ক-যুদ্ধ চালাইতে তাহার সাহস হইলনা।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া যাই হোক্ কাজের বেলায় বিভাই জয়ী হইল। স্বামীকে দিন দু'য়ের মধ্যেই কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া এলাহাবাদ রওনা হইতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ তেম্‌নি অপ্রিয়। যোগেশবাবুর বাটীর কাছেই বাসা, কিন্তু, শৈলেশের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সে গুরু-ভাইদের সহিত শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম দর্শনে বৃন্দাবনে গিয়াছে, দেখা হইয়াছে সোমেনের সঙ্গে। তাহার শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মচারীর বেশ, শাস্ত্রসঙ্গত আচার-বিচার, স্থানীয় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আসিয়া সকাল সন্ধ্যায় বোধ করি ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখাইয়া যান—এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমাকে দেখে সে বেচারার দু'চোখ ছল্‌ছল্‌ করতে লাগ্‌লো, তার চেহারা দেখে মনে হল যেন খাবার কষ্টটাই তার বেশি হয়েছে।

এই ছেলেটির প্রতি বিভার এক প্রকারের স্নেহ ছিল, তাহা অত্যন্ত বেশি না হইলেও বিদেশে দুঃখ পাইতেছে শুনিয়া সে সহিতে পারিলনা। তাহার নিজের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তাকে জোর করে নিয়ে এলেনা কেন?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ইচ্ছে যে হয়নি তা' নয়, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম তাতে শেষ পর্য্যন্ত সুফল ফল্‌বেনা! ধর্ম্মের ঝোঁকটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি। শৈলেশ আমাদের ওপর ঢের বেশি বেঁকে যেতো।

বিভা চোখ মুছিয়া কহিল, এত ব্যাপার ঘটেছে জান্‌লে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যেতুম।

(১৭)

চিঠি লেখা-লেখি একপ্রকার বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল, তথাপি কলিকাতায় আত্মীয় বন্ধুমহলে শৈলেশের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কথা প্রচারিত হইতে বাধে নাই। হয়ত বা স্থানে স্থানে বিবরণ একটু ঘোরালো হইয়াই রটিয়াছিল ভবানীপুরে এ সম্বাদ যে গোপন ছিলনা তাহা বলাই বাহুল্য। লজ্জায় বিভা মুখ দেখাইতে পারিতনা, শুধু স্বামীর কাছে সে দম্ভ করিয়া বলিত, দাদা আগে ফিরে আসুন। আমার সুমুখে কি কোরে এ-সব করেন আমি দেখ্‌বো!

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া থাকিতেন। বিভার দ্বারা বিশেষ কিছু যে হইবে তাহা বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু সমাজের সমবেত মরাল প্রেসরের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। দুর্ব্বল-চিত্ত শৈলেশ হয়ত তাহা বেশিদিন ঠেকাইতে পারিবে না, এ ভরসা তিনি করিতেন।

এদিকে শৈলেশ আরও মাস-চারেক ছুটি বাড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাও শেষ হইতে আর মাস দুই বাকি। চাকুরি ছাড়িতে সে পারিবেনা, তাহা নিশ্চয়। গঙ্গাস্নান ও ফোঁটা-তিলক যতই কেননা সে প্রয়াগে বসিয়া করুক, শ্রীগুরু ও গুরু-ভাইয়ের দল এ কুমৎলব তাহাকে প্রাণ গেলেও দিবেনা। তারপরে ফিরিয়া আসিলে একবার লড়াই করিয়া দেখিতে হইবে।

সেদিন চা খাইতে বসিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এবার কিন্তু ঊষা বৌঠাকরুণ এলে তাঁকে তাড়াতাড়ি ভাইকে ডাকিয়ে, আর বাপের বাড়ী পালাবার ফন্দি করতে হবেনা। জপ-তপের মধ্যে দুজনের বনবে।

বিভার মুখ মলিন হইল, জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আসার কথা তুমি শুনেচ নাকি?

না।

বিভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, পাড়াগাঁয়ে শুনেচি নানারকমের তুক্‌তাক্ আছে। আচ্ছা, তুমি বিশ্বাস কর?

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিল, না। যদিও বা থাকে, তিনি এ সব করবেননা।

কেন করবেননা?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌঠাকরুণের ওপর আমি খুসি নই, তাঁর প্রতি আমার সে শ্রদ্ধাও আর নেই, কিন্তু এই সব হীন কাজ যে তিনি করতেই পারেননা তা' তোমাকে আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি।

বিভা ঠিক বিশ্বাস করিলনা। শুধু ধীরে ধীরে কহিল,

যা ইচ্ছে হোক্, কিন্তু ছেলেটাকে আমি কেড়ে আন্‌বই, তোমাকেও আমি প্রতিজ্ঞা করে বললুম।

বেহারা আসিয়া খবর দিল যে, বন্ধু দুখানা বড় কার্পেট চাহিতে আসিয়াছে। বন্ধু শৈলেশের অনেক দিনের ভৃত্য। বিভা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সে কার্পেট নিয়ে কি করবে? বলিতে বলিতে উভয়েই বাহিরে আসিতেই বন্ধু সেলাম করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল।

কার্পেট হবে কি বন্ধু?

কি জানি মেমসাহেব, গান-বাজনা না কি হবে।

করবে কে?

সাহেবের সঙ্গে তিন-চার জন লোক এসেছে, করবে বোধ হয় তারাই।

দাদা এসেছেন?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশ এসেছে?

বন্ধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কাল রাত্রে সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। কার্পেট লইয়া সে প্রস্থান করিলে দুজনেই নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই দিনটা কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া ক্ষেত্রমোহন পরদিন বিকালে বিভা ও উমাকে সঙ্গে করিয়া এ-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভ্যাসমত নীচের লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পড়িল। দরজার সেই ভারি পর্দ্দাটা নাই, ভিতরের সমস্তই চোখে পড়িল। একটা দিনেই বাড়ীর চেহারা বদ্‌লাইয়া গেছে। বইয়ের আলমারিগুলা আছে বটে, কিন্তু আর কোন আসবাব নাই। মেঝের উপর কম্বল ও তাহাতে ফর্সা জাজিম পাতিয়া জন দুই লোক নধর পরিপুষ্ট দেহের সর্ব্বত্র হরিনামের ছাপ মারিয়া, গলায় মোটা-মোটা তুলসীর মালা পরিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ সাহেব-মেম দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের বিশ্রামে বিঘ্ন না ঘটাইয়া তিনজনে উপরে যাইতেছিলেন, উড়িয়া পাচক-ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়া কহিল, উপরের ঘরে গোঁসাইনি আছেন।

গোঁসাইনিটা কে?

পাচক ঠাকুর চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কোথায়?

উত্তরে সে উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে, ক্ষেত্রমোহন সেইখানে দাঁড়াইয়াই শৈলেশ, শৈলেশ করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। ছুটিয়া আসিল সোমেন। হঠাৎ তাহার বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া, বিভা কাঁদিয়া ফেলিল। পরণে সাদা থান, মাথায় মস্ত টিকি, গলায় তুলসীর মালা; সে দূর হইতে প্রণাম করিল, কিন্তু কাছে আসিল না। উমা ধরিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক্ অ-বেলায় আর ছুঁয়ে কাজ নেই। ও-বেচারাকে হয় ত আবার নাইয়ে দেবে। বাবা কোথায় সোমেন?

সোমেন কহিল, প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেবের কাছে বসে শ্রীভাগবত পড়চেন।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম, শ্রীবাবাকে একবার খবরটা দাও।

তিনি খবর পেয়েছেন, আস্‌ছেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে খড়ম-পায়ে শৈলেশ নীচে আসিল। থান কাপড়, গায়ে জামা, মাথায় একটা সরু-গোছের টিকি ছাড়া বাহিরের চেহারায় তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু ভিতরের দিকে যে অনেক বদল হইয়া গেছে তাহা চক্ষের পলকেই চোখে পড়ে। অত্যন্ত বিনীত ভাব, মৃদু কথা,—উমা ও বিভা প্রণাম করিলে সে দূরে দাঁড়াইয়াই আশীর্ব্বাদ করিল, স্পর্শ করিতে নিকটে আসিল না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাড়ীতে একটু বস্‌বার যায়গাও নেই নাকি হে?

শৈলেশ লজ্জিত ভাবে কহিল, বাইরের ঘরটা নোংড়া হয়ে আছে,—পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তা'হলে এখনকার মত আমরা বিদায় হই। সোমেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এখন চল্‌লুম। আমাদের বোধ করি আর বড় একটা প্রয়োজন হবে না, তবু, বলে যাই, বস্‌বার যায়গা যদি কখনো একটা হয় ত, খবর দিস্ বাবা! চল।

শৈলেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ীতে বিভা কাহারও সহিত একটা কথাও কহিল না, তাহার দুচক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া শুধু জল পড়িতে লাগিল। একটা কথা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া আসিলেন ও-বাড়ীতে তাঁহাদের আর স্থান নাই। দাদা যা'ই কেননা করুক, সোমেনকে সে জোর করিয়া কাড়িয়া আনিবে

বলিয়া বিভা স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। স্নেহের সেই দাম্ভিক উক্তি স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই বার-বার মনে পড়িল, কিন্তু, নিদারুণ লজ্জায় ইহার আভাস পর্য্যন্তও কেহ উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ইঁহার পরে মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কথাটা আত্মীয় ও পরিচিত বন্ধু-সমাজে এমন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে যে, লোকে সত্যের মধ্যেও আর যেন আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। মুখে-মুখে অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া সমস্ত জিনিষটা এমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে যে, কোথাও যাওয়া-আসাও বিভার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, অথচ, কোনদিকে কোন রাস্তাই কাহারও চোখে পড়িতেছে না। ক্ষেত্রমোহন জানিতেন, সংসারে অনেক উত্তেজনাই কালক্রমে ম্লান হইয়া আসে, ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইয়া থাকাই তাহার উপায়, শুধু এই পরকালে লোভের ব্যবসাটাই একবার সুরু হইয়া গেলে আর সহজে থামিতে চাহে না। অনিশ্চিতের পথে এই অত্যন্ত সুনিশ্চিতের আশাই মানুষকে পাগল করিয়া যেন নিরন্তর ঠেলা দিয়া চালাইতে থাকে। ইহার উপরেও প্রচণ্ড বিভীষিকা ঊষা। বন্ধু ও শত্রুভাবে সর্ব্বনাশের বনিয়াদ গাড়িয়া গেছে সে-ই। কোন মতে একটা খবর পাইয়া যদি আসিয়া পড়ে ত অনিষ্টের বাকি কিছু আর থাকিবে না। কেবল বিভাই নয়, তাহার উল্লেখে উমার, এমন কি ক্ষেত্রমোহনেরও আজ-কাল গা জ্বলিতে থাকে। বাস্তবিক, তাহাকে না আনিলে ত এ-বালাই কোন দিনই ঘটার সম্ভাবনা ছিলনা।

আজ রবিবারের সকাল বেলা স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া এই আলোচনাই করিতেছিলেন। সেই অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসার দিন হইতে ইঁহারা সে-মুখোও আর হন নাই, কিন্তু সে-বাড়ীর খবর পাইতে বাকি থাকিত না। গুরু-ভ্রাতার দল অদ্যাবধি নড়িবার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনেন না এবং শ্রীগুরু ও গোঁসাই ঠাকুরাণী উপরের ঘরে তেম্‌নি কায়েম হইয়াই বিরাজ করিতেছেন। সকাল-সন্ধ্যায় নাম-কীর্ত্তন অব্যাহত চলিয়াছে, ভোগাদির ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, এ সকল সম্বাদ বন্ধু জনের মুখে নিয়মিত ভাবেই বিভার কাণে পৌঁছে; কেবল অতিরিক্ত একটা কথা সম্প্রতি শোনা গিয়াছে যে, শ্রীধাম নবদ্বীপে একটা জায়গা লইয়া শৈলেশ গুরুদেবের আশ্রম তৈরি করার সঙ্কল্প করিয়াছে, এবং এই হেতু অনেক টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে।

বিভা মলিন মুখে কহিল, যদি সত্যই হয়, দাদাকে কি একবার বাঁচাবার চেষ্টাও করবে না? ছেলেটা কি চোখের সামনে ভেসেই যাবে?

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কি করতে পারি বল?

বিভা চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া কি হইতে পারে সে তাহার কি জানে?

ক্ষেত্রমোহন সহসা বলিয়া উঠিলেন, সেই পর্য্যন্ত ত আর কখনো যাইনি, আজ চলনা একবার যাই?

বিভার বুকের মধ্যেটা আজ সত্যই কাঁদিতেছিল, তাই বোধ হয় আজ তথায় মান-অভিমানের স্থান হইল না, সহজেই সম্মত হইয়া বলিল, চল।

উমাকে আজ তাহারা সঙ্গে লইল না। এই মেয়েটির সম্মুখে লজ্জার মাত্রাটা আজ আর তাহাদের বাড়াইবার প্রবৃত্তি হইল না। মোটর যখন তাহাদের শৈলেশের বাটীর সুমুখে আসিয়া থামিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গেছে। বাহিরের ঘরটা আজ খোলা, গুরু-ভাই যুগল মেঝের উপরে বসিয়া একটা বড় পুঁটুলি কসিয়া বাঁধিতেছেন। ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, শৈলেশবাবু বাড়ী আছেন?

তাঁহারা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া শেষে উত্তর দিলেন, না, তিনি পরশু গেছেন নবদ্বীপ ধামে।

কবে ফিরবেন?

কাল কিম্বা পরশু সকালে।

বাবুর ছেলে বাড়ীতে আছে?

তাঁহারা উভয়েই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, আছে, এবং তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেলেন।

অতঃপর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুজনের একসঙ্গেই চোখে পড়িল লাইব্রেরি-ঘরের দ্বারে সেই পুরাণো ভারি পর্দ্দাটা আজ আবার ঝুলিতেছে। একটু ফাঁক করিতেই চোখে পড়িল পূর্ব্বের আস্‌বাব-পত্র যথাস্থানে সমস্তই ফিরিয়া আসিয়াছে। বিভা কহিল, ওই দুটো লোককে সরিয়ে দিয়ে দাদা আবার ঘরটার শ্রী ফিরিয়েছেন।

এটুকু সুবুদ্ধিও যে তাঁর আর কখনো হবে আমার আশা ছিল না। কিন্তু বলা তাহার শেষ না হইতেই সহসা পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিতেই উভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌শূন্য হইয়া গেল। সোমেন বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, রবারের একটা বল লুফিতে-লুফিতে আসিতেছে। কোথায় বা মালা, কোথায় বা টিকি, আর কোথায় বা তাহার ব্রহ্মচারীর বেশ। খালি গা, কিন্তু পরণে চমৎকার লালপেড়ে জরি-বসানো ধুতি,—মাথার চুল বাঙ্গালী-ছেলেদের মত পরিপাটি করিয়া ছাঁটা, পায়ে বার্ণিশ-করা পাম্পশু। সে ছুটিয়া আসিয়া বিভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, মা এসেছেন পিসিমা। রান্নাঘরে রাঁধচেন, চল। এই বলিয়া সে টানিতে লাগিল।

বিভা স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মা এসেছেন না সোমেন? তাই ত বলি—

কাল দুপুর-বেলা এসেছেন। চলুন পিসেমশাই রান্নাঘরে।

চল।

তিনজনে রন্ধনশালার সুমুখে আসিতেই ঊষা সাড়া পাইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভা পায়ের জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল। কহিল, কি কাণ্ড হয়েছে দেখ্‌লে বৌদি?

ঊষা হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল। হাসিয়া কহিল, দেখ্‌লুম বই কি ভাই। ছেলেটার আকৃতি দেখে কেঁদে বাঁচিনে। তাড়াতাড়ি মালা-ফালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নাপ্‌তে ডাকিয়ে চুল কেটে দিই, নতুন কাপড়, জামা, জুতো কিনে আনিয়ে পরিয়ে তবে তার পানে চাইতে পারি। আচ্ছা, আপনিই বা কি করছিলেন, বলুন ত? এই বলিয়া সে কটাক্ষে ক্ষেত্রমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল্‌বার তাড়া-হুড়ো নেই, বউ-ঠাক্‌রুণ, ধীরে-সুস্থে সমস্তই বল্‌তে পারবো, এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু খেতে দিন। ভাল কথা, গুরু ভাই দুটি ত দেখ্‌লুম বাইরে বসে পুঁটুলি কস্‌চেন, কিন্তু শ্রীপ্রভুপাদ যুগল-মূর্ত্তির কি কর্‌লেন? ওপরে তাঁরা ত নেই?

ঊষা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, না, ভয় নেই, তাঁরা নবদ্বীপধামে গেছেন।

বলি, ফিরে আবার আস্‌চেন না ত?

ঊষা তেম্‌নি মৃদু হাসিয়া শুধু কহিল, না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বৌঠাক্‌রুণ, আপনার যে এরূপ সুবুদ্ধি হবে এতো আমাদের স্বপ্নের অগোচর। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-কুমারের স্বহস্তে তুলসী মালা ছিঁড়ে দিয়ে, টিকি কেটে দিয়ে,—এ সব কি বলুন ত?

ঊষা হাসিমুখে ক্ষেত্রমোহনের কথা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, বেশ ত বল্‌বার তাড়া-হুড়ো কি জামাইবাবু! ধীরে-সুস্থে সমস্তই বল্‌তে পার্‌বো। এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু আপনাদের খেতে দিই।

সমাপ্ত

মুক্তি

৺অমলা দেবী

পেয়েছি মুক্তি পেয়েছি আজি গো,
নিবিড় দুঃখ মাঝারে।
তোমার শক্তি বুঝেছি প্রভু গো!
চিনেছি এবার তোমারে।
নয়ন অন্ধ ছিল এত দিন
আছিনু বদ্ধ চরণ বিহীন
তিমির সঘন পাথারে।

এ কি এ দীপ্তি দেখিনু সহসা,
কি মধু তৃপ্তি, কি নব ভরসা,
এ কি এ আলোক আঁধারে!!
তোমারে সঁপিয়া সুখ দুঃখ, ওগো!
ফিরিয়া পাইনু আমারে;
পেয়েছি মুক্তি, তোমারে প্রভু গো!
চিনেছি দুঃখ মাঝারে!

খবরাখবর

মহাত্মা গান্ধী অনাহার-ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ২১ দিন অনাহারে থাকিবেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সংঘটনের জন্য বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি চেষ্টা করিতেছেন; তাহার কোন ফলই হইতেছে না। এই কারণে তিনি অনাহারে থাকিয়া একান্ত-মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

তারকেশ্বরের গোলমাল মিটিবার পথে আসিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মীমাংসার যে প্রস্তাব জন-সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার সার কথা এই যে, মোহন্ত সতীশগিরি পদত্যাগ করিবেন, তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রভাতগিরি মোহন্ত হইবেন, তারকেশ্বর সম্পত্তির কিয়দংশ সতীশগিরির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ থাকিবে, অবশিষ্ট সমস্তই এক কমিটীর হাতে যাইবে, প্রভাতগিরি ও তৎপরবর্ত্তী মোহন্তগণ সর্ব্বতোভাবে এই কমিটীর অধীন থাকিবেন, কমিটী তাঁহাদের বহাল-বরতরফের মালিক হইবেন। এখনও পাকা দলীল হয় নাই।

বাঙ্গালা দেশের মন্ত্রীদিগের হাতে যে সমস্ত কার্য্যভার ছিল, তাহা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মহাশয়েরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া চালাইতেছেন। নূতন ব্যবস্থার পূর্ব্বে এবং তাহারও বহু পূর্ব্বে কিন্তু একজন ছোট লাট কয়েকটী সেক্রেটারীর সাহায্যেই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সে সময়ের কাজ-কর্ম্ম আর এখনকার কাজ-কর্ম্মে তফাৎ ত কিছু দেখা যাইতেছে না; তখনও আঠারো মাসে সরকারী বৎসর হইত, এখনও তাই আছে; তবে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অনেকগুলি কৃষ্ণের জীবের অন্ন-সংস্থান হইতেছিল।

এবার পূজার বাজারে নাকি বিলাতী কাপড়ের তেমন টান নাই; দেশী ও মিলের কাপড় এবং খদ্দরের দিকে লোকের ঝোঁক পড়িয়াছে। সার প্রফুল্লচন্দ্রের খাদি-প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী মির্জ্জাপুর বাগানে বসিয়াছে; এদিকে স্বরাজ-দলেরও প্রদর্শনী কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সেণ্ট্রাল-কলেজ-পরিত্যক্ত-ভবনে বসিয়াছে। দুই স্থানেই চরকা-উৎসব হইতেছে।

পূজার ছুটীতে কে কোথায় যাইবেন, তাহার সঠিক সংবাদ আমরা পাই নাই; তবে এ খবর আমরা জানি যে, যাঁহারা পল্লী-সংস্কারের জন্য গগনভেদী চীৎকার করিয়া আসিতেছেন, নেতৃ-স্থানীয় সেই সকল মহাত্মা তাঁহাদের পল্লী-ভবনে যাইবেন না,——অনেকের যে সে বালাই-ই নেই।

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইয়োরোপ-যাত্রা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে স্পেনে যাইবেন, সেখান হইতে পেরু যাইবেন, তাহার পর আমেরিকায় গমন করিবেন। দেশে ফিরিয়া আসিতে পাঁচ ছয় মাস লাগিবে। এবার তাঁহার সঙ্গী হইয়াছেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কার্য্য-প্রণালীর প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া এদেশের কতকগুলি সংবাদ-পত্র কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন বলিয়া মিউনিসিপালিটী আত্ম-পক্ষ সমর্থন ও প্রকৃত ব্যাপার সাধারণের গোচর করিবার জন্য 'মিউনিসিপাল গেজেট' নামক একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশিত করিতেছেন। এই পত্রিকা-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীদলীপকুমার রায় প্রণীত "দ্বিজেন্দ্রগীতি" স্বরলিপি প্রকাশিত হইল। মূল্য—১॥০।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নব-বিধান" প্রকাশিত হইল। মূল্য—১॥০।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত "অশ্রুময়" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—২৲।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত "প্রেমের মূল্য" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১।০।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত "পতিহারা" প্রকাশিত হইল। মূল্য—১৲।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত "গোঁপ খেজুরে" প্রকাশিত হইল। মূল্য—॥০।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত "ভগবৎ প্রসঙ্গ" নামক ধর্ম্ম পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১।০।

সচিত্র মহাত্মা কবীরের "জীবনী ও বাণী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১॥০।

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত নূতন উপন্যাস "পরশ-পাথর" যন্ত্রস্থ। পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

ভ্রষ্ট লগ্ন

বাতায়ন পাশে একা একা গান গাই
হতাশ পথিক—সে যে আমি—সে যে আমি —রবীন্দ্রনাথ

COLOURED ILLUSTRATION